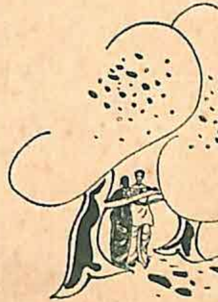


অন্তরাল

অবিনাশ সাহা

নবযুগ প্রকাশনী ॥ কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৫৫

প্রকাশক
এ, হক
১ সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস
কলিকাতা-১৭

মুদ্রাকর
শ্রীসুনীল কুমার বসু
এসিয়ান প্রিণ্টার্স
নলিনী হাউস
পি ১২, নিউ সি. আই. টি. রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদপট
সেরাফিক্ এ্যাড্‌ভার্টাইজিং লিঃ

পরিবেশক
ভারতী লাইব্রেরী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার, ঢাকা

সুলভ সংস্করণ : তিন টাকা
শোভন সংস্করণ : চার টাকা

উজ্জয়িনী সাহিত্য সভার বন্ধু
শ্রীসুধীন্দ্র নারায়ণ নিয়োগীর
করকমলে

…তা হয় না, অসীমা! তোমাকে সুখী করা আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কথা শেষ করে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে অজয়।

অসীমা ভাবতে পারেনি, এভাবে অজয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। যে কথা মুখফুটে বলা কোন নারীর পক্ষেই সম্ভব নয় আজ অকপটে সেই কথাই সে অজয়কে বলেছে। প্রাণের সমস্ত আকুতি দিয়ে জানিয়েছে, সে ছাড়া তারও অন্য উপায় নেই। এ কোন ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস কিংবা স্বপ্ন-মায়া নয়। বাল্যে যার সঙ্গে একদিন খেলাঘরে খেলেছে, জীবনের মহালগ্নেও সেই হবে চিরসাথী এই ধ্যানইতো ওর ছিল। কিন্তু অজয় সে স্বপ্ন ভেঙে দিতে চাচ্ছে। মনকে শক্ত করে পুনরায় প্রশ্ন করে অসীমা, এই কি তোমার স্থির সিদ্ধান্ত অজয়?

তোমার ব্যথা আমি বুঝি অমু। কিন্তু সত্যি আজ আমি অক্ষম।

কিসে অক্ষম শুনি?

কৈফিয়ৎ আজ আর তুমি চেয়ো না আমার কাছে! শুধু অনুরোধ, আমাকে ভুলে যাও।

সেদিনের সেই আকস্মিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কি তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ?

অমু?—অজয়ের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ঝরে পড়ে।

বলো, থামলে কেন?

না থাক, আজ আর আমার বলার কিছু নেই। ভাগ্য বিড়ম্বিত আজ আমি।

দোহাই তোমার, ভাগ্যের কথা বলে মিছে আর পাশ কাটাবার ভান করো না ?

অমু, তুমি উত্তেজিত হয়েছো, এ আলোচনা এখন থাক।

না, জবাব আমার আজই চাই। বলো, এই কি তোমার শেষ কথা ?

কথা যে অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে অমু।

হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে উত্তর দাও অজয় ?

অতিকষ্টে নিজেকে চেপে শান্তভাবেই বলতে থাকে অজয়, অমু, একদিন জীবনের সর্বস্ব দিয়েই তোমাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি। দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়। মানুষ বুঝি এমনি অজ্ঞাতেই অনেক কিছু হারিয়ে ফেলে। তোমাকে আজ গ্রহণ করতে পারছিনে, এ যে কি দুঃখু তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

সত্যি, তোমার কি হয়েছে বলতো ?

দোহাই তোমার আজ আর তুমি আমাকে ও প্রশ্ন করো না। ভেবে নাও, তোমার অজয়ের অপমৃত্যু হয়েছে।

উঃ—,অসীমার কণ্ঠরোধ হয়। দু'চোখ বেয়ে ঝরতে থাকে শ্রাবণের অনর্গল ধারা।

অজয় বিচলিত হয়ে পড়ে। একটু দম নিয়ে পুনরায় সান্ত্বনা দিতে উদ্যত হয়, খুব আঘাত পেলে তো ?

এত নিষ্ঠুর তুমি ? কাঁপা গলায় জবাব দেয় অসীমা।

অজয়ের প্রাণের ঘোড়া বুঝিবা লাগাম ছাড়া হয়ে চলেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে থাকে অসীমার। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগেই অন্তঃপুর থেকে সুপ্রভাদেবী হাঁক ছাড়েন, কৈরে অমু, অজয়কে শীগগীর নিয়ে আয় না ? লুচি যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ?

অসীমা মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে অজয়ের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানায়, খাবে চলো।

অজয় হাঁপ ছাড়বার অবকাশ পেয়ে কতকটা স্বস্তি বোধ করে। কোনরূপ দ্বিধা না করে অন্যমনস্কভাবেই ওকে অনুসরণ করে চলে।

আহারে রুচি নেই, কিন্তু সুপ্রভাদেবীকে এড়িয়ে চলাও দুঃসাধ্য। পাখা হাতে কাছে বসে, এটার একটু ওটার একটু করে, ভোজ্য বস্তুর প্রায় অধিকাংশই অজয়কে উদরস্থ করতে বাধ্য করে তোলেন। শৈশবে কতদিন এমনিভাবে অজয় আর অসীমাকে কাছে বসিয়ে খাইয়ে দিতেন। সেদিন কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে জুজুর ভয় দেখিয়ে, রূপকথার লোভ দেখিয়ে পেট ভরিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ উভয়েই বড় হয়েছে। স্তোকবাক্য আজ আর হাতিয়ার হবার নয়। আজ যুক্তি দিয়েই সব কথা বলতে হবে। তাই অনুতাপ-মিশ্রিত কণ্ঠেই কথা পাড়েন সুপ্রভা ঃ বাবা অজয়, মিথ্যে টেলিগ্রাম করে এনে হয়তো খুবই বিব্রত করেছি তোমাকে। কিন্তু বিশ্বাস কর বাবা, এছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিল না। আজ সাত বছর, তোমার কোন খোঁজ নেই। এই সুদীর্ঘ সময়ে মানুষের কাছে যে কি অসহনীয় গ্লানি আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

অজয় সহসা কোন উত্তর দিতে পারে না। খাবারের থালায় মুখ অধিকতর নত করে দেয়। সুপ্রভাদেবী উত্তর দেবার মতো আনুমানিক সময় অপেক্ষা করে পুনরায় আরম্ভ করেন, অবশ্য আমি স্বীকার করি, সাত কেন সাতশ বছরেও কোন মানুষের পক্ষে সে লোমহর্ষণ বীভৎসতা ভুলে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাবা, এদিকে অমুকে নিয়ে আমিও যে আর লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারছি নে। অন্যপর যে যাই বলুক,

হিন্দুঘরে গায়ে হলুদ হবার পর বাগদত্তা মেয়েকে আমি অন্য কারো হাতে তুলে দিতে পারবো না। বলতে বলতে ডান হাত অজয়ের পিঠের ওপর রেখে বাঁ-হাতের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকেন।

অজয়ের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ না থাকায় খুব বিব্রত বোধ করে।

সুপ্রভা সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় পুনরায় আরম্ভ করেন, তুচ্ছ একটা জমিদারী চাল বজায় রাখবার জন্য যে মহাপুরুষকে সেদিন প্রাণবলি দিতে হয়েছে আজ তার বিনিময়ে সারা পৃথিবী দান করলেও সে ক্ষতি পূরণ হবার নয়। অহমিকা ভরে মানুষ কতই না ভুল করে। আজ কোথায় আমার শ্বশুর রায় বাহাদুর গুরুচরণ চক্রবর্তী আর তাঁর জমিদারী? চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় বাতি দেবার মতোও যে কেউ রইলো না। আঁচলে পুনরায় চোখ মুছতে থাকেন সুপ্রভা।

ওকথা থাক মাসীমা, গভীর মৌনতা ভেঙে উত্তর করে অজয়।

না বাবা, এতো থাকবার কথা নয়। এ হ'লো বিধাতার বিধান, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবার শক্তি কারো নেই। আজ থাক বললেই কি আমরা সব ফিরে পেতে পারি? মৃত্যুকালে কর্তা তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন, অমুকে যেন আমি তোমারই হাতে সঁপে দিয়ে আমাদের সকলের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করি। আর একথাও হয়তো তোমার মনে আছে, হাজার মামলা-মকদ্দমার মধ্যেও তোমার মা বাবা কেউ কোন দিন এ বিয়েতে আপত্তি করেননি। তাই আমি তোমার পথ চেয়েই বসে আছি। মেয়েটার মুখের দিকে আর তাকাতে পারি নে। তুমি আমাকে দায়মুক্ত করো বাবা। কোন রকমে কথা কয়টা শেষ করে উত্তরের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকেন সুপ্রভা।

অজয়ের অবস্থা কতকটা বাকশক্তিহীন সজ্ঞান রুগীর মতো। কেমন করে বোঝাবে ও, অতীতের কোন ঘটনাই ওর মনকে স্পর্শ করতে

পারেনি? আজ নিজের কাছে নিজে ও সর্বহারা। তাই খানিক ইতস্তত করে সসন্ত্রমে উত্তর করে, মাসীমা, আমার কোন কথাই আপনাদের বলা হয়নি। সুদীর্ঘ অসাক্ষাতে পরস্পর আমরা পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন। দয়া করে আপনি আমাকে একটু ভেবে দেখবার সুযোগ দিন। আমার অনুরোধ, আপনি পুরোনো কথা মনে করে দুঃখ পাবেন না।

নিশ্চিন্ত না হতে পারলেও সুপ্রভা অজয়ের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হন,—বেশ কালকেই তোমার যা বলবার বলো।

অজয় আর কোন কথা না বাড়িয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সুপ্রভা অসীমাকে লক্ষ্য করে পুনরায় হাঁক ছাড়েন, কৈরে অমু, অজয়ের হাতে জল দে?

সাত বছর আগে হলে অসীমাকে হাঁকডাক করতে হ'তো না। আপন খুশিতেই সে আজয়ের কাছে বসে নানা আবদার জুড়ে দিতো। আজ মনের কোণে ঝড় উঠেছে। তাছাড়া দূর থেকেই ও শুনতে চেয়েছে, কি বলে অজয় মাকে পাশ কাটায়। দেয়ালে কান রেখেই সব শুনছিল, তাই ডাক কানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জলের পাত্র হাতে কাছে এসে দাঁড়ায়। কে যেন এক দোয়াত কালি ছিটিয়ে দিয়েছে তার শুভ্র মুখখানিতে।

সাত বছর আগে হলে কিছুতেই হয়তো এত রাত্রে বাড়ী ফেরার কথা মুখে আনতে পারতো না অজয়। কিন্তু আজ সে অনন্যোপায়। দূরে থাকতে পারলেই আজ বেঁচে যায়। তাই সুপ্রভাদেবীর অনুরোধ সত্ত্বেও বাড়ীর উদ্দেশ্যেই রওনা হয়ে আসে। হাতে টর্চ থাকায় কোন ভৃত্যকে পর্যন্ত সঙ্গে আসতে দেয় না। সুপ্রভা অন্তরে হয়তো কিছুটা আহত হন, কিন্তু উপায় নেই। অজয়ের উত্তরের প্রতীক্ষায় সারা রাত বিছানায় ছটফট করতে থাকেন।

রাজপুর, পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত জনপদ। ধলেশ্বরীর তীরে উহার শ্যামল তটভূমি যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। গ্রাম এবং শহরের মিলিত এক শ্রীভূমি। একদিকে সুদৃশ্য অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, অন্যদিকে বিস্তৃত বনানীর শ্যামলিমা। রাজপুর সত্যি এক আদর্শ পল্লী। অজয়ের পিতা অঘোর নাথ রায়চৌধুরী—পুরুষানুক্রমে এই রাজপুরের দশ আনা অংশের জমিদার। প্রতিপক্ষ চক্রবর্তী বংশের গুরু চরণ চক্রবর্তী—ছয় আনার অংশিদার। গুরুচরণের দুই ছেলে, মুরারী মোহন ও ভুবন মোহন। জ্যেষ্ঠ মুরারী মোহনেরই একমাত্র মেয়ে এই অসীমা। ভুবন মোহন তখনও অবিবাহিত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিল। রায়চৌধূরী এবং চক্রবর্তী বংশের পূর্বপুরুষগণ পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বকে কালজয়ী করবার মানসেই হয়তো একত্র জমিদারি কিনেছিলেন। গোড়া থেকেই রায় চৌধুরী বংশ "বড় তরফ" ও চক্রবর্তী বংশ "ছোট তরফ" হিসেবে একই গাঁয়ে বাস করে আসছে। কখনো-সখোনো ছোট খাটো মন কষাকষি দেখা গেলেও এ যাবৎ দুই পরিবারের মধ্যে বেশ সৌহার্দই বজায় ছিল। কিন্তু ইদানীং অঘোরনাথ আর গুরুচরণের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে।

অঘোর নাথ সহজ সরল মানুষ। জমিদারী বুদ্ধি-বৃত্তি তার সল্প। হয়তো বুঝতেই চায় না সে। তাই দপ্তরে বসে, মহালের কাগজপত্র না দেখে, দেখে থাকে—কোথায় কোন ব্রাহ্মণ কুমারের পৈতে হচ্ছে না, সামান্য অর্থের অভাবে কোথায় কোন মধুমণ্ডলের পিতৃশ্রাদ্ধ আটকে গেছে, কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়ায় কোথায় কোন গাঁয়ের লোক উজাড় হয়ে চলেছে ইত্যাদি। এক কথায়, দানসত্র আর অন্নসত্রের ঘটায় বার্ষিক আয়ের পঞ্চাশ হাজার টাকা কোথায় যে কোন ফাঁকে উবে যায়

সে তা টেরও পায় না। প্রজাকুল সকলেই জানে, মনিব সদাশিব। ট্যাকের কড়ির বদলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারলেই ভোলানাথ তুষ্ট। এবং সময় মত জুটতও ঠিক তাই। তদুপরি নায়েব গোমস্তার মধ্যেও যে দু'দশজনের হাতটানের অভ্যাস কিংবা দলিল দস্তাবেজের মূলে কুঠারাঘাত করবার সদিচ্ছা ছিল না তা'ও নয়। ফলে, ইদানীং লাটের কিস্তির সময় অঘোরনাথকে কর্জ করতে হচ্ছে। বছর দশেকের ব্যবধানে অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠল যে শুধুহাতে ঋণ পাওয়াও আর সম্ভবপর নয়। সাদাসিধে অঘোরনাথ রেহানের ঝামেলায় না গিয়ে জমিদারির আংশিক বেচে ফেলেই ঋণমুক্ত হতে স্থির করে। বংশমর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার নিমিত্ত প্রস্তাবটা সর্বপ্রথম গুরুচরণকেই জানায়। 'দশ আনি' আর 'ছ আনিতে' এযাবৎ যে বৈষম্য ছিল আজ হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তা সমান হতে চলেছে। ভালই হ'ল। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি হয়তো আরো ঘনিষ্ঠতরই হবে। কোন নায়েব গোমস্তা না পাঠিয়ে অঘোরনাথ নিজেই একদিন খোলাখুলি গুরুচরণের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপিত করে।

সংসারে সব মানুষ এক নয়। একরূপ ভাবেও না। অঘোরের হৃদয় যেখানে এক কথায় সহজ মীমাংসা চেয়েছিল, গুরুচরণ সেখানে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে জাল বিস্তার করে চলে। সে ঠিক বুঝে নেয়, অঘোর ডুবছে। শুধু একটু ধৈর্য আর কূটনীতির মারপ্যাঁচে দু' আনার টাকা দিয়েই দশ আনা গ্রাস করা যাবে। তাই আঘোরের প্রস্তাবে বাহ্যিক সহানুভূতি জানায়, ছি ছি অঘোর, আমি তোমার অংশ কিনে টাকা দেবো, এমনি স্বার্থপর ভাবলে আমাকে! এযে এক ঘরের কথা! তোমার সম্মান গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু বড়ই লজ্জিত হচ্ছি, এসময়ে আমার হাতে নগদ টাকা-কড়ি কিছু নেই। তাই হয়তো··· অঘোর বাধা দেয়, না কাকাবাবু, শুধুহাতে আমি আর ধার করবো না।

তাছাড়া শোধই-বা দেবো কি করে? ঘরের জিনিস ঘরে থাকবে এই বাসনা নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার যদি অসুবিধা থাকে তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

গুরুচরণ দোটানায় দুলতে থাকে। অঘোরকে সোজাসুজি ফিরিয়ে দিলে উদ্দেশ্য হাসিল হবার নয়। তাই আন্তরিকতা ঢেলেই পুনশ্চ বাধা দেয়, না না, তোমার বিপদ, আমি কি না ভেবে পারি? আমাকে দিন কয়েকের সময় দাও বাবা, দেখি কি করতে পারি।

অঘোর যতখানি আশা নিয়ে এসেছিল ঠিক ততখানি নির্ভর করতে পারে না। তবু গুরুচরণকে সময় দিয়েই—উঠে দাঁড়ায়।

দিনের পর দিন উত্তীর্ণ হতে থাকে। কিন্তু গুরুচরণের তরফ থেকে কোন জবাবই আসে না। আসন্ন লাট কিস্তির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে অঘোর। গুরুচরণের নিকট পুনরায় উপস্থিত হতেও তার সম্ভ্রমে বাধে। অঘোর সোজাসুজি কাশিমপুরের জমিদারদের সঙ্গেই পাকাপাকি করে ফেলে। বহুদিন থেকেই তাঁরা এঅঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তৃত করবার চেষ্টায় ছিলেন। অঘোরের প্রস্তাব লুফে নেন কাশিমপুরের মধ্যমকুমার। প্রাপ্য অর্থ থেকে সমস্ত ঋণ শোধ করেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে অঘোরের। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সে বাঁচে। বায়না বাবদ দশহাজার টাকা হাতে নিয়ে সকল শ'র্তে রাজী হয়।

অঘোর অকূলে কূল পায়। কিন্তু গুরুচরণ কূটচক্রে হাবুডুবু খেতে থাকে। এতবড় একটা দাঁও এত সহজে ফসকে যাবে একি করে সম্ভব? অঘোরের সঙ্গে কাশিমপুরে শর্ত হয়েছে, হারমত অংশ তাঁদের ভাগ করে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ ঝামেলায় তাঁরা যাবেন না। গুরুচরণের ওপর নির্ভর করেই অঘোর এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে এসেছে। কিন্তু তখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারেনি, ছয় আনার অংশিদার গুরুচরণের শ্যেন দৃষ্টি কোথায়? প্রস্তাব উত্থাপিত হতেই গুরুচরণ

প্যাঁচ কষতে থাকে। মহালের ভাল ভাল প্রায় সব কয়টি অংশই সে তার নিজের ভাগে টানতে চেষ্টা করে। অঘোর নির্বোধ নয়। সে বেশ বুঝতে পারে, এ ব্যবস্থা তার পক্ষে আত্মঘাতী। উপরন্তু কাশিম-পুরই বা নিকৃষ্ট অংশ নিয়ে টাকা দিতে রাজী হবে কেন? মামলা রুজু করেও আশু ফললাভের কোন সম্ভাবনা নেই। লাটের কিস্তি আসন্ন। সদাশিব অঘোর রুদ্র তেজে জ্বলে ওঠে। শক্তি দিয়েই আজ তাকে মহাল দখল করতে হবে। কাশীমপুর এ প্রস্তাবে রাজী। হয়তো সুদূর প্রসারী তাঁদের দৃষ্টি। যুদ্ধে উভয় পক্ষই যে ঘায়েল হবে না কে জানে, গোটা জমিদারিও দখলে আসতে পারে। রণ দামামা বেজে ওঠে। শত শত লাঠিয়াল আর তীরন্দাজের চলে দিবারাত্র মহড়া। অঘোর দশ আনার মালিক, উপরন্তু শক্তিশালী কাশিমপুর তার সহায়। সুতরাং পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। গুরুচরণ তলায় তলায় উৎকোচ আর প্রলোভন দিয়ে অঘোরের নায়েব গোমস্তাদের অনেককে হাত করেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কাশিমপুরের শক্তি দুর্দমনীয়। মোহনপুরের চরে যুদ্ধের নিশানা স্থির হয়। অঘোর চর দখল করে সদল বলে ফিরছিল, সসৈন্যে গুরুচরণ প্রলয় শুরু করে। গুরুচরণের কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন পরাজয় অনিবার্য জেনে পেছন থেকে এমনভাবে বল্লম ছুঁড়ে মারে যে অঘোর ধরাশায়ী হয়ে ধূলিতে লুটায়। পাঁজরা ভেদ করে চলে গেছে বল্লম। অঘোরের তামাম শোধ।

ফাঁসি অনিবার্য। দুর্বলচিত্ত গুরুচরণ ধাক্কা সামলাতে পারল না। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সেও সমর ক্ষেত্রেই মারা যায়। জ্যেষ্ঠপুত্র মুরারিমোহন পিতৃশোক আর বন্ধুশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ভুবন মোহন হয় নিরুদ্দেশ। এ যাবৎ তার কোন খোঁজ নেই। কাশিমপুর দাঁত বার করে হাসতে থাকে।

পিতার মৃত্যুকালে অজয়ের বয়স হবে সতেরো কি আঠারো। আশৈশব আদরের দুলাল। সাংসারিক বুদ্ধির বর্ণ পরিচয়ও তার নেই। গ্রামের ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হবার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। আকস্মিক বিপর্যয়ে হাল ভেঙে পড়ে। জীবনের সবচেয়ে কাম্য দিনটিতে মা গত হয়েছেন। সে গ্লানি কোন রকমেই মন থেকে মুছে ফেলবার নয়। দু'বছর আগের ১৬ই ফাল্গুন। চাঁদ আর চামেলীতে চলেছে মিতালি। ভুবনে গগনে লেগেছে গানের সুর। রায় চৌধুরী বংশ আর চক্রবর্তী বংশ পরস্পর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে। অসীমা আসছে এ বাড়ীর কুললক্ষ্মী হয়ে। টুকটুকে ছেলের টুকটুকে বৌ। চক্রবর্তী বাড়ীতে রোশনচৌকি বসেছে। সাতখানা গ্রাম জুড়ে হয়েছে পাকা ফলারের নেমন্তন্ন। আত্মীয়-স্বজন লোক জনে জমজমাট। অজয়ের মা করুণাময়ী তৈরী হচ্ছিলেন বধূবরণের অঙ্গ সজ্জায়—। আত্মীয়-স্বজনে রায় চৌধুরী বাড়ীও উৎফুল্ল। ভৈরবীর সুর বাজছে নহবতে। গায়ে হলুদ হয়ে গেল। সূর্যোদয় থেকেই শুরু হবে বিয়ের কাজ। করুণাময়ী ছেলের মুখে ক্ষীর চিনি দিয়ে বাইরে আসতে, মাথা ঘুরে পড়ে যান। ডাক্তার, কবরেজে সারা বাড়ী থৈথৈ। কিন্তু করুণাময়ী আর ইহজগতে রইলেন না। হাওদায় বসে যার ছাতনা তলায় যাবার কথা কিন্তু সে চললো শ্মশানে। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের আবির্ভাবে যেন সব স্তব্ধ। বুকফাটা করুণ কান্নায় সারা রাজপুর বিষাদমগ্ন। পিতার স্নেহ যত্নে অজয় এ আঘাত—সামলিয়েও বুক বেঁধেছিল। হয়তো আর কিছুদিন পরেই অসীমা তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সে স্বপ্নও ভেঙে খানখান হয়ে গেল অঘোরের মৃত্যুতে। অজয় এ ধাক্কা সামলাতে পারে না। শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়। গাঁয়েরই বাসিন্দা শিবদাস চক্রবর্তী এষ্টেটের দেওয়ান। অঘোরের একান্ত হিতৈষী ব্যক্তি। অজয় সমস্ত

ভার তাঁর ওপর দিয়ে যায়। যাবার সময় অসীমার সঙ্গে দেখা হয় না। বুঝে নেয়, তাদের উভয়ের মিলন হয়তো বিধাতার বিধান নয়। শ্মশান বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন দেহ মন। চেনাশুনোর বাইরেই যেন কে আজ ওকে টানছে!

৩

সুপ্রভাদেবীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরতে অজয়ের অনেক রাত হয়ে গেল। ভৃত্য হলধর ভেবে নিয়েছিল, তার খোকাবাবু আজ আর ফিরবে না। তাই সে সদরে তালাচাবি দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল।

প্রায় বারোটা, সদরে জোরে কড়ার নাড়ার শব্দ। হলধর ধরফড় করে উঠে এসে খিল খুলতেই দেখে, অজয় দাঁড়িয়ে আছে। একটু লজ্জিত হয়েই আমতা আমতা করতে থাকে: আমি ভাবছিলাম তুমি ঐহানেই থাকবা। তা আবার এই রাইত দুপুরে আইবার কি কাম আছিল।

না এলে তুমি বিছনা করার হাত থেকে বেঁচে যেতে, কেমন? আচ্ছা কুঁড়ে হয়েছ তো?

ওকথা আর আমারে কইবার পারবা না। দেহগা, বিছানা অইচে, না, না অইচে!

'তা অইচে তো বেশ অইচে'। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর রাত না করে—চলো শুয়ে পড়া যাক। কাল ভোরে উঠেই আবার গাড়ী ধরতে হবে।

ভোরে উইঠা গাড়ী ধরবা কেমুন? দেওয়ানকাকা ফিরা আসুক? এত দিন পর আইলা কিছু দেখবার শুনবার নাই?

দেখাশুনো করবার জন্য তো তোমরাই রয়েছ।

আমাগ দায় পড়ছে এই শ্মশানপুরী পাহাড়া দিবার জন্য! ক্যান, মাসীমা তোমারে কিছু কয় নাই?

কি কথা হলধরদা?

—এই বৈশাখেই তোমার বিয়ার কথা! মামণির মুখের দিকে চাইয়া দেখছ, কি হাল অইচে?

তুমি পাগল হয়েছো? আমার বলে মরবার সময় নেই, তার আবার বিয়ে?

দ্যাখ, ভাল অইব না বলছি। ওসব অমুঙ্গইলা কথা কইলে আমি আর থাকুম না।

আচ্ছা রাত দুপুরে আর ঝগড়া করে কাজ নেই। চলো শুয়ে পড়া যাক।

হলধর লণ্ঠন হাতে কি যেন ভাবতে ভাবতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

সাত বছর পর শূন্য এই নিভৃত কক্ষে অজয় একাকী। অতীতের স্বপ্ন বিজড়িত দিনগুলি এক এক করে ভেসে ওঠে চোখের ওপর। ওখানে ঐ খাটের ওপর ছোট্ট শিশুটির মতো সেদিনও সে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়েছে। শান্তির নিরবচ্ছিন্ন স্নেহনীড়। রাতের নিস্তব্ধতায় সমস্ত হৃদয় গুমরে গুমরে ফুলে ওঠে। অশ্রুতে ভেসে যায় গণ্ড। ভাষাতীত আকুল আবেগে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে মায়ের অয়েল পেন্টিং ফটোটার দিকে। মা করুণাময়ী—শান্তিদায়িনী। পাশের ফটোতে বাবা যেন সজীব নয়নে চেয়ে আছেন। হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নেবার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠছেন তিনি। অজয় নতজানু হয়ে উভয়কে প্রণাম করে। হলধর আজো মালা চন্দনে অর্ঘ দিয়েছে। সন্ধ্যার ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত দেবমন্দির। আশ্চর্য মানুষ এই হলধর। অঘোরনাথ আর করুণাময়ীকে ইষ্ট দেবতার মতোই শ্রদ্ধা করে। বছর পঞ্চাশের

আগের কথা। অজয়ের ঠাকুরদা বৈকুণ্ঠনাথ তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। হলধরের মাও অনুরূপ আর একটি নিম্ন পর্যায়ের দলভুক্ত ছিল। বৃন্দাবনে এসে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। হলধরের বয়স তখন সবে পাঁচ বছর। কিন্তু তীর্থদর্শনের পুণ্যফল ওর মায়ের ওপর এমন ভাবে উপচে পড়ল যে, বেচারা আর ঘরে ফিরতে পারলে না। দলের অন্যান্য সকলে হা হুতাশ করলেও অনাথ হলধরের আর গতি হয় না। দয়ার সাগর বৈকুণ্ঠনাথ সবে মাত্র বৃন্দাবনজীকে দর্শন করে বাইরে পা বাড়িয়েছেন, হলধরের অসহায়তায় বিচলিত হয়ে পড়েন। অঘোরের চেয়ে হয়তো বছর খানেকের ছোট হবে হলধর। নিজের আশ্রয়ে নিয়ে এলেন তিনি ওকে। পরিবারের একজনের মতোই বেড়ে উঠল হলধর। কোনদিন ভাববার অবকাশ পায়নি ও এ বাড়ীর ভৃত্য। পরিণত বয়সে বৈকুণ্ঠনাথ বিয়েও দিয়েছিলেন ওর। কিন্তু শ্রীধন বেশী দিন ভাগ্যে সইল না হলধরের। বছর পাঁচকের মধ্যেই নিঃসন্তান অবস্থায় গত হয় সারদা। হলধরের বর্তমান বয়স পঞ্চাশ। শিশুর মতোই আজো ও নির্মল। বৈকুণ্ঠনাথ সসম্মানে স্বর্গে গেছেন। অগ্রজাধিক শ্রদ্ধার পাত্র অঘোরনাথ। করুণাময়ী লক্ষ্মীতুল্যা। তাদের হারিয়ে আজ ও জীবন মৃত। হয়তো বিবাগী হয়েই একদিক বলে বেরিয়ে পড়তো। শুধু অজয়ের মমতায় বুক বেঁধে আছে। শুধু তারই কল্যাণ কামনায় আজো এই শ্মশানপুরীতে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বালে ও। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে অজয়কে। অসীমা এ বাড়ীর লক্ষ্মী হয়ে আসুক এই প্রার্থনাই ও ইষ্ট দেবতার নিকট অহরহ জানায়। রাজপুর গ্রামে ওর একমাত্র বান্ধব দেওয়ান শিবদাস আর অসীমা, সুপ্রভা। সাত বছর অজয় নিরুদ্দেশ। মাথাকুটে মরতে গিয়েছে কতদিন। সহসা অসীমার মুখে অজয়ের সংবাদ শুনে দেহে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সুপ্রভাকে দিয়ে ও-ই 'তার' করিয়েছে অজয়কে আসতে।

স্মৃতির দংশনে অজয় ঘুমোতে পারছে না। হলধরের চোখেও ঘুম নেই। 'ভোর না হতেই পাখী উড়ান দেবে,' হলধর স্থির থাকতে পারে না। ঠিক বুঝে নেয়—অজয় কিছুতেই একথা সুপ্রভাদেবীকে বলেনি। বললে কিছুতেই তিনি অজয়কে ছেড়ে দিতেন না। তিনিও যে একমাত্র ওর পথ চেয়েই প্রতীক্ষা করছেন! অসীমা, সে-ই কি কম তপস্যা করছে?

অতি সন্তর্পণে হলধর চক্রবর্তী বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এখুনি গিয়ে অসীমাকে ধরে আনবে। সে ছাড়া আর কেউ পারবে না অজয়ের পথ রোধ করে দাঁড়াতে।

পশ্চিমের আকাশে উঁকি দিয়েছে কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ। ক্ষীণ জ্যোৎস্না যেন সারা পৃথিবীময় লেপে দিয়েছে বিষাদ কালিমা। ভারাক্রান্ত মনে অজয় একটা ইজিচেয়ার টেনে বসে মুখোমুখি। ধীরে বইছে বসন্তের বাতাস। অজয় স্থির থাকতে পারে না। অতীতের সুখ-স্মৃতি বার বার নিভৃত অন্তরে মোচড় দিতে থাকে। বিশাল জমিদারির বৃহৎ এই অট্টালিকা আজ শ্রীহীন। কোথাও দেয়ালে ভেদ করে উঠেছে অশ্বথ গাছ, কোথাও বা খানিক ধসে পড়েছে। আলসের ওপর বাসা বেঁধেছে রাশি রাশি পায়রা। ঝরা পালক আর বিষ্ঠায় বিশ্রী নোংরা। শুধু অন্তঃপুরের এই ক'খানা ঘর আর কাছারী বাড়ীটি শিবদাস আর হলধরের প্রাণপণ চেষ্টায় এখনো মাথা উঁচু করে অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। অজয় ভেবে পায় না, কি সে করবে। এই ঘুমন্ত পুরীকে পুনরায় যদি সঞ্জীবিত করে তুলতে হয়, তবে সে একমাত্র অসীমা থেকেই সম্ভব। ওর ওপরেই রয়েছে পিতৃ পিতামহের আশীর্বাদ।···কিন্তু মুহূর্তের ভুল। মুহূর্তের ভুলে আজ ও অক্ষম। জীবনের স্বপ্ন দিয়ে গড়া স্বর্ণসীতাকে জীবনের মধ্য গগনেই ও বিসর্জন দিতে চলেছে। অথচ কাউকে বলে

বোঝাবার নয়, কি সে অক্ষমতা—কি সে চিত্তদৈন্য ? অজয়ের শিরা উপশিরা টনটন করে ওঠে।

নিথর রজনীর অবসন্নতা ধীরে ধীরে ঘুমের প্রলেপ ছড়িয়ে দেয়। অজয় উঠে গিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে। ঠিক ঘুম না হলেও তন্দ্রাচ্ছন্ন ক্লান্ত দেহ। কিন্তু মন সক্রিয় হয়ে ওঠে মনন লোকে। স্বপ্নের ঘোরে সহসা গোঙাতে থাকে অজয়। অঘোর যেন স্বর্গের তোরণ থেকে ক্রুদ্ধস্বরে শাসাচ্ছে, ওরে হতভাগা, করছিস কি ? কাঞ্চন রেখে কাঁচে ভুলতে চলেছিস ?··· একজোড়া রক্তচোখ ভস্মীভূত করতে ধেয়ে আসছে। ভীত ত্রস্ত অজয় মায়ের বুকে মুখ লুকায়। থর থর করে কাঁপছে দেহ। জননী করুণাময়ী সত্যি স্নেহময়ী—জগদ্ধাত্রী। এক কোলে অজয় আর এক কোলে অসীমাকে বসিয়ে আদরে শির চুম্বন করেন। দুই গণ্ড অশ্রু প্লাবিত। প্রেতলোকে গুরুচরণ আর্তনাদে ফেটে পড়ছে। ভুবন মোহন মৃত্যু বিভীষিকায় ছুটে পালাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, কিন্তু পথ পাচ্ছে না। অবরুদ্ধ চতুর্দিক। আর মুরারী মোহন ক্ষমা প্রার্থী হয়ে অজয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন অসীমাকে। বর বধূর অপরূপ রূপ সজ্জা। স্বপ্ন মায়ায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অজয়ের মুখাবয়ব। ঈষৎ হাসি খেলে যায় ঠোঁটে।

বাইরে চলেছে কাল বৈশাখীর রুদ্র নর্তন। অসীমা হলধরের সংবাদে স্থির থাকতে পারেনি। ঝড় জল মাথায় করেই ছুটে আসছে। বন্দর থেকে শেষ খেয়া ছেড়ে যায়। সময়মত ওকে পৌঁছতেই হবে। সুপ্রভা বাধা দেন না। বৃন্দাবনের গোপিনীরা রথের তলায় শুয়ে পড়েই তো শ্রীকৃষ্ণের গতি রোধ করতে চেয়েছিলেন। যার জিনিস সে তার যথা কর্তব্য করুক।···

বুঝিবা মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। অসীমার হুঁশ নেই, প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলেছে। হলধর পেছন থেকে চীৎকার করে গতি রোধ করতে

চেষ্টা করে। ঝড়ের শব্দে কোন প্রত্যুত্তর কানে আসে না। বিশ্ব বুঝি খান খান হয়ে ভেঙে যায়। আর একটি বাঁক ঘুরলেই রায় চৌধুরী বাড়ী। পথ আর ফুরোয় না। অসীমা ভিজা চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে আরো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। একি! পথ যে রুদ্ধ। বড় তেঁতুল গাছটা সমূলে পড়ে আছে দৈত্যের মতো। এদিক ওদিক হদিস না পেয়ে মোড় ঘুরেই ছুটতে থাকে। ঝড়ের দাপট আরো ক্ষিপ্রতর হয়ে ওঠে। প্রকাণ্ড একটা আমের ডাল ছিটকে এসে মাথায় পড়ে। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অসীমা। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাথার খুন এক হয়ে মিশে যায়। হলধর খুঁজেত খুঁজতে কাছে এসে আঁতকে ওঠে। তাড়াতাড়ি নিজের কাপড় ছিঁড়ে পটি বেঁধে দেয়। অসীমা যখন সুস্থ হয়ে ওঠে রাত তখন ফরসা।

ঝড় জল থেমে গেছে। ঝড়ের পাখীও উধাও হয়েছে ঝড়ের সঙ্গে। শুধু রেখে গেছে ডানা থেকে একটি পালক—ছোট্ট একটি পত্র—

"অমু, আমি অক্ষম। তাই চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি—। তোমরা সকলে আমাকে ক্ষমা করো। ইতি—

হতভাগ্য—

অজয়—

৪

কোলকাতার মানিকতলা অঞ্চল। সার্কুলার রোড আর বিবেকানন্দ রোডের জংসনে দক্ষিণ ফুটপাতের ওপর চারদিক খোলা হলুদে রংয়ের ত্রিতল বাড়ীখানায় হরেকরকম লোকের বাস। শিক্ষয়িত্রী, নার্স, অভিনেত্রী, ক্যানভাসার, সাহিত্যিক অর্থাৎ একের মধ্যে বহুর সমাবেশ

তেতালার সামনের ফ্লাটখানা ভাড়া নিয়েছে রেবা বোস। তিনখানা শোবার ঘর, পৃথক রান্না ঘর ও বাথরুম। কল জল নিয়ে কারো সঙ্গে ঝগড়া হবার আশঙ্কা নেই। রেবার একক জীবন। বেশ আরামেই বাস করছে। একখানি ঘর শোবার ও একখানি বসবার জন্য নির্দিষ্ট রেখেও একখানি বাড়তি আছে। শোবার ও বসবার ঘর দুখানি খাট, টেবিল-চেয়ার, সোফায় সুসজ্জিত। তৃতীয়টিতে আছে শুধু একটি একক খাট, একটি টিপয় ও দুখানা চেয়ার। জামা কাপড় রাখার জন্য একটি আলনাও আছে পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে। উত্তর দক্ষিণে মাত্র দুটি জানালা ও বাইরের বারান্দা থেকে প্রবেশ করবার একটি দরজা। ভেতর থেকে সোজা বাথরুমে যাবার আরো একটি দরজা আছে উত্তর পশ্চিম কোণে। শোনা যায় রেবা নিজ খরচায় করিয়ে নিয়েছে এটি।

বছর পাঁচেক হবে, বে-সরকারী এক হাসপাতালে চাকরি করছে রেবা। নার্সের কাজ। বছর পঁচিশ হবে বয়েস। নিটোল স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গায়ের রং। বাঙালী নার্সরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সদের মতো চটপটে নয় বলে যারা অপবাদ দেন, রেবাকে দেখলে তাঁদের সে ধারণা বদলাবে। সাদা ধবধবে এ্যাপ্রন প'রে ও যখন রাস্তায় বেরোয়, সত্যি সে এক জীবন্ত ছবি। উদ্যম আর উৎসাহের মূর্তিমতী উৎস। চটুল চোখের চপল দৃষ্টি পথিকের চোখ ধাঁধায়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন না কোন পশ্চাৎ অনুসরণকারী প্রেমিক ট্রামে বাসে ওর পাশের সিটটিতে বসে কটাক্ষে প্রেম নিবেদন করছে। হয়তো ওর সদা উৎফুল্ল মুখখানাই এর জন্য দায়ী। কাল-পেঁচার মতো গোমড়ামুখো হয়ে কিছুতেই পথ চলতে পারে না রেবা। হয়তো বা মানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য স্বেচ্ছায়ই ও এরকম কৌতুক সৃষ্টি করে থাকে। কর্তৃপক্ষের বেশ সুনজরেই পড়েছে। আশানুরূপ

বেতনবৃদ্ধিও আটকায়নি। তবু কি জানি কেন, সামান্য কিছু কথা কাটাকাটির অছিলায় কাজে একদিন ইস্তফা দিয়ে বসে। গভর্নিং বডির অনেকে মত পরিবর্তনের জন্য উপদেশও দিয়েছিলেন ওকে। কিন্তু রেবা অচল অটল। চাকরি ছাড়াও ওর দিন চলবে। নিজেই খুলবে এক প্রসূতি সদন কিংবা নারীরক্ষা সমিতি। বর্তমান আবাস স্থলটি সেই উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত। সাইন বোর্ডও ঝুলছে একটি। সময়ে অসময়ে দুটি একটি শিশুর চীৎকারও শোনা যায়। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যুবক যুবতীর ভিড় অপেক্ষাকৃত বেশী। গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাদের আনাগোনা। ছোট ঘরটিতে জ্বলে ওঠে ক্ষীণ নীল আলো। একদল আসে আর একদল বেরিয়ে যায়। রেবার জৌলুস যেন দিন দিন উপচে পড়ছে। পাড়ার লোক অপবাদ দেয়, অচলা নারীরক্ষা সমিতি ও প্রসূতি সদন অবৈধ প্রতিষ্ঠান। অনাথা নারী :ও শিশু বিক্রয় থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী ঘটিত সব কিছুই চলে এখানে অবাধে। রেবা মনে মনে হাসে। শহরের হোমরা-চোমরা ব্যক্তিরা ওকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অনেকেই নিয়মিত চাঁদাও দেন। উপরন্তু যোগানন্দ ব্যায়ামাগারের ডানপিটে ছেলেরা ওর স্বেচ্ছাপ্রহরী। ছা-পোষা ভীরু প্রতিবেশীদের থোড়াই কেয়ার করে ও।

প্রসার বেড়ে চলেছে রেবার। তবু হঠাৎ একদিন সকালে দেখা যায়, পুলিস ঘের দিয়েছে সদন। তল্লাশির পর ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় রেবাকে ও সে রাত্রের অতিথি আর দুটি যুবক যুবতীকে। পরস্পর আলোচনায় জানা যায়, কোথাকার কোন ভ্রূণ হত্যার অপরাধে নাকি ও অপরাধী। হাইকোর্টের আপিলে মুক্তি পেলেও আর্থিক অনটন এভাবে ঘিরে ধরে যে, ওর পক্ষে বরং কারাবরণই ছিল শ্রেয়। দেহের জৌলুস, নিম্ন ওষ্ঠের অফুরন্ত হাসি উবে যায়। উপর্যুপরি তাগিদে,

কোথাও গা ঢাকা দিতে পারলেই যেন বেঁচে যায়। মনে মনে স্থির করে, আবার কোথাও চাকরি নেবে।

বড়বাজারের গোয়েঙ্কাবাবুরা বায়ু পরিবর্তনের জন্য ভুবনেশ্বর যাবেন স্থির হয়েছে। একজন শিক্ষিতা উদ্যমশীলা সহচরী আবশ্যক। রেবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সশরীরে উপস্থিত হয়। শ্রীমতী গোয়েঙ্কার খুব মনে ধরে ওকে। এক কথায় চাকরি হয়ে যায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে রেবা। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বাইরে না গেলে নয়। গোয়েন্দার উৎপাত অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

শহর ছেড়ে আসতে প্রথমটা রেবার যেরূপ আশঙ্কা হয়েছিল, এখানে পৌঁছে, এখানকার মনোরম দৃশ্যাবলী দেখে তা কেটে যায়। কোনদিন সকলের সঙ্গে, কোনদিন বা একাকীই খুব ভোরে উঠে খণ্ডগিরি কিংবা উদয়গিরির পথে বেরিয়ে পড়ে। এখানকার সব কিছুর মধ্যেই যেন স্পর্শমণির প্রভাব মেশানো। অতীতের সব কিছুই ভুলতে চলেছে ও। নির্ঝরিনীর ঝরনাধারায় হৃদয়ের সমস্ত ময়লা মাটি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। রেবার জীবনে এ এক নবতর অনুভূতি। ধরা ছোঁয়ার বাইরে কি এক অজ্ঞাত অপ্রাপ্য আকর্ষণীর সঙ্কেত যেন হৃদয়ের মণিকোঠায় গুমরে উঠছে। কাকে চাই, কি চাই, স্পষ্ট বুঝতে পারে না, তবু চাই। যা চাই, তা যেন কোনদিন পায়নি। প্রবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, রিক্ত জীবন। গোটা অতীত ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে···ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে ওঠে রেবা। কর্তৃপক্ষকে কাজে সন্তুষ্ট করে নিরালায় যতটুকু সময় পায় আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে পারলেই যেন তৃপ্তি হয়।

একমাস অতীত হয়ে চললো, ভুবনেশ্বরে আছে রেবা। কর্তৃপক্ষের কাজে তেমন কড়াকড়ি নেই। সময় মতো সামান্য ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা আর শ্রীমতী গোয়েঙ্কাকে ঘন্টা খানেক করে বাংলায় রামায়ণ পড়ে শোনানো। শ্রীমতী গোয়েঙ্কার বাংলা ভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগ।

বাংলায় রামায়ণ শুনে ধর্মচর্চার সঙ্গে ভাষা শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করাই তাঁর নীতি। রেবার নিজের পক্ষেও এ সময়ে এ অভ্যাস ওষুধের কাজ করছে। কৃতজ্ঞ ও শ্রীমতী গোয়েঙ্কার কাছে। বড় লোকের খেয়াল তাই, নয়তো সামান্য এই কাজের জন্য কে একজন সহচরী রাখে? শ্রীমতী গোয়েঙ্কা খুব প্রীত ওর প্রতি। কখনো ওকে বিষণ্ণ দেখলে কাছে ডেকে বসান। আন্তরিক স্নেহে শুধোন, তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই রেবা? আমার কাছে থাকবে তুমি?···রেবার বুক ফেটে কান্না আসে, সহজভাবে উত্তর দিতে পারে না। শুধু ঘাড় কাৎ করে সায় দেয়, ওঁকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না।

৫

গত রজনী নিদ্রাহীন কেটেছে বেরার। অতীতের একটা দুঃস্বপ্ন ওকে নিদারুণ পীড়া দিয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মনটা বিষাদে ভরে যায়। সারাদিন কিছুই ভাল লাগে না। যন্ত্রের ন্যায় দৈনন্দিন কাজটুকু সেরে বিকেলে একাকী বার হয় খণ্ডগিরির পথে। আকাশ ছোঁয়া চূড়া আজ ওর লক্ষ্য।

অপ্রশস্ত লাল মাটির পথ এঁকে বেঁকে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। গোধূলির আবছা আলোয় একাকী ছুটে চলে বেরা। লোকজনের চিহ্ন নেই কোথাও। ক্ষুধিত শার্দুল শিকারের জন্য ওত পেতে থাকে এ সময়, এই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উক্তি। কিন্তু বেরার ভ্রূক্ষেপ নেই। ও চলেছে আপন খেয়ালে। হৃদয়তন্ত্রীতে জেগেছে পূরবীর সুর। উদ্দেশ্যহীন অনন্ত যাত্রা।

সন্ধ্যার কালো ছাউনি পড়ে পাহাড়ের গায়ে। বেরা তবু অচল অটল। অনেকটা ওপরে উঠে পড়েছে। নীচে স্তিমিত অন্ধকার। দুর্গম

পথের হেরফেরকে কাটাবার জন্য পাহাড়িয়াদের ছেলে ঘুরণকে মাঝ পথে সঙ্গে নেয়। ঘুরণেরও যেন কোন চাঞ্চল্য নেই। উৎসাহ দিয়েই চলে রেবাকে। মন উত্তেজিত—দেহ ক্লান্ত। রেবা একটা বেদীর ওপর বসে খানিক জিরোতে থাকে। বসন্তের বাতাস দোল দিয়ে যায়। একটু পরেই চাঁদ ওঠে আকাশে। পূর্ণিমার চাঁদ। পাতায় পাতায় ছায়াবাজী। অভিভূত হয়ে পড়ে রেবা। কনুইতে ভর দিয়ে অর্ধশায়িত দেহ এলিয়ে দেয় বেদীর ওপর। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে আসে। ঘুরণ আপন খেয়ালেই কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিক বাদে আবার ফিরে আসে একগোছা বনজ ফুল নিয়ে। হয়তো বকশিশের মতলব। রেবা স্বপ্ন মগ্ন। সারাদিনের অস্বস্তি থেকে একটু হাঁপ ছাড়বার ফুরসত পেয়েছে। ঘুরণ ধীরে ধীরে রেবার নাকের কাছে ফুলের গোছাটা ধরে পরীক্ষা করে দেখে। না, সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে ঠাকরুণ। চাঁদের আলোয় সারা দেহ স্বপ্নায়িত। সুডোল হাতে সরু বালা দু'গাছা জ্বলছে। গলায় হার ছড়া কি সুন্দর! লোভে আত্মহারা হয়ে পড়ে পাহাড়িয়া। কিন্তু এভাবে গায়ে হাত দিলে জেগে যাবে যে। ছিনিয়ে নেওয়াও নিরাপদ নয়। খানিক ইতস্তত করে ট্যাঁক থেকে কি যেন একটা শিকড় বার করে। এদিক ওদিক চেয়ে খানিকক্ষণ ধ'রে থাকে রেবার নাকের ডগায়। অচেতন তনু অসাড় হয়ে পড়ে। জীবনে আর জাগবে কিনা কে জানে। ক্ষুধিত শার্দুলের পেটেই হয়তো হবে শেষ সমাধি।··· পাহাড়িয়া খুশীতে ডগমগ। ঝাঁ করে হার ছড়া ও বালা দু'গাছা খুলে নিয়ে চম্পট দেয়।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। নিকটে কোন জনমানবের সাড়া শব্দ নেই। রেবা একাকী—সংজ্ঞা হারা। গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন দেহলতা। সহসা দূর হতে টর্চের আলো ঠিকরে পড়ে। নৈশ পাখীর পাখসাট ধ্বনিত হয় গাছের শাখায়। আরো নিকটতম দূরত্বে পুনরায়

আলো জ্বলে ওঠে। একটি বলিষ্ঠ যুবক সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে ওঠে, কে ও ওখানে! দেহরক্ষী বলিষ্ঠ দুই পাহাড়িয়ার সঙ্গে অতর্কিতে থেমে পড়ে। যুবক দৌড়ে রেবার কাছে এসে আবার টর্চের বোতাম টেপে। না, কোন ক্ষতের চিহ্নতো নেই; তবে! এদিক ওদিক চেয়ে কাকেও দেখতে পায় না। তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে রেবার। ফ্লাস্ক খুলে জলের ঝাপটা দিতে থাকে চোখে মুখে। দশ পনেরো মিনিটেও কোন সুফল লক্ষ্য হয় না। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র শ্বাপদের ভয়ও বাড়ছে। যুবক সঙ্গীদের সাহচর্যে নিজের বাংলোয় নিয়ে চলে রেবাকে। আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি, সময়মতো ডাক্তার না দেখাতে পারলে কোন আশাই ছিল না রেবার।

খণ্ডগিরির সানুদেশে বাংলো। দেহরক্ষী ও পাচক ভিন্ন বাংলোয় অবশিষ্ট কেউ নেই। ডাক্তারের নির্দেশ মতো যুবক নিজে রাত জেগে রেবার শুশ্রূষা করে চলেছে। ফুটফুটে মেয়েটি, বাঁচবে কিনা কে জানে! হয়তো সঙ্গীদের হারিয়ে ফেলে পথে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস কোন হিংস্র শ্বাপদ খোঁজ পায়নি!···

নিস্তব্ধ রাত্রি—রোগিণী সংজ্ঞাহীনা। যুবক একাকী সংশয়ের দোলায় দুলছে। অসামান্য আকর্ষণ ঐ সংজ্ঞাহীন দেহে। ও কি···না না, একি দুর্বলতা। অসহায়া নারী। সেবা করবার সঙ্কল্প নিয়ে বাংলোয় এনেছে। হয়তো কারো গৃহলক্ষ্মী। দুর্জনের আকস্মিক আঘাতে ঢলে পড়েছে··· যুবক উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। নক্ষত্রে নক্ষত্রে ছেয়ে আছে অনন্ত আকাশ। নির্মল চাঁদ ঢেলে দিচ্ছে স্বচ্ছ জ্যোতির্ধারা। গগন ভুবন জুড়ে সৌন্দর্যের হাট। অন্তরে বল পায় যুবা। আবার ফিরে আসে রোগিণীর শয্যায়। দুটো বেজে যায় দেয়াল ঘড়িতে। রোগিণীর বাঁ-হাত খানা টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে দেখে। গতি কিঞ্চিৎ বেড়েছে বোধ হয়। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে কি ওর?··· তাড়াতাড়ি কাঁচুলি উন্মুক্ত করে দেয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘার হৈম রাগে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। আদিম তৃষ্ণায় টনটন করতে থাকে বুকের ভেতর। অন্তঃসলিলা ফল্গু বয়ে চলেছে দৃষ্টি-পথে। তবু পান পাত্র ভরে নেবার উপায় নেই। মাথার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যায় বুঝি···যুবক পুনরায় উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। সুশীতল বাতাসে ধমনীর রক্ত শীতল হয়ে আসে। কালপুরুষ পশ্চিম গগনে হেলে পড়েছে। রাত্রির শেষ প্রহর। রেবা চোখ মেলে তাকায়। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে—কে আপনি? এখানে এ আমি কোথায়?

যুবক শয্যার কাছে ফিরে এসে প্রবল উৎসাহে সান্ত্বনা দেয়, ভয় নেই, চুপ করুন। বেশী কথা বলা নিষেধ।

রেবার ঘোর কাটেনি। আবার চোখ বুজে যায়। কোন উত্তর দিতে পারে না। যুবক হাত পাখা দিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে থাকে। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখে উৎকণ্ঠায়। না, রেবা বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়ে আবার। কোন সাড়া শব্দ নেই।

উদয়গিরির চূড়া লাল হয়ে ওঠে। কলরব করে জেগে ওঠে ভোরের পাখী। সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পায় রেবা। পুনরায় বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করে, আমি এখানে কেমন করে এলাম?

তবু বেঁচে উঠেছেন ভাগ্যিস। নয়তো পুলিসের জবরদস্তিতে শেষটায় না আমাকেই শ্রীঘর যেতে হ'তো, খুশীতে উত্তর করে যুবক।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে কি রেবা! স্বপনপুরীর সেই রাজকুমার কি ওর শিয়রে বসে আলাপন করছে? নিম্ন ওষ্ঠে কিঞ্চিৎ হাসি খেলিয়েই জবাব দেয়, সে আশঙ্কা যখন আপাতত আর নেই, তখন কি হয়েছিল বলুন না?

রোমান্‌স্ শোনবার আগে এইটুকু চুমুক দিয়ে সবল হয়ে নিন,

নয়তো হার্টফেল করে আমায় না আবার নূতন করে বিপদে ফেলেন। বলতে বলতে ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ গরম দুধ ঢেলে রেবার মুখের কাছে ধরে।

ঢোক গিলে নিয়ে রেবা বাধা দেয়, না, অত দুর্বল আমি নই। আপনি বলুন।

দেখলেন তো, আপনাদের ধারাটাই উল্টো। আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই অথচ দম্ভ আছে মহারথীর। ঝামেলায় কাজ নেই, আগে একটু শক্ত হয়ে নিন, যুবক এক চামচ গরম দুধ এক প্রকার জোর করেই রেবার মুখে ঢেলে দেয়।

দুধটুকু গিলে পুনরায় আব্দার করে রেবা, নিন হ'লো তো? এবার বলুন।

উঁহু, সবটুকু আগে খেয়ে নিতে হবে।

বাপরে বাপ, কি জিদ আপনার, দিন? সবটুকু দুধ এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে পুনরায় আব্দার করে রেবা, বলুন এবার।

যদি বলি চুরি করে এনেছি, ঈষৎ হেসে উত্তর করে যুবক।

তা'হলে বলবো ঠকেছেন।

মানে?

মানে, চুরি করে আনবার মতো মূল্যবান সামগ্রী আমি নই।

তাই নাকি? তাহ'লে আর মিছে শ্রীঘর খেটে লাভ কি বলুন?

হেঁয়ালি রেখে বলুন না, কি হয়েছিল?

দেখবেন, শেষটায় যেন অপবাদ দেবেন না।

আপনি আচ্ছা ঝগড়াটে লোক তো?

ঝগড়া করবার লোক কোথায় যে ঝগড়া করবো? একা একাই তো পড়ে আছি এই নির্জন বাংলোয়। যুবক তির্যক কটাক্ষ হানে রেবার দিকে। রেবাও হয়তো মুহূর্তে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়।

যুবক অবস্থা বুঝেই মৃদুহাস্যে পূর্ব কথার জের টানে, বেলা বেড়ে চলেছে, আপনার উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে লাভ নেই। গত রাতের রোমানস্‌টাই বলছি শুনুন, খণ্ডগিরির পথ ধরে শিকার করে ফিরছিলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। গাছের ছায়ায় আবছা ঠেকছিল, টর্চের বোতাম টিপলাম। পড়তো-পড় আলোটা একেবারে আপনার মুখের ওপরে গিয়েই পড়লো। চেয়ে দেখি আপনি অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। ছুটে গিয়ে ফ্লাস্কের সমস্ত জলটা আপনার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলাম। জল বাতাস চললো ঘণ্টা খানেক। কিন্তু আপনার ছিল তখন কালঘুম, কিছুতেই কিছু হলো না। হিংস্র শ্বাপদের ভয়ও বাড়ছিল ক্রমশ। তাড়াতাড়ি অনুচরদের সাহায্যে নিয়ে এলাম এই শূন্য বাংলোয়। কিন্তু ডাক্তার এসে যা বললেন, তা'তে চক্ষু স্থির। আর খানিকটা দেরি হলেই নাকি কেল্লা ফতে হয়ে যেতো।···ওকি আপনি চমকে উঠছেন কেন? এখন আর সে ভয় নেই, সম্পূর্ণ বিপদ কেটে গেছে। পুনরায় কটাক্ষ করে যুবক।

রেবার ধুধু সব মনে পড়ে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উত্তর করে, কি সর্বনাশ! ভগবানকে ধন্যবাদ যে, ঠিক সময়ে আপনি গিয়ে পড়েছিলেন। নয়তো···

খুব যাহোক, উপকারটা করলুম আমি, আর ধন্যবাদটা পেলেন কিনা ভগবান! পোড়া বরাত আর কাকে বলে?···মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর করে যুবক।

আপনি আচ্ছা ঝগড়াটে তো। তা ধরুন···

আর ধরে কাজ নেই আমি চললেম। কাল সারারাত জাগতে হয়েছে, এখন স্নানাহার সেরে একটু ঘুমোতে না পারলে একটুও বসতে পারবো না। তা'ছাড়া আপনিও সুস্থ নন যে, বাগযুদ্ধে পেরে উঠবেন ···বলতে বলতে যুবক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

দু'পা অগ্রসর হতে না হতেই রেবা পেছু ডাকে, দেখুন, আমাকে কিন্তু এক্ষুনি যেতে হবে। আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাইনে। তবে—

তবে কি বলুন, থামলেন কেন? এখন উঠলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারেন, তা জানেন? ডাক্তার সাহেব বলে গিয়েছেন, আপনার সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে। হয়তো এতক্ষণে তিনি এসে পড়বেন, আজকেও আপনাকে দু'টো ইনজেকসন্ নিতে হবে।

না না, আমি আর ইন্‌জেকসন্ নিতে পারবো না, আপনি দয়া করে ওঁকে আসতে বারণ করে দিন।

পাঁঠার ইচ্ছেয় ঘাড়ে কোপ পড়ে না। আমাদের হাতে যখন পড়েছেন তখন একটু জবরদস্তি সহ্য করতেই হবে। তারপর খুশিমতো "বে আইনী আটক রাখা অথবা নারী-হরণ" যা-ইচ্ছে আর্জি পেশ করতে পারেন। আদালতের দোর তো বন্ধ রাখতে পারবো না? দয়া করে ওঠবার চেষ্টা করবেন না যেন, রেবাকে নিরস্ত করে পুনরায় অগ্রসর হয় যুবক।

রেবা চুপ করে বিছানার ওপর বসে থাকে। অপলক দৃষ্টি। একটি কথাও বলতে পারে না। শুধু দীর্ঘশ্বাসে ফেটে পড়ে।

৬

মধ্যাহ্ন আহার শেষ করে ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নিজকে অনেকটা সুস্থ বোধ করে যুবক। ডাক্তারের নির্দেশ মতো লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য কাছে বসিয়ে খাইয়েছে রেবাকে। স্বেচ্ছায়ই বেশী বাক্যজালের ধূম্রা বিস্তার করেনি তখন। ঘুম থেকে উঠেও হাতে থাকে প্রচুর সময়। ইচ্ছে করে, রেবার কাছে গিয়ে একটু গল্প করে, যদি সম্ভব হয় ওর পরিচয় জেনে নেবে। কিন্তু সক্রিয় হতে পারে না। রোগিণীরও হয়তো

বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে। বড় একটা ধকল গিয়েছে গত রাত্রে। আজো দুটো ছুঁচ ফুটাতে হয়েছে। যাক, একটু বিশ্রাম করুক। রোগা শরীরে বেশী বকালে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া, কে রেবা? নিশার আলেয়া। নিশা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উবে যাবে। সকালেই তো যাবার জন্য ব্যস্ততা দেখিয়েছে। সামান্য একটু কৃতজ্ঞতা জানানো ছাড়া কি দেবার আছে ওর? আর দেবেই বা কেন?……যুবক নিরস্ত হয়।

বসন্তকাল। খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিক। ঘুম পাড়ানিয়া সারাটা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে রেবা। আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। বিছনার ওপর উঠে বসে। এলোমেলো চিন্তা উঁকি দেয় নিভৃত মনে। কে জানে, এক রাত্রি অনুপস্থিত থেকে হয়তো শ্রীমতী গোয়েঙ্কার কাছে কলঙ্কিনী প্রতিপন্ন হয়েছি। হয়তো কোন কথাই তিনি আর বিশ্বাস করবেন না। এ লাইনের মেয়েদের সম্বন্ধে তো সাধারণ লোকের এমনিই ধারণা।……কোলকাতা, সেখানেও ফিরে যাবার উপায় নেই। পাওনাদার আর পুলিস, দুই-ই জোঁকের মতো ছেঁকে ধরবে!…… ইতস্তত চিন্তায় রেবা অস্বস্তি বোধ করে। যুবকের প্রতিও কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ হয়। এতটা সময় ঘুমিয়েও কি শরীর সুস্থ হলো না? মানুষ একা একা কি করে চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারে এতক্ষণ? বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে আসে। না, যুবকের ঘর, তেমনি বন্ধ। কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসে। সহসা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রেবা। এইতো আলমারির মধ্যে এক গাদা বই রয়েছে। এতক্ষণ নজরেই পড়েনি। বই থাকলে আমার সঙ্গীর দরকার কি? কিন্তু চাবি? চাবি না হলে আলমারি খুলবে কি করে? চাকরটাই বা গেল কোথায়?

রেবাকে বেশীক্ষণ হাবুডুবু খেতে হয় না। চাকর এক বাটি গরম

দুধ ও কিছু ফলমূল নিয়ে সেই মুহূর্তেই হাজির হয়। মনিবের নির্দেশে ঘড়ি দেখে ব্যবস্থা। কিছুটা পুলক হলেও রেবার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। চাকর দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা। এতটা পর ভাবলে, সকালে ছেড়ে দিলেই তো হ'তো? কি দরকার ছিল বৃথা দরদ দেখাবার?·····আলমারির গায়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই পুনরায় লজ্জা পায়। ছি ছি, কি অভদ্র আমি? বেচারা কাল সারা রাত জেগে কাটিয়েছে। একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার বই কি? খিদে তো সত্যি খুব পেয়েছে! তাড়াতাড়ি চাকরের হাত থেকে ডিশটা নিয়ে ওকে আলমারি খুলে দিতে অনুরোধ করে। টেবিলের ড্রয়ারেই ছিল চাবি। চাকর আলমারি খুলে দেয়। রেবা দুধের বাটিটাতে চুমুক দিয়ে ছেড়ে দেয় ওকে। আর কোন ভাবনা নেই। এক বেলা কেন সাত বেলা ও নিশ্চিন্ত হয়ে ডুবে থাকতে পারবে বইয়ের মধ্যে।

গত শারদীয় সংখ্যার সচিত্র উর্বসী খানা হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় রেবা। ইজিচেয়ারে এলিয়ে দেয় ক্লান্ত দেহ। পড়া শুরু করার আগে আগা গোড়া পাতা উল্টিয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়। প্রবন্ধ দুচক্ষের বিষ। গল্প আর কবিতায় ডুবে যেতে পারে ও। পত্রিকাখানির পরিচালক বোধ হয় ওর মনের খবর রাখেন। প্রবন্ধ নেই বললেই চলে। শুধু শারদীয়া দেবীর কিঞ্চিৎ বন্দনা মাত্র। তাও গল্পের মতো করেই লেখা। রাশিকৃত গল্প আর কবিতার মনোজ্ঞ সমাবেশ। পরিবেশনে নতুনত্ব আছে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে রয়েছে লেখকের ফটোগ্রাফ। পাঠক মাত্রেরই শিল্পীকে দেখবার থাকে অদম্য স্পৃহা। সচিত্র উর্বসীর পরিচালক পাঠক মনের সে খবর রাখেন। কৌতুহল বেড়ে যায় রেবার। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে যায়। গল্পের নাম "মনের দাবি" লেখক শ্রীঅশোক রায়। পাশেই রয়েছে তার সুশ্রী ফটোগ্রাফ। কিন্তু কে এ? কখনো দেখেছে

কি রেবা ওকে?···দুরাকাঙ্ক্ষার ঝড় ওঠে অন্তরলোকে। বসন্তের বাতাস দোল দিতে থাকে। ওর গত রাত্রের আশ্রয়দাতা লেখক! শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে পড়েছে ও! সৌভাগ্য বই আর কি বলা যেতে পারে? শিল্পীকে যে ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে! ওযে শুনেছে, তারা সত্য সুন্দর শিবের উপাসক। জ্বালাময় জীবনে পাবে কি তাঁদের সস্নেহ প্রাণের স্পর্শ?···রেবা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে "মনের দাবির" পাতা উল্টাতে থাকে। পড়া শেষ করেও যেন মনের পড়া শেষ হয় না। অকাট্য যুক্তিজালে অনুপম রচনা শৈলী। খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে রেবা। শিল্পীকে ও নয়ন ভরে দেখবে! মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবে তাঁর সঙ্গে। মনের আনাচে কানাচের সন্ধান রাখা কি করে সম্ভব তাঁদের পক্ষে? কিন্তু অশোক বাবু এত দেরি করেছেন কেন? যাবে কি দোরে করাঘাত করতে? শিল্পীর ধ্যান ভেঙে যায় যদি? অসময়ে ধ্যান ভাঙানোতেই তো জগদ্‌পতি জগন্নাথের মূর্তি গড়া শেষ হয়নি। না না, ও তেমন বোকামি করবে না। নিশ্চুপ শুয়ে থাকে ইজিচেয়ারে। মনে বইতে থাকে খুশীর হাওয়া। আর কিছু পড়তেও ভাল লাগে না।

অশোকও অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। ঘুম ভেঙেছে তো অনেকক্ষণ। চুম্বকের আকর্ষণ থেকে কতক্ষণ গা বাঁচিয়ে চলা যায়? তাছাড়া ভদ্রতাও রাখা উচিত। অচেনা জায়গায় বেচারার পক্ষে একাকী চুপচাপ শুয়ে থাকা কি করে সম্ভব? গন্তব্যস্থলে পাঠিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাড়ীর লোক হয়তো এতক্ষণ থানা পুলিস করছেন।··· সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে অশোক রেবার ঘরে প্রবেশ করে। চোখ বুজে স্বপ্ন দেখছিল রেবা। অতর্কিতে সোজা হয়ে বসে।

অশোক লজ্জা পায়, এই যে, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম হয়তো।

রেবা কপটতার আশ্রয় নিয়েই রসিকতা করে, তা করলেই আর কি করছি বলুন?

জবরদস্তি তো আজ দু'দিন থেকেই শুরু হয়েছে।

খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন যে? বলতে বলতে একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি হয়ে বসে অশোক।

হাতযশটা অস্বীকার করে নেমকহারামি করা কি উচিত হবে?

খুব তুলে দিচ্ছেন তো? দেখবেন, শেষটায় না মই কেড়ে নিয়ে হাততালি দেন?

হাততালি মই কেড়ে না নিয়েও দেওয়া যায় শিল্পী। মুচকি মুচকি হাসতে থাকে রেবা।

শিল্পী! কাকে বলছেন, আমাকে? অশোকের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

তৃতীয় ব্যক্তি কেউ আছে নাকি এখানে?

কি করে জানবো? এক কেন, মনে মনে বহু থাকতে পারে।

মনের রাজাতো আপনিই। সে খবর আপনারই জানা উচিত।

মনের রাজা!

নয়তো 'মনের দাবির' বিশ্লেষণ কি সম্ভব? মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর করে রেবা।

অশোক হো হো করে হাসতে থাকে। ও, এই কথা? ওটাও আপনার নজরে পড়েছে?

অপাত্রে বলুন।

ছি ছি, তা হবে কেন? তবে—

তবে ধরে ফেলেছি,—এই তো?

ধরা আর দিলেন কই? সকাল থেকেই তো যাবার জন্য ছটফট করছেন।

তখন কি আর জেনেছিলাম মনের সন্ধান এখানে মিলবে?

সত্যি? থাকুন না আর দু'টো দিন? আপনি কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হননি?

আপনি আচ্ছা লোক তো? যাবার কথাটা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, না তাড়িয়ে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিচ্ছেন না। চোখে চোখ রেখে পুনরায় হাসতে থাকে রেবা।

অশোক সুরে সুর মিলিয়েই উত্তর দেয়, তা যা বলেছেন, ধরে রাখবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। একে তো কোন অধিকার নেই, পরন্তু পুলিসের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার মতো কোন পরিচয়ও জানা নেই। শেষটায়···

হাতে হাতকড়ি পড়ুক, কেমন? অসমাপ্ত কথাটা সমাপ্ত করে রেবা।

যান, আপনি ভারি লজ্জা দিতে পারেন! আমি কি তাই বলছি?

সব কথা বলে বোঝাতে হয় না, রেবা হাসতেই থাকে।

রক্ষে করুন, অত সব জানি নে।

মনস্তাত্ত্বিকের পক্ষে ওটা দুর্লক্ষণ কিন্তু!

হয়তো হবে। কিন্তু আপনি তো বললেন না, এখানে কোথায় থাকেন?

সেইটে জানাই কি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, মিষ্টার রায়?

বেশী কম বুঝিনে, তবে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করার পক্ষে ওটা প্রয়োজনীয়।

তবে জেনে রাখুন, কোন বন্ধনই আমার নেই। কৈফিয়ৎ দেবার বা নেবার মতো সঙ্গীও আজ পর্যন্ত জোটেনি।

তা হলে?

তা হলে ভাবছি, দৈবাৎ যখন এসেই পড়েছি তখন আর ফিরে যাবো কি না।

মিস্ বোস—অশোক কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারে না।

কি হ'লো, থামলেন কেন?

সে কি সম্ভব ?

শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে কি ?

জগৎ বড় নিষ্ঠুর মিস্ বোস। চেঙ্গিস খাঁর অভাব নেই। অশোক গাম্ভীর্য নিয়েই কথাগুলো শেষ করে।

রেবা ধাক্কা খায়। একটু ইতস্তত করে অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে, চেঙ্গিস খাঁদের দৃষ্টি শিল্পীর বিগ্রহের দিকে। আমি নাট-মন্দির ঝাঁট দেবার কথাই বলছিলেম। ঘরে তো দেখছি কেউ নেই, খাওয়া দাওয়াও বোধ করি ভাল জোটে না। আমাকে রাখলে স্বচ্ছন্দে একটা চাকরের খরচা কমাতে পারেন।

ছি ছি ছি, কি বলছেন আপনি ? মিছিমিছি লজ্জা দিচ্ছেন।

লজ্জা নয় মিষ্টার রায়। এর চেয়ে বেশী চাওয়া আমার পক্ষে দুরাশা। রেবা মাথা নত করে।

অশোক তেমনি গাম্ভীর্য নিয়েই উত্তর দেয়, কিন্তু দুরাশা বুকে করেই ঝড়ের পাখীকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। আপনি কাছে থাকলে শিল্পী বর্তে যাবে। মিস্ বোস, সত্যি বলছেন, আমার এখানে থাকবেন ? অশোক নিজের মুঠোর মধ্যে রেবার হাত চেপে ধরে।

সত্যি মিথ্যে জানিনে মিষ্টার রায়। তবে বিশাল পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। তাই ভাবছিলাম, আশ্রয়দাতাকে ছেড়ে না গিয়ে লতার মতো জড়িয়েই থাকি। তবে স্বর্ণলতার মতো নয়। ওর রূপ থাকলেও আকর্ষণী শক্তি কম, পরগাছা বললেই হয়, যে কোন মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে ফেলা যায়। আমি অপরাজিতা অথবা অন্য কোন শক্তিশালী লতার মতোই আশ্রয় চাই।

যে নিজেই পরগাছা, তার পক্ষে কি অত বড় শক্তিশালী আকর্ষণকে আশ্রয় দেওয়া সমীচীন ; আমি অশ্বত্থ নই, তার বুকে ছোট্ট তমাল। আর রেবার রূপ নেই যে বলবে, আমি বলবো তার চোখই নেই।

তমালের ওপর মাধবীর বিস্তার, কি অপূর্ব সমন্বয়, না রেবা? অশোক হাতের মুঠো আরো শক্ত করে চেপে ধরে।

রেবা ঈষৎ হেসেই উত্তর দেয়, বেশ, তা যেন হ'লো; কিন্তু আমি যদি বলি—এ সোনায় খাদ আছে?

অশোক মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে প্রত্যুত্তর করে, তবে আমি বলবো এ নিছক গিনি সোনা।

রেবা যেন খুশী হতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয়, না, আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে শিল্পীকে জড়াতে চাইনে।

রেবা! না, না, মিস বোস!

ওকি! অমনি লজ্জা এসে বাধা দিল? পুনরায় হাসতে থাকে রেবা। ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণী ঝরে পড়ে সে হাসির মধ্যে।

তুমি এতক্ষণ তাহলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখছিলে?

পরীক্ষা নয় বন্ধু, সত্যি আমার ছোঁয়াচে তোমার অকল্যাণ হবে।

তাহলে তো সত্যি আমি এমন দরদীকে ছেড়ে দিতে পারিনে। নিজের চেয়ারটি রেবার আরো কাছে টেনে নেয় অশোক।

কিন্তু ছেড়ে দিলেই বোধ হয় ভাল করতে!

ভাল আমি চাইনে!

তবে যেতেও আমি চাইনে। রুগ্নতার মধ্যেও রেবার গোলাপী অধর রক্তিম হয়ে ওঠে। বসন্তের কোকিল ডেকে ওঠে বনপ্রান্তে।

৭

রেবার সরস জীবন নীরস পাহাড়ের দেশে আদৌ ভাল লাগে না। আগ্রার তাজমহল, রাজধানী নয়াদিল্লী, কাশ্মীরের হ্রদ, দার্জিলিংএর টাইগার হিল দেখে ফিরে আসে কোলকাতায়। এবার আর উত্তর

অঞ্চলে নয়, প্রগতির অলকাপুরী বালীগঞ্জে। লেকের ধারে দুধের মতো ছোট্ট বাড়ীখানা। উপরে নীচে চার পাঁচখানা ঘর, সবুজ লন, মরশুমী ফুলে সুশোভিত পথের দুধার। ঠাকুর, চাকর, ঝি কোন কিছুরই অভাব নেই। রেবা বুঝতে পারে না অশোকের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত। শাড়ী গহনা চাইবার আগে রাশিকৃত এসে জড় হয়। অশোক কি নিঃসঙ্গ ? ব্যর্থ প্রেমিক কি ওকে নিয়ে ভুলে থাকতে চায় ? চলার পথের বন্ধুবান্ধব ব্যতীত কোন আত্মীয়-স্বজনের নামও এ পর্যন্ত কানে শোনেনি। রেবা নিজেকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে। ওর ভয় হয়, পাখী উড়াল দেবে। অতীত জীবনের সঙ্গে এ জীবনের এতটুকু মিল নেই। অশোকের সঙ্গে তাল রেখে চলতেও অনেক সময় হোঁচট খেতে হয়। আভিজাত্যের চুলচেরা বিচারে দেউলিয়া ও। তবু অশোককে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে। রাস্তা ঘাটে সতর্ক হয়ে চলে। ভুলেও উত্তরাঞ্চলের ছায়া মাড়ায় না। যদি অতীতের কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! না না, এতো সঙ্কোচ কিসের ? খুলেই বলবে একদিন সব কথা অশোককে। অশোকের যদি ঘৃণা হয় চলে যাবে। শিল্পী হয়েও কি বুঝবে না ওর মনের কথা ? একদিন কি ওরও ভদ্র জীবন ছিল না ? শুধু, মাঝখানের দুটো দিন কেটেছে পঙ্কিল আবর্তে। কিন্তু সে কি স্বেচ্ছায় ?··· গার্ডেন পার্টি, স্টীমার পার্টি, জন্মতিথি কোন কিছুর মধ্যেই স্বস্তি পায় না রেবা।

শ্রাবণের সন্ধ্যা। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অশোক একাকী পড়ার ঘরে বসে কবিতা লিখছিল। রেবার মনটা আজ ভাল নেই। জীবনের প্রভাত লগ্নের কি একটা কালোছায়া সারাটা দিন ওকে কাঁদিয়েছে। অশোক আজ লেখার মধ্যে ডুবে আছে বলে কোন খোঁজ নিতে পারেনি। রেবার ভাল লাগছিল না। অতীতকে ও ভুলে থাকতেই চায়। কিন্তু অতীত ওকে কিছুতেই রেহাই দেয় না।

টনিক খেয়ে মৃতকল্প রুগী যেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠে, রেবাও তেমনি টনিকের আশায় সন্ধ্যা উতরোলে অশোকের ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু হাসিখুশি হবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিষাদের ম্লান ছায়া অলক্ষ্যে ওর চোখে মুখে প্রকট হয়ে ওঠে। অশোক কাজ শেষ করে হয়তো রেবার কথাই ভাবছিল। লেখা শেষ করে রেবাকে শোনাতে না পারলে তৃপ্তি নেই। সময়মতো ওকে দেখে লাফিয়ে ওঠে অশোক, এই যে, তোমার কথাই ভাবছিলুম। কোথায় ছিলে সারাদিন? বসো, শোন কেমন হয়েছে।

রেবা বাধা দেয়, না, আগে তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো তারপর।

দিন দিন তুমি আচ্ছা বেয়াদব হয়ে উঠছো তো। বৃষ্টির দিনে কবিতা শুনতে চাও না!

রেবা পূর্ববৎ বাধা দেয়, দিনরাত কেবল কবিতা আর গল্প, গল্প আর কবিতা! আহার নিদ্রা কিছু নেই। ওঠো, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে।

তুমি তো আগে এরকম বেরসিক ছিলে না রেবা! দিন দিন তোমার হচ্ছে কি?

হ্যাঁ, সত্যি, তোমাদের মতো সব সময় দিবা-স্বপ্ন ভাল লাগে না।

জানি ভাল লাগবে না। দিন দিন তুমি গদ্য হয়ে উঠছো। আজো জানলার ধারে মুখ ভার করে বসেছিলে তো?

কি করে জানলে?

ও আর জানতে হয় না। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

হ্যাঁ, মনে ছিল না তুমি মনস্তাত্ত্বিক।

তা বটে, তবে তোমার মনের খবর রাখা আজো ঘটে উঠলো না।

চেষ্টা করে দেখেছ কোনদিন? রেবার কণ্ঠে ঝাঁঝ মেশানো।

না দেবী, চেষ্টা করে আমি কিছু বুঝতে চাইনে।

অশোক, আমার একটা কথা শুনবে? রেবার স্বর খাদে নেমে আসে।

চোখের জলের কথা তো?

যদি বলি তাই?

তাহলে শুনে কাজ নাই।

না, তোমাকে শুনতেই হবে।

তাহলে আগে আমার কবিতা, তারপর তোমার কথা।

বেশ—পড়ো।

উঃহু, ওরকম মুখ গোমড়া করে কবিতা শোনা যায় না। উঠে রেবাকে হাতধরে টেনে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসে অশোক।

দুষ্টু কোথাকার! মুখ টিপে হেসে ফেলে রেবা।

এবার শোন :

তব জীবনের দ্রাক্ষা কুঞ্জ যৌবন রসে ভরা
আমার প্রাণের পানের পাত্র তব দেহ মূলে ধরা ;
সখী কি আছে তাহাতে ক্ষতি—
তুমি নিঙাড়িয়া নিজে যদি—
দু' এক বিন্দু দেহ উপহার মরমের তৃষাহরা
আমার প্রাণের পানের পাত্র তব দেহমূলে ধরা।

রেবার সকল ভাবনা মুহূর্তে উবে যায়। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আশোকের দিকে। অশোক চিবুকে মৃদু কম্পন দিয়ে হাসতে হাসতেই অনুরোধ করে, এবার বলো, কি তোমার কথা?

রেবা সহজভাবেই উত্তর করে, আজ থাক।

তবে ওটা চিরদিনের জন্যই তোলা থাক।

আমিও তাই মনে করি অশোক, কিন্তু কি জানি কেন, বার বার আমাকে পীড়া দিতে থাকে।

ওরকম হলে জানলার ধারে গোমড়ামুখো হয়ে বসে না থেকে কবিতা পড়ো।

বেশ, এবার থেকে সেই চেষ্টাই করবো। এখন ওঠো, হাতে মুখে জল দেবে, খাবার সময় হয়েছে।

পুনরায় চিবুক স্পর্শ করে উঠে যায় অশোক। রেবা খাতা পত্র গুছাতে থাকে।

৮

শরৎ সমারোহে দিকচক্র হাসছে। অসীম গগনে ভেসে চলেছে সাদা মেঘ। এখুনি হয়তো চাঁদ উঠবে, দ্বিতীয়ার চাঁদ। আগমনীর সুর বাজছে দিকে দিকে। দেবী দশভুজা আসছেন। বাঙালীর জাতীয় উৎসব। কর্মক্লান্ত মানুষ দু'দিন আনন্দে হাঁপ ছাড়বে। ঘরে ঘরে কেনা-কাটার ধুম লেগেছে। রেবা তৈরী হচ্ছিল। অশোকের সঙ্গে আজ বাজারে বেরুবে। জামা কাপড়ের অভাব নেই, তবু পুজোর উপহার। অশোক ক'দিন থেকেই তাড়া দিচ্ছে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করছে রেবা। গিটারে সুর ভাঁজছে অশোক। রূপ চর্চা সম্পূর্ণ প্রায় রেবার। মার্জিত বেশ-ভূষায় তন্বীতনুতে অনুপম জোলুস। সুর হারিয়ে ফেলে অশোক। বাজনা থেমে যায়। রেবা—রেবা কি কবির স্বপ্ন!···অশোকের অপলক দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হয় আয়নায়। হেসে প্রতিবাদ করে রেবা, ওকি হচ্ছে,—জলে যাবো যে?

আমি দুর্বাসা নই সু, আত্মমগ্ন দুষ্মন্ত। রেবার ছোট্ট নামটাকে আরো ছোট্ট করেই ডাকে অশোক। সু, সুমিতা—সুস্নিগ্ধা—সুনয়না।

রেবা মুখটিপেই পুনরায় প্রতিবাদ করে, তাহলে তো নিদর্শন চাই প্রভু, ঐ সুবর্ণ অঙ্গুরীয়।

ভবিষ্যৎ তো পরের কথা, এখুনি যে মনে করতে পারছিনে। তুমি আমার কে, স্থ ?

রেবার মনে বান ডাকে। ড্রয়ার টেনে একটা সিঁদূরের কৌটো বার করে অশোকের সামনে ধরে, পরিয়ে দাও না !

এসাধ আবার কেন ?

কেন তা জানিনে। তবে এ সাধ আমার জীবনে মরণে।

তুমি দুঃখ পাবে স্থ। বনের পাখীকে খাঁচায় বাঁধবার বৃথা চেষ্টা।

তবে থাক। মুখ ঘুরিয়ে নেয় রেবা।

আঘাত পেলে তো ? এস পরিয়ে দিচ্ছি। হাতের গিটার সোফার ওপর রেখে রেবার সিথিতে সিঁদুর পরাতে থাকে অশোক।

রেবা স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় অশোকের পায়ের ধূলো মাথায় ঠেকায়।

—আচ্ছা বিপদে ঠেকালে তো! বলতো, এখন কি বলে তোমাকে আশীর্বাদ করি ?

আহা ন্যাকা যেন, জানেন না ?

ঠিক বলেছ, পুত্রবতী হও।

সহসা যেন বিদ্যুৎ আহত হয় রেবা। দু'বছর আগের এক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিউরে ওঠে। সেদিন কি ও ভাবতে পেরেছিল, ওর জীবনে আসবে স্বপ্ন ? স্বেচ্ছায় মাতৃজঠোর শয়তানের প্ররোচনায় উপড়ে ফেলেছে। ঘৃণ্য পাপের পথ, পাপ ব্যবসা। সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। এত আনন্দেও কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারে না রেবা।

অশোক অপ্রস্তুত হয়েই উৎকণ্ঠা জানায়, কি হ'লো স্থ ?

কিছু নয়, চলো বেরিয়ে পড়ি।

তুমি কি ভয় পেলে ? চলো, কালকেই এটর্ণির বাড়ী গিয়ে ম্যরেজ-ডিড্ করে ফেলি। তারপর সোজা রেজিস্ট্রারের কাছে।

না না অতো ঝামেলায় কাজ নেই।

হঠাৎ এতো নিরুৎসাহ ?

নিরুৎসাহ নয়, তোমার উৎসাহ থাকলেই যথেষ্ট।

যদি মাঝপথে উড়াল দিই ?

সে তোমার মন।

ঠিক বলেছ। এই জন্যই তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে সু। তুমি যেন মুক্ত বিহঙ্গী। তোমাকে ধরাও যায় না, ধরা দেওয়াও যায় না।

থাক আর কাব্যি করে কাজ নেই। চলো, একটু ঘুরে আসি, বাজারে গিয়েও আজ আর কাজ নেই।

কথাটা যখন উঠেই পড়েছে তখন হঠাৎ থামিয়ে দিয়ো না।

বেশ, কি বলবে বলো ?

তোমার নামে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখতে চাই।

কাব্য ছেড়ে হঠাৎ অর্থনীতির অনধিকার চর্চা ?

অনধিকার কি না জানি না, তবে কদিন থেকেই ভাবছি, কথাটা তোমাকে বলবো ?

তোমার অনেক টাকা আছে তা জানি। তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে অশোক ?

বিয়ে আর টাকা, এদুটোকে আমি এক করছিনে সু। কিন্তু বৈশ্য যুগে বাস করে টাকার গুরুত্বটাকে অস্বীকার করা যায় কি ?

আমার কিন্তু মাথা ধরছে কবি! দোহাই তোমার অর্থনীতি!

সু, মিস্ সেনকে তোমার কেমন লাগে ?

কেন, বেশ ভাল মেয়ে। এম এ পাশ, তাছাড়া—

তাছাড়া আমাকে ভালবাসে, কেমন ?

আমি কি তাই বলছি ? তবে তোমার কবিতা ওঁর খুব পছন্দ।

মিথ্যে কথা। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ছাড়া এযুগের কবির কোন আদর নেই। তুমি ওকে জিজ্ঞেস ক'রোতো, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কয়টি পড়েছে, কিংবা আদৌ পড়বার প্রেরণা বোধ করে কি না? অশোক রায়ের মতো হাজার কবি পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কে তার খোঁজ রাখে। না না, তুমি ভেবো না ওকে আমি ঘৃণা করি, বরং শ্রদ্ধাই করি। বেচারা, এম, এ পাশ করেছে; মোটামুটি রূপ আছে, গান বাজনাও কিছু জানে, তবু কোথাও ঠাঁই হ'লো না। জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নয় বলেই না জীবন নিয়ে এই উঞ্ছবৃত্তি। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা যদি সকলকে কাজ দিতে পারতেন স্থ, তাহলে শুধু কবি কেন, সকল মানুষেরই মর্যাদা বাড়তো।

আচ্ছা বিপদ তো, তুমি এখন ওঠো, লেকচার আমার ভাল লাগ না।

ভাল লাগে না, না? স্থ, তোমার ঐ মুখখানার মধ্যে যে কি বেদনার ইতিহাস লেখা রয়েছে, তা কি আমি জানি না?

রেবা চমকে ওঠে। অশোক কি ওর আনাচে কানাচে সব জেনেছে!

না না, আমি তোমার কোন কাহিনী শুনতে চাইনে, জানিও না কিছু। তবে এটুকু বোঝা শক্ত নয়, নিজের পায়ে যদি তুমি দাঁড়াতে পারতে, তা হলে অনেকখানি বলিষ্ঠ দেখতাম তোমাকে।

রেবা কোন উত্তর দিতে পারে না। বিমূঢ়ের মতোই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

একটু দম নিয়ে অশোক পুনরায় আরম্ভ করে, কালকেই তাহলে আমরা এটর্নির অফিসে যাচ্ছি তো স্থ?

তোমাকে তো বললুম, ওসব ঝামেলা আমার পোষাবে না!

তাহলে কিছু টাকা নাও?

বাঁধতে চাও তো?

না, বাঁধতেও চাইনে, বাঁধা পড়তেও চাইনে।

তা'হলে ?

তোমার দুর্দিনের সম্বল।

তুমি কি ছেড়ে যাচ্ছ ?

ছেড়ে না গিয়ে মরেও তো যেতে পারি !

তুমি কি নিষ্ঠুর অশোক !

সংসারে এরকম বাস্তবের সঙ্গে কি তোমার পরিচয় নেই সু ?

রেবা আবার চমকে ওঠে। তবু গম্ভীরভাবেই উত্তর করে, খুব আছে কবি। কিন্তু মিস্ সেন কিংবা ওর মতো আরো যারা হাজার হাজার রয়েছে তাদের নিশ্চয়তা কোথায় ?

আমি যদি তোমার আগে মরি সু, তাহলে দেশের কাছে সে আর্জি পেশ করে যাবো।

তা'হলে আমার জন্যেও তাই করে যেয়ো।

লক্ষ্মী সু, তুমি এত ভাবো ! চলো, আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়ি।

উভয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে। আজ আর বাজার নয়, লেক।

৯

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কোলকাতায় ফিরে আসে অজয়। হ্যাঁ, পালিয়েই আসে। ইতিহাসের দেবতা পথ রোধ করে দাঁড়ায়ে ছিল কিন্তু ও তাকে আমল দেয়নি। অসীমা হয়তো এখনো তার সঙ্কল্পে দৃঢ় আছে। কিন্তু ওর যে ভরাডুবি হয়ে গেছে। মোহনপুরের চরে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তাকে অন্তর থেকে মুছে ফেলেছিল। অসীমা হৃদয়রাণী হয়ে আসবে। আবার ঘুমন্তপুরী জেগে উঠবে, সংসার হবে জম জমাট। কিন্তু করুণাময়ীর আকস্মিক মৃত্যুতে সে আশাতেও তো ছাই পড়লো। ধাক্কা সামলাতে পারলে না। শুরু হ'লো নিরুদ্দেশ যাত্রা।

সাত বছর রাজপুরে আসেনি। পৃথিবী উল্টে গেছে এই সাত বছরে। কে অসীমা? চেনেনা অজয় এ নামে কাউকে। চিনলেও তার সামনে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে না। সম্মোহিনীর ইন্দ্রজালে আবদ্ধ আজ ও। না না, হতাশ জীবনের প্রাণসঞ্চারিণী পথের সাথী সে। সব ভুলে আছে। সারা জীবন ভুলেই থাকতে চায়। কেউ ওর খোঁজ রাখে এ ও চায় না। খোঁজ দিতেও চায় না কাউকে। পৃথিবীতে চলতে হলে চাই টাকা। সেই টাকাই কেবল চাহিদ মতো যুগিয়ে চলেছেন দেওয়ান শিবদাস। পূর্বপুরুষের বিশ্বস্ত কর্মচারী—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। অজয় তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, কাকেও না যেন খোঁজ দেন তিনি ওর। বৃদ্ধ আঁচলে চোখ মুছেছেন কিন্তু পরকালের কথা ভেবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। সুতরাং অসীমা, হলধর কেউ ওর খোঁজ রাখে না। চোখের সামনে কৃষ্ণার চাঁদের মতো ক্ষয়ে যাচ্ছে অসীমা, কিন্তু শিবদাস অচল অটল।

হাজার টাকার তাগিদ এসেছে অজয়ের কাছ থেকে। শিবদাস বিছানায় শুয়ে, রুগ্ন অক্ষম। হলধরকে দিয়ে ইন্‌সিওর-চিঠি ডাক ঘরে পাঠিয়ে দেয়। রাস্তায় কাকেও দেখানো নিষেধ। চোখ থাকতেও অন্ধ হলধর, লেখা পড়ায় অর্বাচীন। কিন্তু সংসারী বুদ্ধিতে সে অপটু নয়। শিবদাসের নিষেধ আজ্ঞা কৌতূহলের সৃষ্টি করে। খামসুদ্ধ নিয়ে যায় অসীমার কাছে। চক্ষু স্থির অসীমার। শিবদাস সব জানেন, অথচ মুখ বুজে আছেন! অসীমার হাবভাবে ঔৎসুক্য বেড়ে যায় হলধরের। ওর মুখ থেকে অজয়ের সন্ধান পেয়ে আত্মহারা হয়ে পড়ে বৃদ্ধ শিবদাসের প্রতি হয় বিরক্ত। উনি কি তবে সব জেনে শুনে সর্বস্ব গ্রাস করবার মতলবে খোকাকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন? অসীমাকে আজই টেলিগ্রাপ করে দিতে অনুরোধ করে। অসীমা অনেক বুঝিয়ে শান্ত করে হলধরকে। মাকে আগে জানান দরকার। তাঁর নির্দেশেই কাজ

হবে। দুর্গা নাম জপ করতে করতে উঠে যায় হলধর। দিন কয়েক পর সুপ্রভা দেবী 'তার' করেন। অজয়—তাই এসেছিল। কিন্তু চোরের মত পালিয়ে গেল। দেয়ালে মাথা ঠোকে হলধর। সুপ্রভা শয্যা নেন, অসীমা দিনের বেলায় ঘরের বার হতে পারে না। এ হেন অপমানের চেয়ে মৃত্যুই বোধ হয় শ্রেয় ছিল।

রোগ শয্যায় শুয়ে সুপ্রভা ভগবানের নিকট মাথা খোঁড়েন, ভগবান একটু শক্তি দাও, অন্তত কোলকাতা যাবার মতো। আর একবার অজয়ের সামনে দাঁড়াতে পারলে কিছুতেই অজয় পালাতে পারবে না। কিন্তু অসীমা অচল অটল। ও সঙ্কল্প করেছে, কোথাও যাবে না। ওর অজয় এখনো নিরুদ্দেশই আছে। খোঁজ হয়নি তার। যে এসেছিল, সে কারো প্রেতাত্মা।

সুপ্রভার রোগ বেড়েই চলে। গ্রামের ডাক্তাররা ধরতে পারে না কি অসুখ। তবু জটিল অসুখ, মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। দিন দিন বিছানার সঙ্গে লীন হয়ে চলেছেন।

মাকে শহরে নিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার। ঢাকায় তেমন ব্যবস্থা নেই। মনমতো চিকিৎসা একমাত্র কোলকাতায়ই সম্ভব। কিন্তু সেখানে যাবে কি করে। যদি অজয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! অসীমা ভাবে, দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না। রাধা গোবিন্দের ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে আকুল হয়ে প্রার্থনা করে। সংসারে যে আমার আর কেউ নেই ঠাকুর, মাকে রক্ষা করো।···

পাষাণ দেবতার কানে হয়তো অসীমার কাতর প্রার্থনা পৌঁছোয় না। সুপ্রভা মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলেন দিন দিন।

সংবাদ পেয়ে সুলাল আসে কোলকাতা থেকে। ব্যারিষ্টার সুলাল, অসীমার মামাত ভাই। স্কুলে পড়াকালীন সুলাল বারকয়েক রাজপুর এসেছে। অসীমা অপেক্ষা বছর পাঁচেকের বড়। পিঠাপিঠি ভাইবোনের

মতোই একসঙ্গে খেলেছে। অজয়ের সঙ্গেও ভাবছিল। কিন্তু দীর্ঘ ব্যবধানে এখন হয়তো কেউ কাউকে চিনতেও পারবে না। ম্যাট্রিক পাশ করেই স্থলাল বিলেত যায়, সেখানেই কেম্বিজ থেকে বি, এ, পাশ করে, তারপর ব্যারিষ্টারী। অসীমার স্মৃতি ধুধু মনে পড়লেও অজয়কে মনে রাখতে পারেনি। উভয়ের মধ্যে দেখা যখন হয় তখন অজয়ের বয়স মাত্র বার তের। বেশ নাদুস নুদুস চেহারা। ধনীর ঘরের আদুরে গোপাল। অসীমা আরো ছোট। তবু পিসীমার সঙ্গে বার কয়েক নিজেদের বাড়ীতে দেখতে পাওয়ায় তার মুখখানা ভাষাভাষা মনে আছে।

বিলেত ফেরত স্থলাল বিলেতি কায়দার মানুষ হলেও স্থপ্রভা পিসীকে ভুলতে পারেনি। ছোটবেলায় মা মারা যান। স্থপ্রভাই বুকের সুধা দিয়ে মানুষ করেন। মাতৃঋণ শোধ করতেই স্থলাল ছুটে আসে কোলকাতা থেকে। ব্যারিষ্টারী জমে উঠেছে, দিনকয়েকের অনুপস্থিতে হয়তো মোটা অঙ্কই ক্ষতি হবে, তবু না এসে পারেনি। বহু পত্র লিখেও কৃতকার্য হয়নি। স্বামীর ভিটে ছেড়ে নড়বেন না স্থপ্রভা।

ছোট্ট অীসমা বড় হয়েছে—বেশ বড়। শতদলের মতোই প্রস্ফুটিত যৌবনশ্রী। তবু যেন কেমন একটা বিষাদের ছোপ সারা মুখে চোখে লেপটে আছে। স্থলালের ভালও লাগে দুঃখও হয়। এদেশের মেয়েরা ওদেশের মেয়েদের মতো কেন হাসিখুশি নয়? এত অল্পেই কেন এরা ভারিক্কী হয়ে ওঠে?···

স্থপ্রভা সেদিন কতকটা শান্ত ছিলেন। স্থলাল কাছে বসে কোলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য পেড়াপীড়ি শুরু করে। অসীমা চা জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। সেই গুরু গম্ভীর। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়, নয়তো চুপচাপ। একেতো বাড়ীতে কথা বলবার মতো তৃতীয় প্রাণী নেই, তাতে যাকে সহজ সরলভাবে পাবার কথা সেও মৌন। স্থলালের বিরক্তি বোধ হয়। টিপয়ের ওপর চা

জলখাবার রেখে চলে যাচ্ছিল অসীমা, একটু কর্কশভাবেই পেছন ডাকে সুলাল, এই অমু, চলে যাচ্ছিস যে ?

জলভরা আকাশে ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকায়। ঠোঁটের মধ্যেই হাসিকে সীমাবদ্ধ রেখে উত্তর করে অসীমা, মা'তো রয়েছেন, খাও না ? আমাকে আবার সন্ধ্যা দিতে হবে।

সন্ধ্যা তোদের বামুন মেয়ে দেবে'খন, তুই বোস দিকি—! হ্যাঁ, পিসীমা, তুমি এটাকে কি তৈরী করেছ বলতো ? হাসি নেই, আনন্দ নেই, দিবারাত্র শুধু কাজ আর ঠাকুর ঘর, ঠাকুর ঘর আর কাজ !

অসীমা মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে থাকে। সুপ্রভা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই বাধা দেন, ওকে এখন যেতে দে সুলাল, সত্যি বামুন মেয়ে একা একা পেরে উঠবে না।

না, তোমাদের এখানে থাকা দেখছি আমার পোষাবে না। কালকেই চলো কোলকাতা রওনা হই। হা করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও ঠাকুর ঘরে গিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করগে ! সুপ্রভার কথার জবাব দিয়ে অসীমার উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে সুলাল।

মৃদু পা ফেলে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় অসীমা। সুপ্রভা পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আরম্ভ করেন, বাবা সুলাল, তুইতো জানিসনে হতভাগীর বুকে কি জ্বালা ! তোর মনে নেই, ওকি মুখ গোমড়া করে থাকবার মতো মেয়ে ? আজ দীর্ঘদীন পর তোর সঙ্গে দেখা, খুশিতে যে উপচে পড়তো !

তাইতো স্বাভাবিক, তবে কেন এই বুড়োটেপনা ?

ওরে, বুক যে ওর ভেঙে গেছে। ওযে……

তুমি চুপ করতো ! আমি জানি, অজয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে হবার কথা ছিল. তা হয়নি। তাতে হয়েছে কি ?

ওরে, সে কি শুধু কথা ! গায়ে হলুদ পর্যন্ত--

তারপর—ভেঙে গেল, এই তো ?

ঠিক তাই।

ভালকথা, তাতে হয়েছে কি ? তবুতো বিয়ে হয়ে ঘর ভেঙে যায়নি ! পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েরা যে মনে না ধরলে, বিয়ের পরেও ডাইভোর্স করে স্বেচ্ছায় অন্য বিয়ে করে, তারা কি অসুখী ? মেয়েটাকে তোমরা দেখছি মেরে ফেলবে !

ওরে এযে হিন্দুর বিয়ে, একবার বাগদান হয়ে গেলে কি অন্য উপায় আছে ?

না উপায় নেই ! একজন খেয়ালের বসে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন, আর একজন তার জন্য সারাজীবন প্রাণপাত করবে, না ?

তাছাড়া উপায় কি বাবা ?

উপায় শীগগিরই হচ্ছে পিসী, হিন্দু মেয়েরাও আর সারাজীবন স্বেচ্ছাচারী স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকবে না। বাঁচবার আনন্দ তারাও আবার ফিরে পাবে।

তোর কথা হয়তো ঠিক সুলাল। কিন্তু ওকি তা বুঝবে ?

বেশতো মন না চায়, অন্য কাউকে বিয়ে না করুক। কিন্তু তাই বলে সারাজীবন হাহুতাশ করে মরতে হবে ! তুমি আমার সঙ্গে কোলকাতা চল। ওকে আমি আবার স্কুলে ভর্তি করে দেবো।

বেশ আমি রাজী—এখন ও যদি রাজী হয়।

সে ভার আমার ওপর, তুমি ঠিক রাজী তো ?

হ্যাঁ সুলাল, এখানে আর মন টিঁকছে না।

তুমি আমায় বাঁচালে পিসী। দেখে নিও, আমি তোমার অমুকে আবার হাসিখুশি করে তুলতে পারি কি না !

তুই কৃতকার্য হ সুলাল, আমি তোকে আশীর্বাদ করছি।

তাহলে এখন একটু চুপচাপ শুয়ে থাক, আমি এই জ্যোৎস্নালোকে তোমাদের গ্রামটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

বেশীদূর যাসনে যেন।

ভয় নেই, এককালে আমরাও গাঁয়ের লোকই ছিলাম। সুলাল বেরিয়ে যায়। সুপ্রভা শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের নাম জপ করতে থাকেন।

১০

বছর পাঁচেক অশোকের সঙ্গে আছে রেবা। অশোক—অশোক—ওর স্বপ্ন ওর সিদ্ধি। শাড়ী, গহনা. সাজান সংসার সব পেয়েছে। তবু যেন সময় সময় বড়ো ফাঁকা মনে হয়। সামনের পার্কে খেলা করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। কেউ দোলনায় দুলছে, ছুটোছুটি করছে—কেউ বা প্যারাম্বুলেটারে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছে। কচি কচি সোনা মুখ। রেবার বুক ফেটে কান্না আসে। কি পেয়েছে ও?···

মধু গুঞ্জরনের বিরাম নেই। কবি ঔপন্যাসিক অশোক রায়। বলিষ্ঠ চেহারা, প্রতিভাদীপ্ত মুখাবয়ব। যশ আর সৌভাগ্যের সেতুবন্ধ। অশোকের সান্নিধ্যে যে কোন নারী নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করবে! রেবা গরবিনী। অশোকের ভালবাসায় খাদ নেই। ছোট খাট কথা নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। দু'দিন হয়তো কথাই বন্ধ। কিন্তু সে বিতরাগ জীবনের সূত্রকে ছিন্ন করতে পারেনি। হয়তো অশোকই একটা ছড়া কেটে গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে দিলে। কিংবা চব্বিশ ঘণ্টা পার না হতে রেবাই মৌন কবির ধ্যানগম্ভীর কল্পলোকে সশরীরে হাজির হয়ে মুখর করে তুললে কবিকে। ঝগড়া মিটে যায়। জীবনের ক্ষণ-মুহূর্ত হয়ে ওঠে রঙিন। মনের রং আর জীবনের রং মিশে এক হয়ে যায়। তবু ধরা ছোঁয়ার বাইরে—মনের গহনে সময় সময় কে যেন

ছুঁচ ফোটায়। দুঃস্বপ্ন দেখে রেবা। বিবেকের দংশনে উদ্বেলিত হয় অশোক। আরো চড়া আরো গাঢ় রংএ পেয়ালা ভরা হয়। চলে কবিতা—গান—ভ্রমণ।

পাঁচ বছর পথ চলে এসেছে উভয়ে। অনন্তকাল চলবে। যতদিন জীবন ততদিন। কেউ যেন না আসে অনুযোগের সুর নিয়ে। কৈফিয়ৎ যেন না চায় কেউ। দুদিনের জীবন, কিসের ভাবনা কিসের বিচার! ভুলে আছে ভুলেই থাকবে।...সহসা ছন্দ পতন হয়। অশোক কদিন নিরুদ্দেশ। ঠিক নিরুদ্দেশ নয়। রেবার সাময়িক অনুপস্থিতিতে ছোট্ট একখানি চিরকুট রেখে কোলকাতার বাইরে যায় অশোক। কোথায় কদিন থাকবে কিছুই বিস্তৃত নয়।

"সময় নেই বলে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলেম না সু। আমি বাইরে যাচ্ছি। ইতি—তোমার কবি"

রেবা ভাবে, অতর্কিতে রাখী বন্ধন হয়েছিল অতর্কিতেই হয়তো ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সংসারের কোন জিনিসেই হাত পড়েনি। মায় সখের গিটারটা পর্যন্ত ঝোলানো রয়েছে। রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি-বই-খাতা। শঙ্কা হলেও ভরসা হয় রেবার। ঠিক সাত দিনের মাথায় ফিরে আসে অশোক। ট্যাক্সি সদরে লাগলে দোতালা থেকে গলা উচিয়ে দেখে রেবা। উৎকণ্ঠা দূর হলেও মন খুশী হতে পারে না। এক দোয়াত কালি ছিটিয়ে দিয়েছে কে যেন অশোকের মুখে? রক্তবর্ণ চোখ, রুক্ষ কেশ! তাড়াতাড়ি ভৃত্য অনাদিকে নীচে পাঠিয়ে দেয়। বিছানা সুটকেস ওপরে নিয়ে আসে অনাদি। ভাড়া মিটিয়ে অশোকও ওপরে আসে। রেবা কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। অশোকই মৌনতা ভঙ্গ করে, একটু চা হবে তো সু?

সাহস পেয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে রেবা, কোন অসুখ করেনি তো? আগে জানালেই হ'তো গাড়ী ষ্টেশনে পাটিয়ে দিতুম।

না না, তুমি একটু চা নিয়ে এসো, সব ঠিক আছে। শুষ্ক হেসে উত্তর করে অশোক।

অন্যদিন হলে হয়তো পাচককে ডেকেই ফরমাস করত রেবা। আজ নিজেই ছুটে যায় রান্না ঘরে। যেতে যেতে মনে হয়, হয়তো পথ চলার ক্লান্তিতেই ওরকম বিশ্রী দেখাচ্ছে অশোককে। স্নানাহার শেষে একটু ঘুমুলেই শরীর সুস্থ হবে। রেবার উৎসাহ বেড়ে যায়।

আরো দিন সাতেক কাটে। অশোক নিয়ম মতো খায় দায় বিছানা নেয়, তবু যেন কেমন একটা দুশ্চিন্তার ছোপ তার মুখে চোখে। প্রায়ই মনে হয়, অন্যমনস্ক সে। সেবা যত্নের ত্রুটি নেই রেবার। অশোককে হাসিখুশি করে তুলবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে ও। কিন্তু অশোক কিছুতেই প্রাণখুলে যোগ দিতে পারে না। রেবার ভাবনা হয়। বিরক্তিও আসে সময় সময়। তবু করে প্রাণপণ চেষ্টা—আদর যত্ন।

অশোকের চোখে ঘুম নেই। এমন কি সর্ব দুঃখহরা কবিতাও ওকে পরিত্যাগ করেছে। এ মাসের জন্য দু'ছত্রও লিখতে পারেনি। পড়তেও পারে না। সহসা যেন গতজন্মের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। দেবতা ছিল, অভিশাপে নির্বাসন হয়েছে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু কেউ নেই। শুধু মনে পড়ে একখানি সজল শুচিশুভ্র মুখ। হাতছানিতে অবিরত ডাকছে যেন ওকে প্রিয়নামে। আলোর দ্যুতিতে ঝলমল। চুম্বকের অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণ। আকাশের সূর্য আর মাটির সূর্যমুখী। দিনভর বিফল চাউনি। তবু আছে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। ওকি পাগল হয়ে যাবে?···না না, মনঘোড়াকে শক্ত করে বাঁধতে হবে। স্বর্গ স্বর্গই থাক। ও মাটির খেলাঘরেই খেলবে। চিরজন্ম সেখানেই আবদ্ধ থাকবে। কেউ যেন না ওকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখার টেবিলে বসে ভাবতে থাকে অশোক।

বসন্তের গোধূলি মুখর হয়ে ওঠে। প্রসাধন শেষ করে চুপি চুপি

প্রবেশ করে রেবা। প্রাণে শঙ্কা। বুঝে উঠতে পারে না, অশোক ওর প্রতি বিরক্ত কিনা। তবু নিয়ত চেষ্টা, অশোককে খুশী করে তুলবে। চপল চোখে মায়াঞ্জন মাখা।

পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙে অশোকের। মুহূর্তে মন থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রসন্ন হয়ে ওঠে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে সু? সারাদিন তোমাকে যে দেখেতেই পেলুম না?

বাঃ বা, তবুতো মুখ খুললে? আমি তো ভেবেছিলাম রাগ হয়েছে।

লক্ষ্মী সু, সত্যি কদিন আমি তোমার প্রতি অবিচার করে চলেছি, আমাকে তুমি মাপ করো।

ভারী লজ্জা দিতে পারো তুমি!

সু, তুমি কি সুন্দর!

দুষ্টু কোথাকার, আমাকে কি নূতন দেখছ?

সত্যি তুমি আজ আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন সু।

বুঝিনে বাবা তোমাদের কবিতা।

বেশী না বোঝাই ভাল। বক্তৃতা থাক, চলো বেড়িয়ে আসি।

বেশ, কবির যেমন অভিরুচি, ড্রাইভারকে ডাকবো?

না না, আজ আমি নিজেই ড্রাইভ করবো।

তার আগে কিছু খেয়ে নাও! যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো।

কবি এক্ষেত্রে তোমার একান্ত অনুগত সু, অশোক চেয়ার ছেড়ে ওঠে হাসতে হাসতেই বেরিয়ে যায়।

রেবার মনে বইতে থাকে খুশীর হাওয়া। অনেকদিন পর আজ আবার অশোক প্রাণখুলে কথা বলছে, স্বাভাবিক শ্রষ্টা-শিল্পী। মনের আবেগেই পাচককে ডেকে টেবিলের ওপর খাবার সাজাতে থাকে রেবা।

যথা সময়ে ফিরে আসে অশোক। রাশিকৃত ভোজ্য বস্তুর সমাবেশে কবিকণ্ঠ মুখর হয়, একি! এযে একেবারে পাকা ভোজের ব্যবস্থা সু!

কদিনতো কিছুই খাওনি, আজ কিছু খাবে।

একদিনেই দশদিনের উসুল, কেমন ?

কথা রেখে আরম্ভ করো, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে ?

বেশ তুমিও নাও !

দুজনে মুখোমুখি বসে খেতে থাকে। পূবের আকাশে চাঁদ উঁকি দেয়।

চাঁদ আর চামেলীতে চলে মিতালি। মলয় হিল্লোলে ছায়াবাজী চলে কচি পল্লবে। অশোক রেবাকে পাশে বসিয়ে গাড়ীতে ওঠে। বিরাট 'ক্রাইস্লার' গাড়ী। আরোহী শুধু রেবা আর অশোক। কবির পাশে কবিতা। আকাশে বাতাসে ভুবনে সর্বত্র আজ কাব্যালোক। লেকে কয়েক পাক ঘোরে অশোক। তারপর গড়ের মাঠে। না, এত আলোর মাঝে ভাল লাগে না। গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে চলে গাড়ী। হাওড়ার পুল পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। শিল্পাঞ্চল অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছে। দুধারে ধু ধু পিচ বাঁধানো সটান রাস্তা। চন্দ্রালোকে চিক চিক করছে। সারবন্দী গাছ দু'ধারে। কচি পাতায় আলোর ঝলমলানি। গাড়ী মন্থর গতিতেই চলেছে। এক ঝাঁক আলোর মালা নিয়ে দৌড়ে পার হয়ে গেল বর্দ্ধমান ষ্টেশন। আবার নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে আকাশ ছোঁয়া চিমনীর ধোঁয়াবাজী। রাণীগঞ্জের খনি অঞ্চল বোধ হয়। রেবা তন্ময় হয়েই কবির পাশে বসে আছে। ওর ভাল লাগে বেশ এ অভিযান। তবু রাত্রির গভীরতার কথা মনে হতে গম্ভীরভাবেই অনুরোধ করে, এবার ফিরে চলো ?

কেন ভয় করছে ?

তুমি পাশে থাকলে আমার মরতেও ভয় নেই অশোক !

এমন দিনে তুমি মরণ কামনা করছ, সু ?

কামনা না করেও যখন ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, তখন আমি

মনেপ্রাণেই কামনা করছি, তোমার কোলে মাথা রেখেই যেন মরি। সেদিনও যেন এমনি জ্যোৎস্না থাকে আকাশে বাতাসে, তোমার মনে।

তুমিও যে কাব্য শুরু করলে ?

দীর্ঘকাল কবি সান্নিধ্যে থেকেই হয়তো।

তা হবে। সু, আকাশে চাঁদ পাশে তুমি, আমার কাছে দু-ই অভিন্ন।

চাঁদে কিন্তু কলঙ্ক আছে ?

আমি তার সুষমার কথাই বলছি।

সত্যি তোমার মননলোকে কাব্যের বান ডেকেছে। ঘরে চলো, সঙ্গে যে খাতাপত্র নেই।

ঘরে যদি আর না ফিরি ? গাড়ীর গতি বিশ থেকে ত্রিশ মাইলে ওঠে।

আবার রাস চালাতে শুরু করলে তো ?

গাড়ীর গতি চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট মাইলে গিয়ে ওঠে।

অশোক, সত্যি আমার ভয় করছে, গতি কমাও।

আমাকে জড়িয়ে ধরো সু। এত আলো—এতো কাছে তুমি—তবু যেন মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সব !……

রেবা দু'হাতে অশোকের গলা জড়িয়ে ধরে পুনরায় বিচলিত কণ্ঠে অনুরোধ করে, আমার মাথার দিব্যি অশোক, আস্তে চলো। অপরিচিত রাস্তা এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে।

আরো কাছে—আরো শক্ত করে ধরো সু, বলতে বলতে স্টিয়ারিং ছেড়ে বাঁ হাত দিয়ে রেবাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরতে যায় অশোক। এত কাছে রেবা, তবু যেন কতদূরে! রাহু কি গ্রাস করলো চাঁদকে ? কে অমন জলভরা চোখে বিদ্রূপ করছে ? না না, রেবাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। রেবাকে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন নারীকে চেনেও না ও। অন্ধকার—অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার। এক হাতে স্টিয়ারিং

ধরে গাড়ীর প্রচণ্ড বেগকে রুখতে পারে না অশোক। সজোরে গিয়ে ধাক্কা লাগে ডান ধারের দেবদারু গাছের সঙ্গে। বিকটশব্দে চুরমার হয়ে যায় গাড়ী। জ্ঞানহারা অশোক গুরুতররূপে আহত। রেবারও বাঁ হাত জখম হয়েছে। কাঁচের টুকরোয় ছড়ে গেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তবু জ্ঞান হারায়নি। আগুন জ্বলছে ইঞ্জিনে। এখনো চেষ্টা করলে অশোককে বাঁচানো যায়। যদি কোন রকমে টেনে বার করা যেতো। টলতে টলতে নিজে বেরিয়ে এসে অশোকের হাত ধরে টানতে থাকে। অসাড় দেহ, শক্তিতে কুলোয় না। সাহায্যের জন্য চীৎকারে ফেটে পড়ে রেবা।

ধাক্কা লাগার বিকট শব্দ শুনে এবং আগুনের শিখা দেখে অদূরবর্তী পল্লী থেকে ছুটে আসে একদল সাঁওতাল। রেবার শঙ্কা হয়, তবু সাহায্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়।

সর্দার ভুলুয়া ডাকাত নয়—মানুষ। সভ্যতার আলোতে না আসতে পারলেও সাধারণ মানুষের মতোই স্নেহ মমতার প্রতিমূর্তি। রেবার দুরবস্থায় সাহায্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কি করবে সহসা বুঝে উঠতে পারে না। এক নিমেষ ভেবে সদলবলে ছুটে যায় গাড়ীর কাছে। প্রাণপণ চেষ্টায় টেনে বার করে অশোককে। আগুনের হল্কায় নিজের শরীরের একাংশ পুড়ে যায়, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। অঝোরে রক্ত ঝরছে অশোকের বুক দিয়ে। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ ছিঁড়তে যাচ্ছিল ভুলুয়া। রেবা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল ছিঁড়ে দিয়ে ওকে নিরস্ত করে।

ভুলুয়া উঁচু করে ধরে অশোককে। ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয় রেবা। সঙ্গীদের একজন দূরবর্তী বাজারে ছুটে যায় ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার আসেন, কিন্তু এ অবস্থায় তাঁর বিশেষ কিছু করবার নেই। দুটো ইন্‌জেকসন দিয়ে আসানসোল হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ

দেন। গাড়ী দিয়ে তিনি সাহায্য করছেন। কিন্তু রেবার কান্না কাটায় শেষ পর্যন্ত নিজেও সঙ্গে যেতে রাজী হন।

হৃদয়ের সুষমা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল রেবা, বিচ্ছেদের শঙ্কা নিয়ে মোড় ঘোরে। মাথার উপরে এসেছে চাঁদ। ভুবন জুড়ে আলোর ঝলমলানি। কিন্তু রেবার সম্মুখে যে সব অন্ধকার। রাহু কি ধেয়ে আসছে চাঁদকে গ্রাস করতে?···

গাড়ী মন্থর গতিতে আসানসোলের পথে এগিয়ে চলেছে। সামনের 'সিটে' ডাক্তার রায় একাকী ড্রাইভ করছেন। পেছনের সিটে অর্ধশায়িত অশোককে কোলে করে বসে আছে রেবা। অচেতন-তনু অশোকের হৃদয় যন্ত্রের সামান্য ধুকপুকানি অনুভূত হয় মাত্র। বুকের ক্ষত স্থানটায় আঁচল চাপা দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চলেছে রেবা। হয়তো এই চলাই শেষ চলা। পথের পরিচয়, পথেই রেখে যেতে হবে। টসটস করে অশ্রু ঝরছে রেবার চোখে। ডাক্তার রায় বিরক্তি সহকারেই সঙ্গ নিয়েছিলেন। কেননা, মাঝেমাঝেই তাঁর এরকম বেহেটপনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এপথে কোলকাতার তথা কথিত প্রেমিকের মোটর দুর্ঘটনা নূতন নয়। অশোককেও তিনি মাতাল বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু রেবার সংযত আচরণ আর করুণ মুখ-ছবি তাঁকে ক্রমশ সহানুভূতির স্তরে পৌঁছে দিচ্ছে। চলতে চলতে এক ফাঁকে রেবাকে লক্ষ্য করে সহৃদয়েই শুধোন তিনি, কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা?

শান্ত কণ্ঠেই উত্তর করে রেবা, সঠিক কোথাও নয়। ওঁর খেয়াল চাপলো, একটু বেড়াবেন।

দুর্ঘটনা ঘটলো কেমন করে?

রেবা সোজাসুজিই জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু একটু ভেবে উত্তর দেয়, উনি মাঝে মাঝে এমনিই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, হয়তো স্টিয়ারিং ঠিক রাখতে পারেননি।

হুঁ—

ও কি বাঁচবে না ডাক্তারবাবু?

আমরা ডাক্তাররা কোন সময়েই নিরাশ হইনে, যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

দয়া করে তাই করুন। ওকে হারালে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কে উনি, বলুনতো? বিস্ময়ের সুর ডাক্তার রায়ের কণ্ঠে।

রেবার আবার সঙ্কোচ আসে। অশোকের খ্যাতি আছে, হয়তো নাম শুনলেই ডাক্তার রায় চিনতে পারবেন। হয়তো সমবেদনায় যথা কর্তব্য করতেও দ্বিধা করবেন না, কিন্তু নিজের পরিচয়?···আমতা আমতা করেই জবার দেয় রেবা, কবি অশোক রায়, হয়তো নাম শুনে থাকবেন।

নিশ্চয়, ওঁর কবিতা আমি পড়েছি, উপন্যাসও। খুব ভাল লেখেন উনি। কিন্তু—

না না, কোন কিন্তু নয়। আপনার দুটি পায়ে পড়ছি ওকে বাঁচিয়ে তুলুন···

বাঁচা মরা আমাদের হাত নয় মা, চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তুমি ধৈর্য ধরো।

রেবা সত্যি সত্যি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ডাক্তার রায় হয়তো ওকে নিঃসংশয়েই অশোকের সহধর্মিণী জ্ঞানে মা বলে সম্বোধন করছেন। হয়তো এ নিয়ে আর তিনি অধিক কোন প্রশ্ন করবেন না। ধীরে ধীরে অশোকের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে রেবা।

ডাক্তার রায় একটু দম নিয়ে পুনরায় আশ্বাস দেন, কিন্তু মা, আমি ভাবছিলেম—

বলুন।

আসানসোলে ওঁর সঠিক চিকিৎসা হবে না। কোলকাতা নিয়ে যেতে পারলে হয়তো আশা আছে।

সেকি সম্ভব নয় ?

দীর্ঘ পথ, একটু ঝুঁকি আছে।

রেবা নিরুত্তর থাকে। কোন জবাব খুঁজে পায় না।

তোমার যদি মত থাকে মা, আমি ওঁকে কোলকাতাই নিয়ে যেতে চাই।

আপনি অনেক কষ্ট করছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞের কথা নয় মা, রুগীর প্রতি চিকিৎসকের এ কর্তব্য। উনি যদি এভাবে চুপচাপ থাকেন আমি আশা করছি, আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছুতে পারবো।

তবে তাই চলুন।

নিস্তব্ধ—নিশুতি রাত্রি। মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। কোলকাতা অনেক দূরের পথ। কাল রাত্রির কি শেষ হবে? রেবার অন্তর জুড়ে সমুদ্রের তুফান। পার কি পাবে না ?

১১

অসীমাকে নিয়ে স্থলালের সঙ্গে কোলকাতায় আসেন স্থপ্রভা। পিসীমাকে বড় ডাক্তার দেখিয়েছে স্থলাল, । কিন্তু শরীর সারছে না স্থপ্রভার। অন্যান্য উপসর্গের চেয়ে মাথার যন্ত্রণা অধিক। চোখের চিকিৎসাও চলেছে। অসীমা এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিবে স্থির হয়েছে। তোড়জোড়ের অন্ত নেই। গৃহশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়েছে, সঙ্গে কিছু সেলাই ফোড়াইও শেখাবেন। মন্দ লাগে না অসীমার। কদিনে মনটা বেশ হাল্কা হতে পেরেছে। সারাদিন চুপ করে থাকতে হয় না এখানে। স্থলাল হাসিখুশি মানুষ। মামাত বোন হেনা এবার বি. এ. দেবে, বেশ মিশুকে মেয়ে। আনন্দেই কাটছে দিন।

প্রতিদিন অন্তত আধ ঘণ্টা খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাতে হবে, সুলালের নির্দেশ। ইংরেজী কাগজ ভাল বুঝতে পারে না অসীমা। সুলাল তাই বাংলা কাগজের বরাদ্দ করে দিয়েছে। প্রত্যুষে চায়ের টেবিলে মিনিট কয়েক চোখ বুলিয়ে নেয় অসীমা। তারপর নিয়মিত পরীক্ষার পড়া শেষ করে অবসর সময়ে বাকীটা খুঁটিয়ে পড়ে।

রবিবারের সকাল। হাইকোর্ট-এর ছুটি আজ, হেনার কলেজও বন্ধ। সকালের চায়ের টেবিল জেঁকে বসে। ইংরেজী, বাংলা উভয় কাগজই এসেছে। চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে সুলাল চমকে ওঠে, সর্বনাশ, কবি অশোক রায় গুরুতররূপে আহত! প্রচণ্ড মোটর দুর্ঘটনা।

হেনা সবিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ে, কই, কোথায় দেখি!

অসীমার মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ডুবতে চলেছে যেন ছোট্ট তরিখানা। বাংলা কাগজে অশোক রায়ের ফটো পর্যন্ত রয়েছে। বেদনাক্লিষ্ট মুখাবয়ব—সমস্ত বুক পেট ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। কেঁদে ফেলবে কি অসীমা?

সুলাল কতকটা যেন বুঝতে পেরেই প্রশ্ন করে, কি হ'লোরে অমু, অশোক রায়কে জানিস নাকি তোরা? খুব উঁচুদরের কবি—উপন্যাসও ভাল লেখেন।

অসীমা কোন উত্তর দিতে পারে না। শ্রাবণের আকাশ সজল হয়ে ওঠে দুই চোখে।

হেনা সান্ত্বনা দেয়, বল না অমুদি, তুমি অতো নার্ভাস কেন?

ব্যালকনিতে চলছিল চায়ের মজলিস। সুপ্রভা পেছনের ঘরেই ছিলেন। বিছানার ওপর বসেই ইষ্টদেবতার নাম জপ করছিলেন। সোনালী রোদ এসে পড়েছে পাণ্ডুর মুখখানায়। সহসা কোন দৈববাণীতে যেন চমকে ওঠেন। সুলালকে লক্ষ্য করে ব্যাগ্রভাবেই শুধোন, কে আহত হ'ল রে সুলাল?

কবি অশোক রায়! গুরুতর……

কবি অশোক রায়! ওরে সুলাল, আমাকে শীরগির নিয়ে চল,… বিছানা ছেড়ে সহসা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন সুপ্রভা।

তুমি করছ কি পিসীমা! তোমার হার্ট অত্যন্ত দুর্বল, উঠো না। কবি অশোক রায়ের জন্য সারা দেশই বেদনা বোধ করবে। কিন্তু তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ওরে, কেন ব্যস্ত হচ্ছি তা তুই বুঝবিনে। আমাকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে চল্ বাবা?

এখন হাসপাতালে ভিজিটার্সদের যাবার সময় নয়— বিকেল চারটের পর। কিন্তু ব্যাপার কি বলতো?

ব্যাপার…ব্যাপার…কাগজে কি লিখেছে বাবা, আশা আছে তো?

তুমি অতো ব্যস্ত হয়ো না, কোলকাতার প্রায় সমস্ত বড় বড় ডাক্তার দেখছেন কবি অশোক রায়কে।

জয় মা তারা—জয় মা কালী। রক্ষা করো মা, আমার মুখ রেখো।

হেনা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। শান্তভাবেই প্রশ্ন করে, কই, বললে নাতো পিসীমা, কবি আশাক রায় তোমাদের কে?

ওরে পাগলী, তোর দিদির মুখখানার দিকে চেয়েও কি বুঝতে পারলিনে, অশোক আমাদের কে!

সেতো শুনেছি অজয় রায় চৌধুরী।

অজয় আর অশোক যে অভিন্ন মা।

বলো কি!

আমরাও এই ক'দিন আগে জেনেছি মা। তোরাতো জানিস, ওর বাবার সেই আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকেই ও নিরুদ্দেশ। শত চেষ্টা করেও আমরা কোন খোঁজ পাইনি। অমু পার্বতীর ন্যায় তপস্যা করেই চলেছে। গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পর হিন্দুর মেয়েকে তো আর

অন্য পাত্রে দিতে পারিনে। তাছাড়া মৃত্যুকালে তোর পিসেমশায় আদেশ করে যান, ওকে যেন অজয়ের হাতেই দিই। কিন্তু সাত বছর চললো কেউ অজয়ের খোঁজ পেলে না। হয়তো ইষ্টদেব অমুর তপস্যায় কিছুটা প্রসন্ন ছিলেন। সহসা এক দৈব সুযোগ উপস্থিত হয়, অজয়ের খোঁজ পাই আমরা। দেওয়ান শিবদাসবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। অজয়কে টাকা পাঠাতে হবে, প্রতি মাসে নিজহাতে ইন্‌সিওর করতেন উনি। শারীরিক অক্ষমতায় ভৃত্য হলধরকে দিয়েই সে যাত্রা ইন্‌সিওর খাম ডাক ঘরে পাঠাচ্ছিলেন। হলধরের কৌতূহল হয়। খামসুদ্ধ সে অমুর কাছে নিয়ে আসে। অমুর চক্ষু স্থির।

কিন্তু খামের ওপর তো 'অশোক রায়' নাম থাকাই স্বাভাবিক। অমুদি কি করে ধরলো ? সুপ্রভাকে থামিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে হেনা।

হ্যাঁ, ঠিকানাটা কতকটা তাই ছিল বটে।

মানে ?

মানে, অজয় রায় চৌধুরী—ওরফে অশোক রায়। বুড়ো শিবদাসকে আইনে ফাঁকি দেবার উপায় নেই মা।

হাসতে হাসতেই সমর্থন করে সুলাল, তাহলে কি অত বড় একটা এষ্টেটের ম্যানেজারী চলে পিসীমা ? থাক, অসুখ. শরীরে তোমাকে এত বকতে হবে না। একথা আমাকে আগে বলোনি কেন ?

বলবার সময় পেলাম কই বাবা। এইতো, এরই মধ্যে অজয় আমাদের আবার ফাঁকি দিলে।

আচ্ছা, এবার আর ফাঁকি দিতে পারবে না।

ব্যারিষ্টার সুলাল ব্যানার্জি একহাত দেখবেন বোধ হয় ? দুঃখের মধ্যেও ঈষৎ হেসেই জবাব দেয় হেনা।

তুই থাম মুখপুড়ি !

কিন্তু ভগবান বোধ হয় আমাদের সকলকেই থামিয়ে দেন বাবা।

তুমি কি যে অলক্ষুনে কথা বলো পিসী ! এই দেখ, কাগজে লিখেছে, অবস্থা এখন আয়ত্বের মধ্যে ।

কি জানি বাবা, আমার যে পোড়া কপাল ।

আচ্ছা, তুমি যেমন ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলে তাই কর । সকল ভাবনা আমার । বিকেলে আমরা সকলেই হাসপাতালে যাচ্ছি ।

কিন্তু অমুদি কোথায় গেল ? আবার প্রশ্ন করে হেনা ।

দেখগে ওটা বোধ হয় এতক্ষণে বাথরুমে না হয় ছাদে গিয়ে নাক মুখ ভাসাচ্ছে ।

হেনা ছুটে যায় । স্থলালকেও নীচে নামতে হয় । জনকয়েক মক্কেল অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন ।

১২

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল । একক কেবিনে আছে অশোক । গতকাল সারা দিনরাত যমে মানুষে টানাটানি গিয়েছে । আজ অনেকটা ভাল, জীবন-আশঙ্কা আর নেই । বুক থেকে পাঁজরার হাড় একটা বাদ দিতে হয়েছে । অশোক সজ্ঞান, তবু কথা বলতে পারছে না ? কষ্ট হয় । চুপচাপ শুয়ে আছে । সমস্ত মুখখানা বিষাদ-ঘন । কি থেকে কি হয়ে গেল ।

শিয়রে বসে আছে রেবা । তাপসীর জীবন মরণ সাধনা । দু'রাত্র চোখে ঘুম নেই । ডাক্তার নার্সের নিয়ত সেবা যত্নেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না । ও ছাড়া অশোককে দেখবে কে ? দীর্ঘদিন আছে অশোকের সঙ্গে । হাসি, তামাশা, ছোটখাটো মান অভিমান অনেক হয়েছে । কিন্তু এমন নিবিড় অনুভূতি কখনো হয়নি । অশোক কি ওর সারা হৃদয় জুড়ে বসে আছে । পথ চলতে এমন অনেকের সঙ্গেই তো

দু'দিন থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। আবার পথের মাঝেই হারিয়েও গেছে তারা। কিন্তু অশোককে কি সারা জীবনে ভুলতে পারবে না? এত কাছে থেকেও এতদিন বুঝতে পারেনি অশোক কে, কি সম্বন্ধ ওর সঙ্গে। আজ ঐ বেদনাহত মুখখানার দিকে চাইতেই হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠছে। যদি নিজের জীবন দিয়েও ওর যন্ত্রণা লাঘব করা যেতো।...

বিকেল পাঁচটা। দলে দলে দর্শনপ্রার্থী এসে জমছে। প্রিয় শিল্পীকে দেখে চলেও যাচ্ছে দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। রোগীর ঘরে বেশীক্ষণ ভিড় জমানো নিষেধ। রেবার মনে আজ আর সঙ্কোচ নেই। দুদিন আগেও অশোকের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে ও লজ্জা পেতো। হয়তো সঠিক জবাব দেওয়াই মুশকিল ছিল। কিন্তু আজ আর কোন দ্বিধা নেই। স্বামী বল স্বামী, আধাখানা প্রাণ বলতো তবে তাই। না না, স্পষ্ট মুখের ওপরই জবাব দিতে পারবে ও। অশোক—অশোক—ওর ধ্যান জ্ঞান ইষ্টমন্ত্র।...

সন্ধ্যা ছয়টার পর দর্শকগণের প্রবেশ নিষেধ। অসীমা ও হেনাকে সঙ্গে করে সুলাল আসে সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি। সুপ্রভা আসতে পারেনি। মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে। তবু পেড়াপীড়ি করেছিলেন। অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করেছে সুলাল। সে কারণে দেরিও হয়ে গেছে অনেকটা।

চামচে করে অশোককে ফলের রস খাওয়াচ্ছিল রেবা, ওরা তিনজনে কেবিনে প্রবেশ করে। কেউ কাউকে চেনে না, শুধু দুটি চোখ আর দুটি চোখকে। অসীমা ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ায়। কি দেখতে এসেছিল ও, কি দেখছে! কে ঐ পার্শ্বচারিণী? ওখানে শুয়ে কে, অজয়, না অন্য কেউ!...

চীৎ হয়ে শুয়ে ছিল অশোক। দৃষ্টি ছিল উর্ধ্বলোকেই সীমাবদ্ধ। ওদের তিনজনের পায়ের শব্দে দরজার দিকে চোখ মেলে। সহসা

হৃদকম্প অনুভূত হয়। ওকি স্বপ্ন দেখছে! এই স্বপ্নইতো ওকে বিভ্রান্ত করেছিল, গাড়ী গিয়ে ধাক্কা লাগলো গাছের সঙ্গে। শয়নে স্বপনে দিবারাত্র ভেসে উঠতো ঐ দুটি সজল চোখ। না, কিছুতেই ভোলা যায়নি। রেবার চড়া রং ফিকে হয়ে যায় ঐ সুচিশুভ্র মুখখানার স্বপ্ন দর্শনে। অসীমাকে তো এই সেদিন রাজপুরে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছে, তবে আজ এখানে কেমন করে আসবে! এ স্বপ্ন, অশোক জোর করে চোখের পাতা বোজে।

অর্ধেকটা রস তখনো কাপে রয়েছে। রেবা বুঝতে পারে, অশোক অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো! কিন্তু কেন, সে কথা বুঝে উঠতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই আবদার করে, বারে, এরই মধ্যে ঘুমোলে নাকি? এটুকু খেয়ে নাও?

অশোক নিরুত্তর, চোখ খোলে না। হৃদয়তন্ত্রী হয়তো ছিঁড়ে যাবে। রেবার কথা অসীমার কানে ছুঁচ ফোটায়। পালাতে পারলেই যেন বাঁচে ও। দূর থেকেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাবে, অজয় ভাল হয়ে উঠুক। কাছে থাকার ইচ্ছে আর নেই।

সুলাল নির্বাক। হেনার মুখেও কোন কথা নেই। রেবাও কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না। রোগীর ঘরে বেশী কথা বলা নিষেধ। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও সামান্য দুচার কথায় উত্তর দেওয়া হয়। কিন্তু এরাতো কেউ কিছু জিজ্ঞেসই করছেন না! এমন কত লোকই তো আসছে যাচ্ছে। পাঁচটি প্রাণীর সমাবেশপূর্ণ কেবিনখানা শূন্য মন্দিরের মতোই নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র টেবিল ওয়াচটার টিক টিক শব্দ অনুভূত হয়। হাসপাতালের ঘড়িতে ওয়ার্নিং পড়ে। দর্শকগণকে আর দশ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে যেতে হবে। অসীমার বুকের ভেতর আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। অজয়, ওর আজন্মের সাথী মৃত্যুশয্যায়, তবু চোরের মতোই চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। একবার ভাল করে দেখলোও না, ও

কেমন আছে, কোথায় ওর যন্ত্রণা। প্রাণখুলে কাঁদবারো আজ আর উপায় নেই। সুলাল বুদ্ধিজীবী, অবস্থা বুঝেই সকলকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসে। এরূপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। আগে জানলে অসীমাকে কিছুতেই সঙ্গে আনতো না। সকলে চুপচাপই এসে মোটরে ওঠে। সমস্ত পথ ভাবনা হতে থাকে। অসীমা কূল পায় না। কেমন করে যেন দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে কোলের ওপর। নৈশ অন্ধকারে হয়তো তা গাড়ীর অন্য দুটি যাত্রীর নিকট অদৃশ্যই থেকে যায়। কিন্তু তবু ওরা বোঝে, কি সে দুঃখ অসীমার। পথ জুড়তে এসেছিল, আরো দু'ধাপ ভেঙেই গেল।

সুলাল, অসীমা, হেনার প্রত্যাবর্তনের শব্দ অশোক টের পায়। তাই সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, সু, আলো জেলে দাও, বড্ডো অন্ধকার, আমার শ্বাস কষ্ট হচ্ছে।

আলোতো জ্বালাই রয়েছে, কোথায় অন্ধকার! চোখ খোল না, কি হ'লো আবার?

না না, আরো জোর আলো জ্বাল, আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিনে।

এই ত্যাখ, এইতো আমি তোমার কাছে বসে রয়েছি, ডাক্তার ডাকবো?

না না, ডাক্তার নয়, তুমি আমার কাছে এসো, আরো কাছে, আমার ভয় করছে।...

বোকা কোথাকার, এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখছ তো? হাসতে থাকে রেবা।

স্বপ্ন নয় সু, স্বপ্ন নয়। তুমি যেন কোথাও যেয়ো না।

আচ্ছা তুমি যেমন ঘুমোচ্ছিলে ঘুমোও, আমি তোমার মাথায় হাত

বুলিয়ে দিচ্ছি। অশোক চোখ বুজেই নিশ্চুপ হয়। রেবা ধীরে ধীরে গায় মাথায় হাত বুলাতে থাকে।

১৩

পনেরো দিন হাসপাতালে আছে অশোক। রেবার সেবা যত্নের ত্রুটি নেই। পনেরোটা রাত কেটেছে এই কেবিনে একটা ইজিচেয়ারের ওপর। জ্ঞান ফিরে পেয়ে অশোক বার বার অনুরোধ জানিয়েছে বাসায় গিয়ে শুতে, কিন্তু রেবা যায়নি। এখানে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তবু দু'চোখের পাতা এক করা গেছে, কিন্তু বাসায় শুধু দুশ্চিন্তাই বাড়তো। এক সময় ছিল, অশোককে ছেড়ে যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারতো ও। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। অশোক যদি ফাঁকি দেয় সে হবে ওর পক্ষে মৃত্যু দণ্ড। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে মন চায় না।

এই পনেরো দিনে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী হাসপাতালে এসে তাদের প্রিয় শিল্পীকে দেখে গেছেন। সমবেদনা আর সহানুভূতিতে একাধিকবার মুখর হয়ে উঠেছে অনেকে। কিন্তু সুলাল আর অসীমা দ্বিতীয় দিন আসেনি। ঠাকুর ঘরে মাথা কুটেছে অসীমা। সুপ্রভা পাথরের মতোই মৌন। সুলালও পথ ছেড়ে দিয়েছে, বিকল্প পথ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেনি সে। কিন্তু হেনা পূর্ববৎ সক্রিয়ই আছে। উৎসাহ উদ্দীপনা যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে ওর। প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক ক্লাসের ছাত্রী। প্রতিদিন কলেজ থেকে ফেরবার মুখে একবার করে নিয়মিত হাসপাতালে ঢু মেরে যায়। লক্ষ্য রেবা, ওর সঙ্গে আলাপ জমানো।

রোজ আসে হেনা। দরজার কাছে থেকে কুশল প্রশ্ন করেই বিদায়

নেয় রোজ। অশোকের ভাল লাগে না, শঙ্কা হয়, অসীমার দূত। সেদিন ওর সঙ্গেই এসেছিল। অশোকের মুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির ভাবাবেগ। রেবার ক্যামেরায় ধরা পড়ে সে নির্বাক ছায়াছবি। বড্ডো কৌতূহল হয়, হেনাকে জানতে। শিল্পী জীবনের হয়তো কোন রহস্য লুকোনো আছে।

আরো দিন কয়েক পরের কথা। অশোক এখন বালিশ ঠেস দিয়ে বিছানার ওপর বসতে পারে। দু-একখানা বই পড়বার অনুমতিও পেয়েছে। এখন আর রেবাকে অনর্থক হাসপাতালে রাত কাটাবার মানে হয় না। অনেক পেড়াপীড়িতে আজ দুদিন থেকে বাসায় গিয়েই শুচ্ছে রেবা। একবারে স্নানাহার সেরে সকাল দশটা এগারোটা নাগাদ হাসপাতালে আসে, আর ফেরে সেই সন্ধ্যা ছটা সাড়ে ছটায়।

সেদিন ছিল শনিবার। হেনার কলেজ অন্যদিন অপেক্ষা কিছু আগেই ছুটি হয়েছে। বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পসল্প করে ও যখন হাসপাতালে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল তখন বেলা মাত্র চারটে। অপ্রত্যাশিতভাবেই ফটকে রেবার সঙ্গে মুখোমুখি হয়।

কি একটা প্রয়োজনে রেবাও আজ একটু সকাল-সকালই বাসায় ফিরছে।

স্মিতহাস্যেই প্রশ্ন করে হেনা, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরছেন?

বাসায় একটু জরুরী কাজ আছে। তা'ছাড়া ওর দু'জন বন্ধু রয়েছেন আজ। আপন খুশীতেই জবাব দেয় রেবা।

তা'হলে আজ আর ওপরে যাবো না। উনি ভাল আছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ, ভাল আছেন। তাতে কি হয়েছে, যান না ওপরে?

না, সংবাদ যখন পাওয়া গেলো তখন আর মিছে কষ্ট করে লাভ কি, বরং আপনার সঙ্গেই একটু গল্প করা যাক।

আমার যে ভাই আজ বড্ডো তাড়া রয়েছে, এক্ষুনি বাসায় পৌঁছুতে হবে।

কোথায় যাবেন বলুন তো?

ল্যান্সডাউন একস্‌টেনসনে।

আমি তো রাসবিহারী এভিনিউতে যাবো। চলুন না আমার গাড়ীতে?

বেশ চলুন, কিন্তু আপনার কোন অসুবিধে হবে নাতো?

অসুবিধে আর কি, আমি তো একাই যাচ্ছি; বরং দুজনে মিলে বেশ গল্পে গল্পে যাওয়া যাবে।

তবে আর দেরি নয়, চলুন।

গাড়ী চৌরঙ্গী রোড ধরে—পার্ক ষ্ট্রীট হয়ে সোজা ল্যান্সডাউনে পড়ে। সামনের সিটে শুধু ড্রাইভার, পেছনে রেবা ও হেনা। বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে হেনাকে।

মুচকি হেসে প্রশ্ন করে রেবা, কবির সঙ্গে আজ দেখা করলেন না যে?

কবিকে সত্যি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার প্রয়োজন আপনার সঙ্গে। তেমনি হেসে হেসেই জবাব দেয় হেনা।

আমার সঙ্গে, কই একদিনও তো মুখফুটে কিছু বলেননি!

সুযোগ পেলাম কই, সব সময়ই তো আপনাকে ব্যস্ত দেখতাম? আজ কিন্তু দৈবই সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন।

সে যাহোক, প্রয়োজনটা কিন্তু এখনো জানতে পারলুম না? গাড়ী ল্যান্সডাউন মার্কেট ছাড়িয়ে দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি এসে পড়ে।

হাতে সময় খুব অল্প মনে করেই হেনা পাশ কাটায়, না, প্রয়োজন তেমন কিছু নয়। আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

ও এই কথা! গাছে ওঠাচ্ছেন নাতো? রেবার ঠোঁটে হাল্কা হাসি। রাসবিহারী এ্যাভিন্যু পার হয়ে চলে গাড়ী।

হেনা সমতা রক্ষা করেই জবাব দেয়, তা হয়তো একটু ওঠাচ্ছি, তবে ভয় নেই, বই কেড়ে নেবো না।

বিশ্বাসও নেই।···ড্রাইভার, সামনের ওই ফটকে রক্ষো, বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে একটা সাদা বাড়ীর ফটক দেখিয়ে দেয় রেবা।

আজ কিন্তু খুব অল্পেই ফাঁকি দিচ্ছেন।

ক্ষমা করবেন, আজ আমি সত্যি লজ্জিত। চলুন না, একটু চা খাবেন ?

আজ থাক, গল্প না জমিয়ে শুধু চা খেতে আমি রাজী নই।

বেশ কবে আসছেন বলুন ? গাড়ী থেকে নামতে নামতে প্রশ্ন করে রেবা।

নেমন্তন্ন করছেন তো ?

যদি বলি তাই ?

তাহলে আমি ধন্য, কালকেই বিকেল পাঁচটায়।

পাঁচটায় নয়, তিনটেয়। চা খেয়ে দু'জনে এক সঙ্গে হাসপাতালে যাবো, কেমন ?

বেশ তাই।

তাহলে আজ আসি ভাই, নমস্কার। রেবা ফটকের ভেতর ঢুকতে উদ্যত হয়।

নমস্কার, কিন্তু কি বলে ডাকবো বলুন তো ?

সরি, ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার নাম রেবা—

মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে হেনা বলে, রেবাদি। আমার নাম হেনা, আমাকে কিন্তু এখন থেকে আর আপনি নয়, সোজা তুমি।

তোমার মতো ছোট বোন পাওয়া সৌভাগ্যের কথা, বেশ তাই হবে।

তাহলে আর সময় নষ্ট করবো না, এবার উঠি। পুনরায় নমস্কার জানিয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দেয় হেনা।

গাড়ী না ছাড়া পর্যন্ত রেবা ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে খুশীর হাওয়া।

১৪

সারা পথ ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফেরে হেনা। সারা রাত্রি ভেবেও কোন কূল পায় না। সেক্সপিয়ার পড়া মন, প্রেমের মূল্য বোঝে। এ'কয়দিনের অনুধাবনে যতটুকু মনে হয়েছে, তাতে রেবা সত্যি অশোককে ভালবাসে। সমস্ত অন্তর দিয়েই ভালবাসে। অজয় যদি অসীমাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে তার জন্য রেবা দায়ী হতে পারে না। অন্তত হেনার পক্ষে তা ভাবা স্বাভাবিক নয়। মন না চাইলেও কি বিয়ে করতে হবে?... রেবার বুক থেকে অশোককে ছিনিয়ে নেওয়া মানে মহাকবি কালিদাসের যক্ষ প্রিয়ার মতো নির্বাসন দণ্ডের বিধান দেওয়া।

হেনা ও অসীমা এক ঘরে শোয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। অসীমা হয়তো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু হেনার চোখে ঘুম নেই। আগামী কাল চায়ের নেমন্তন্ন রেবার ওখানে। অসীমার মুখ চেয়ে যদি এগুতে হয় তাহলে কাল থেকেই শুরু করতে হবে। বড় কঠিন কাজ।... দেয়াল ঘড়িতে তিনটে বেজে যায়। হেনা আলো জ্বেলে বাথরুমে যায়। চোখে মুখে জল দিয়ে আসে। নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে অসীমা। স্তিমিত নীল আলোকে বড় করুণ মনে হচ্ছে মুখখানা। রাহুগ্রস্ত চাঁদ, হয়তো সবটুকু ঘিরেই নেমে আসবে অন্ধকার। শোবার আগে ওষুধ দিতে গিয়ে আরো একটি এমনি মুখ দেখেছে। সে মুখ সুপ্রভা পিসীর। ওঁরা হাল আমলের ধার ধারেন না। গায়ে হলুদ হবার পর হিন্দু মেয়ের অন্য পাত্রে বিয়ে হতেই পারে না। অসীমার কথা স্বতন্ত্র। সে অজয়কে

ভক্তি করে। হয়তো ভালও বাসে। যদি বাস্তব জীবনে না পায় তবু এ ভালবাসায় ছেদ পড়বে না। আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ জগৎ পরস্পরের দেনা পাওনার আঁক কষে ভালবাসার হিসেব মিলায়। কিন্তু ওরা দিতেই জানে, পাওয়ার কথা ভাবে না। ওদের তৃপ্তি আত্মাতে, বস্তু পায় ভাল নয়তো আত্মস্থ হয়েই আত্মার তপস্যা করবে।

অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে হেনা অসীমার দিকে। বড় মায়া হয়। না না, রেবাকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত দেবে না। একটি মাত্র মানিক, প্রার্থী দু'জন। হারতে একজনকে হবেই। ও শুধু পাশার ছকে ঘুঁটি চেলে দেখবে, তারপর ভাগ্য লক্ষ্মী যার প্রতি প্রসন্না হন। পাম গাছের মাথায় নৈশ পাখীর পাখসাট শোনা যায়। ভোর হতে হয়তো আর দেরি নেই। রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া শুরু হয়েছে, ট্রামও চলতে শুরু করেছে নিস্তব্ধতা ভেদ করে। আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে হেনা। রোববার, একটু বেলায় উঠলেও ক্ষতি নেই।

বিকেল তিনটায় যথারীতি রেবার কাছে উপস্থিত হয় হেনা। পরিষ্কার ঘরদোর, আধুনিক রুচিতে সুসজ্জিত। সবগুলো ঘর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় রেবা হেনাকে। এইটে অশোকের ঘর, এইটে ওর নিজের। এইটেতে থাকে ভাঁড়ার। ঐটা পড়ায় ঘর। রাশি রাশি পত্র পত্রিকা আর বইয়ের স্তূপ। হেনা মুগ্ধ হয় অশোকের সংগ্রহ দেখে। বাদ্য যন্ত্রগুলোও রয়েছে যেখানে যেটি শোভা পায়। সব দেখে শুনে ফিরে আসে খাবার টেবিলে। রাশিকৃত ভোজ্য বস্তুর সমাবেশ। নিজের হাতে কচুরি আর মাছের সিঙ্গাড়া তৈরি করেছে রেবা। বাজার থেকে এসেছে ভাল সন্দেশ আর ফল। বেশ লজ্জাই পায় হেনা। কৃত্রিম অভিমান নিজেই প্রশ্ন করে, ছোট বোনকে খাওয়াতে এত পরিশ্রমের দরকার ছিল কি দিদিভাই?

তোর খুব বুদ্ধি তো, সামান্য এই রান্না করতে মেয়ে মানুষের আবার পরিশ্রম হয় নাকি !

বেশ, না হলেই ভাল। তাহলে তো মাঝে মাঝে আশা রাখতে পারি ?

আশা অনেক কিছুই করতে পারিস, তবে এ শুধু তোর একার জন্যে নয়, কবির হুকুম হয়েছে।

তাই বল, আমি তো ভাবছিলুম নতুন কুটুম্বিতা রক্ষা করতেই তোমার এতো আয়োজন।

কুটুম্বিতা আর হ'লো কই। আগে পাকাপাকি করবার লোক ফিরুন, তবে তো কথা ?

পরের কথা পরে, আমার কিন্তু আর ধৈর্য থাকছে না, তুমি বসো !

তুই আরম্ভ কর। আমি চা-টা তৈরি করে নিচ্ছি।

আমারটাতে কিন্তু চিনি কম।

কম বেশি তুমি নিজে দিয়ে নাও, আমি শুধু লিকারটা দিচ্ছি।

লঘু হাসি আর টুকরো টুকরো কথায় টেবিল জমে ওঠে। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ব্যাকুলতা জানায় রেবা, হাসপাতালের সময় কিন্তু হয়ে এলো, একটু শীগ্‌গীর কর।

বেশ চলো, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি, আমি আজ আর যাবো না।

যাবিনে মানে ?

মানে, উনি যখন ভালই আছেন তখন রোজ রোজ যাওয়া ভাল দেখায় না।

এতে আবার ভাল মন্দের কি আছে ? চল তোকে আজ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

সে বাড়ী ফিরলেই হবে।

তবে আর তোর গিয়ে কাজ নেই, আমি ট্যাক্সি করেই যাচ্ছি।

বেশ তো, ভাড়াটা না হয় আর একদিন চা সিঙ্গাড়া দিয়েই মিটিয়ে দিয়ো। মিছে ঘরের পয়সা বাইরে দিয়ে লাভ কি ?

তোর সঙ্গে দেখছি কথায় পেরে উঠবো না, চল তবে।

বিকেল প্রায় পাঁচটা, উভয়ে হাসপাতালের পথে বেরোয়।

১৫

আবার বাড়ী ফিরে ভাবতে বসে হেনা। গত রজনী বিনিদ্র কেটেছে, আজো ঘুম হবে কিনা কে জানে। অতি অল্পেই রেবার সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ পাওয়া গেছে। আপনি থেকে তুমি, তুই। ঘন ঘন মেলামেশায়ও এখন আপত্তি উঠবে না। বিপদ হয়তো কিছুটা দেখা দিতে পারে নিজের তরফ থেকে। সুলাল, অসীমা, সুপ্রভা কেউ জানে না এই নূতন গতিবিধির কথা। অমুদি তো এক প্রকার প্রকাশ্যেই রেবাদির প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সুলালদাও কি চোখে দেখছে কে জানে ! ওদিকে অশোকবাবুও হয়তো শীগগিরই হাসপাতাল থেকে ফিরছেন। যা কিছু জ্ঞাতব্য, দিন কয়েকের মধ্যেই শেষ করতে হবে। কিন্তু উপায় কি ? আবার ভাবনায় পড়ে হেনা। একবার মনে করে, কিছু ক'রে কাজ নেই। বেশ আছে ওরা দুটিতে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে যদি অমুদি দুঃখ পায়, পাক। বিশ্ব ইতিহাসে এরূপ দুঃখের কাহিনীর অন্ত নেই। অনেক চোখের জল ঝরেছে, সমস্ত জল এক সঙ্গে জমা হলে হয়তো মহা সমুদ্রের সৃষ্টি হবে, তবু তার শেষ আছে কি ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানস পটে ভেসে ওঠে অসীমার ক্লিষ্ট মুখ ও সুপ্রভা দেবীর সজল আঁখি যুগল। হেনা দৃঢ় হয়। গভীরভাবেই ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে মহা সমুদ্রের মধ্যেও কোথায় যেন এক জায়গায় এসে নোঙর পড়ে। অতি উৎসাহ নিয়েই রেবাদি তার সংসার দেখিয়েছে।

পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর, সাজানো আসবাবপত্র। কিন্তু শোবার ঘর দু'জনের আলাদা। দাম্পত্য জীবনের এটা স্বাভাবিক রীতি নয়। কিন্তু কেন? যদি···না না, যদি অন্য কিছুই হয় তাইবা ও কেমন করে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবে? যদি আঘাত পায় বেরাদি? সভ্য সমাজে ঘাতকের স্থান নেই। বিয়ে যদি উভয়ের না হয়ে থাকে একদিন তা হবে। তাতেই বা কি এসে যায়?···

রাত্রির গভীরতা নেমে আসে। সমস্ত নগরী ঘুমিয়ে পড়েছে। অসীমাও পাশেই অচেতন। হেনার দু চোখও বুজে আসে। চুপচাপই ঘুমোতে চেষ্টা করে। এবং এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে।

আসছে শনিবার হেনার জন্মতিথি। অভিজাত পরিবারে ছেলে মেয়ের জন্মতিথি নিয়ে বাড়ীতে বেশ ধুমধাম হয়। হেনার জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই দুলাল ছোটখাটো একটা মজলিসের আয়োজন করে। শুভানুধ্যায়ীরা নিমন্ত্রিত হন। উপহার আর উপঢৌকনের সঙ্গে চলে গান, বাজনা, নাচ। পত্র দিয়ে নেমন্তন্ন করা হয়। এবারও পত্র ছাপানো হয়েছে। এই দিনকয়েকের ব্যবধানে হেনা আর রেবার কাছে যায়নি। একটু বেখাপ্পাই ঠেকছে। আজ বৃহস্পতিবার, কলেজ থেকে ফিরে নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে বেরোয় হেনা। ইয়ার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ শেষ করে সন্ধ্যার পর এসে উপস্থিত হয় রেবার বাড়ীতে। ইচ্ছা করেই একটু রাত করে এসেছে। কেননা হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরতে রেবার একটু রাত হবারই কথা। বাড়ীতেই ছিল রেবা। কলিং বেলের শব্দ শুনে গাড়ী বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে খুশী হয়। তরতর করে নীচে নেমে এসে সাদর সম্ভাষণ জানায় হেনাকে। ভাল হ'লো ওকে কাছে পেয়ে, কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।

ওপরে এসে বসে উভয়ে। চায়ের হুকুম হয় রেবার তরফ থেকে।

হেনার আপত্তিতে গ্রাহ্যই করে না। যথারীতি চা আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ব্যস্তভাবেই আরম্ভ করে হেনা, আজ আর বসবো না রেবাদি, আরো দু'চার জায়গায় যেতে হবে, বলতে বলতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে নাম লিখতে শুরু করে।

ব্যাপার কিরে! একবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিল ?

ব্যাপার পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তোমাকে কিন্তু গান গাইতে হবে বেরাদি, বলতে বলতে কার্ডটা রেবার হাতে দিয়ে নমস্কার করে।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নেয় রেবা। এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসিতেই প্রতিবাদ করে, মস্ত বড়ো একটা ভুল করলি যে ভাই ?

কি বলতো ? বিস্ময়ের সুর হেনার কণ্ঠে।

নামের আগে—ওটা কি বসিয়েছিস ?

কেন, মিসেস !

না না, কেটে শ্রীমতী কর। আর উপাধিটা রায় না হয়ে বসু হবে।

হেনা কোন উত্তর দিতে পারে না। বিস্ফারিত চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে মাত্র।

পূর্ববৎ হেসে হেসেই কথার জের টেনে চলে রেবা, খুব অবাক হচ্ছিস তো ? তুই শিক্ষিতা মেয়ে, আমাদের পরস্পরকে বন্ধু ভাবতে আশা করি তোর পক্ষে খুব অসুবিধা হবে না।

আমি ভাবছিলাম—

স্বামী স্ত্রী, কেমন ! মুখ থেকে কথা কেড়ে নেয় রেবা। ভয় নেই, তোর ভাবনা হয়তো এবার সত্যি হবে।

তা'হলে আমাদের খুব একটা বড় রকমের খাওয়া আসছে, কি বলো ? কার্ডটা হাত থেকে টেনে নিয়ে যথারীতি শুধরে দেয় হেনা।

তা বলতে পারিস। তবে সামনেরটার ভাবনা পরে ভাবা যাবে, বর্তমানে তোরটার সদ্ব্যবহার করা যাক। কখন যেতে হবে ?

চিঠিতে তো সময় দেওয়াই রয়েছে ?

সেতো বুঝলুম, কিন্তু বাঙালীর সময়তো ?

অর্থাৎ ঘণ্টা খানেক আগে আর পরে, এই বলতে চাও তো ?

বুঝতেই তো পারিস, আমাকে আবার হাসপাতালে যেতে হবে।

অশোকবাবু যখন ভালই আছেন, তখন ওদিনটা তুমি ছুটি নাও। কেননা, সবার আগে তোমাকে উপস্থিত হতে হবে, গানের ভার তোমার ওপর।

আমি গান গাইব কিরে !

কেন, সেদিন যে গাইছিলে ? আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল।

সে ঘরের মধ্যে গুনগুনিয়ে, সভার মাঝে আমি গাইতে পারবো না ভাই।

আমাদের ব্যবস্থাও মাঠে নয়, ঘরের মধ্যেই। আমি কিন্তু ঠিক বিকেল চারটেয় গাড়ী পাঠাবো ?

গাড়ী পাঠাতে হবে না, আমি ট্যাক্সি করেই যাবো। হাসপাতালে একবারটি না গিয়ে পারবো না।

কবিকে পেলে খুব ভালই হতো। একে উপায় নেই, তাতে সাহসে কুলোচ্ছে না।

ধীরে, সজনী—ধীরে, রেবার কণ্ঠে রসিকতা প্রকাশ পায়।

সে তোমার হাত যশ। তা হলে ঐ কথাই রইলো, এখন চললেম, হেনা উঠে দাঁড়ায়।

ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে রেবা। গাড়ী অদৃশ্য হলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবতে থাকে, দুর ছাই, মিছে ওর কাছে উচ্ছ্বাস বশতঃ ঘরের কথা বলে ফেললাম। কি দরকার ছিল প্রতিবাদ করার।

সামান্য একটা চিঠি, যেমন ছিল থাকলেই হতো। দু'দিন পরে তো ওর কথাই সত্যি হবে।...

১৬

বৃহস্পতিবারের রাত্রি। মাঝখানে মাত্র আর দুটো দিন, তারপরেই সারা বাড়ী উৎসবে মেতে উঠবে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব আসবে, খানাপিনা নাচ গানে বইবে খুশীর হাওয়া। রেবাদিও আসবে। এককই আসবে। শেষ পর্যন্ত গান গাইতেও রাজী হয়েছে। হেনা একা একাই এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছে। কিন্তু এখন আর একা ঝুঁকি নিতে সাহস করে না। শুধু সাহস নয়, রীতিমত নিষ্ঠুরতাও রয়েছে। অশোকবাবুকে তো প্রাণ দিয়েই ভালবাসে রেবাদি। সেই ভাল-বাসার আধারটিকেই নির্মমভাবে ছিনিয়ে নেবার হীনতম ষড়যন্ত্র। কৃতকার্য হলেও বিবেকের দংশন আছে, অকৃতকার্য হলে তো সভ্য সমাজে মুখ দেখানোই বিড়ম্বনা। রেবাকে নেমন্তন্ন করে এসে হেনা যতখানি না খুশী হতে পেরেছে তার চেয়ে দুর্ভাবনায় পড়ে অধিক। এখনই সুলালদাকে খবরটা জানানো উচিত। ব্যারিষ্টার মানুষ, খাসা মতবলই বাতাতে পারবে। কিছু ভুল ত্রুটি থাকলে সেও শোধরাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

মক্কেল বিদায় করে হলঘরে বসেই সুলাল খবরের কাগজ পড়ছিল, হেনার মুখ থেকে আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ব্যারিষ্টারী মাথা নিয়েও ও বিন্দুমাত্র ভাবতে পারেনি, রেবা অশোকের মধ্যে দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। খবরটা সুপ্রভার নিকটেও যায়। হয়ত জগৎ জোড়া অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ আলোই দেখতে পান সুপ্রভা।

কিন্তু অসীমার মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। সেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে ঠাকুরঘরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কেঁদে কেঁদে মনটা হাল্কা করেছে। অজয়কে ভালবাসে। পতি জ্ঞানেই শ্রদ্ধা করে। তবু যদি অজয় ওর দিকে না তাকায়, শবরীর মতো সারা জীবন প্রতীক্ষাই করবে ও। জীবনের প্রথম লগ্নে অজয়কে একান্তভাবে পেয়েছে। খেলাধূলো, ছুটোছুটি আশ মিটিয়েই করেছে। জীবনের মধুর লগ্নে অকারণেই হয়তো একটা দমকা হাওয়ায় তা ভেঙে যাচ্ছে। হয়তো ধূলিসাৎই হয়ে যাচ্ছে। এমন তো অনেকই যায়। বিয়ে হয়েও তো জীবনে কত লোক পঙ্গু হয়ে পড়ে। ওরও না হয় সেইরকমই একটা কিছু হ'লো।···অজয়কে ভালবাসে। বেঁচে আছে সে, হয়তো সুখেই আছে। ক্ষতি কি, দূর থেকেই না হয় মন্দিরের বিগ্রহের মতো ভালবাসবে—শ্রদ্ধা করবে। পাষাণ ঠাকুরকে নিয়ে মানুষ সারাজীবন তন্ময় হয়ে থাকে কেমন করে?···

হাতের কাছে লড়বার মত হাতিয়ার পেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে সুলাল। হলঘরে বসেই হেনার সঙ্গে কথা হয়, মনু, তাহলে এই কথাই থাকলো। রেবা তো অনেকটা আগেই আসছে, তুই ওর হাতে এ্যালবামটা দিবি? হেনাকে সুলাল সোহাগ করে মনু বলে ডাকে, বাড়ীর সকলেই!

হেনা ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়, উহুঁ, ঘাতকের কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, যা করতে হয় তুমি করবে।

হুঁ, তাহলে আমিই ঘাতক হবো, কেমন?

না, তা কাকেও হতে হবে না। এ্যালবামটা আমার পড়বার টেবিলের ওপর রেখে সুযোগ মতো রেবাদিকে সেখানে ডেকে এনে বসাতে পারলেই বাজী মাৎ। পতঙ্গের মতো নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়বে শিল্পকলার আকর্ষণে?

ঠিক তাই। ছবি বা ফটো দেখবার আগ্রহ সব মানুষেরই প্রবল। তোর খুব বুদ্ধি তো মনু!

অথচ তোমার অতটুকু নেই। কি করতে যে মক্কেলগুলো তোমার কাছে আসে তাই ভাবছি।

এবার থেকে না হয় তোর কাছেই পাঠিয়ে দেবো! প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধিতে যে মেয়েদের জুড়ি মেলে না সে কথা শাস্ত্রকাররা অনেক আগেই বলে গেছেন।

শাস্ত্রকাররা কিন্তু একচোখো ছিলেন না দাদা! শকুনি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক ছিলেন না।

আচ্ছা হ'লো; যা করবার প্রথম দিকেই যেন করে ফেলিস, গোলমালে শেষটায় ভুলে যাবি।

আবার ভুল করলে তো? বাড়ীতে পা দিতেই ওটা হাতে দিলে বেচারার খাওয়া হবে?

ঠিক বলেছিস, বড্ডো ভুল পরামর্শ দিচ্ছি আজ। যা করবার তোর সুবিধা মতোই করিস তা'হলে।

আচ্ছা, দেখা যাবে। সব কিছুতে ভুল করলেও কিন্তু তোপের মুখে তুমি আমাকেই ঠেলে দিচ্ছ দাদা!

জয়ী হলে গর্ব করবারও আছে। অমু তোর শুধু দিদিই নয়, বান্ধবীও। ওর বিপদে এটুকু করা তোর উচিত।

আচ্ছা আমাকে আর পিঠ চাপড়াতে হবে না, তুমি তোমার কাজ কর, আমি চললাম।

হেনা বেরিয়ে আসে, সুলাল পাইপ থেকে ধুম্র উদ্‌গিরণ করতে করতে পুনরায় খবরের কাগজে মন দেয়। মুখ চোখ খুশীতে ডগমগ।

শনিবার বিকেল পাঁচটা। ছোট ছোট টেবিল চেয়ার দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে হলঘর। জোড়ায় জোড়ায় বসবে অতিথিরা। সুগন্ধি ফুলের গন্ধ মম করছে চারদিকে। পূব দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট একটি মঞ্চও তৈরী হয়েছে, নাচ গানের সুব্যবস্থা। অতিথিরা এক এক করে আসছে। রেবাও মিনিট কয়েক আগে এসেছে। অশোককে জানিয়ে সোজা হাসপাতাল থেকেই এসেছে। প্রশান্ত চিত্তেই মত দিয়েছে অশোক। রেবার নির্বাচনে কোন আপত্তি হয়নি। ভাল দেখে কিছু উপহার কিনে নিয়ে যেতেও বলে দিয়েছে। কে হেনা, কি ওর পরিচয়, কিছুই জানে না অশোক। শুধু দিন কয়েক হাসপাতালে আসতে দেখেছে। অসীমার পাশে দেখে ভেবেছিল, হয়তো তারই কেউ। কিন্তু মাত্র সেই একদিন, তাছাড়া প্রত্যহ একাই এসেছে, হয়তো ভিড়ের মধ্যে মিথ্যাই সন্দেহ হয়েছে ওকে। হেনা কেউ নয় অসীমার। আর দশজন অনুরাগীর মতো সেও একজন। রেবার মুখে অকুণ্ঠ প্রশংসা ওর। ভালই হ'লো, বান্ধবীর সংখ্যা আরো একজন বাড়লো। হাসপাতাল থেকে ছুটি হলে রেবাও জিদ ধরেছে, ডাকবে এমনি এক প্রীতি সম্মিলন। হেনাকে যদি সত্যি বান্ধবীরূপে পায় রেবা তা হলে ভালই হয়। অনেক সময় একা একা মুখ বুজে থাকতে হয় বেচারাকে। নিরিবিলিতে দু'দণ্ড বসে গল্পগুজব করবার সাথী পাবে। আমাকে তো প্রায়ই লেখার মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। সময় সময় দু' পাঁচ দিনের জন্য বাইরেও যেতে হয়।...

অশোকের সমর্থন পেয়ে অত্যন্ত খুশী মনেই হলঘরে প্রবেশ করে রেবা। আসবার সময় মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে ভাল দেখে একখানা শাড়ী ও কিছু ফুল নিয়ে এসেছে। বান্ধবীর জন্মদিনে বান্ধবীর প্রীতি উপহার।

দোর থেকেই সাদর সম্ভাষণ জানায় হেনা রেবাকে। পাশে সুলাল দাঁড়িয়ে ছিল, পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যত হয় উভয়কে। বিশদভাবে বলার আগেই জোড়হাতে প্রণাম করে বাধা দেয় রেবা, তোকে আর বেশী বকতে হবে না, আমি জানি, উনি দাদা।

খুশীর হাসি উপচে পড়ে হেনার ঠোঁটে। সুলালও বাহ্যিক হাসতে থাকে, তবু যেন কেমন একটা আঘাত বাজে বুকের মধ্যে। সত্যি আজ আর ও শুধু মন্থ অমুরই দাদা নয়, রেবারও। তবে কেমন করে আঘাত দেবে ওকে? বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না সুলাল। আর একদল এসে সকল ভাবনা দূর করে দেয়। প্রসন্নচিত্তেই অভ্যর্থনা জানায় সকলকে।

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ শুরু হয় উৎসব। খাবার টেবিল সাজানোই ছিল। ওয়েটাররা ঘুরছে শুধু অরেঞ্জ ক্রাস লিমনেড্ আর সিগারেট নিয়ে। অতিরিক্ত খাবার নিয়েও পেড়াপীড়ি করছে সুলাল অতিথিদের মধ্যে।

রেবার উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর প্রথম নাচ দেখালে হেনার এক সহপাঠিনী। এবার পালা অসীমার। রেবা খুব ভাল গেয়েছে, কিন্তু অসীমার গলার লালিত্যের তুলনা হয় না। পর পর দুখানা গান গাইলে ও। বিশেষ অনুরোধেও রেবা আর গাইলে না। ঘণ্টা দুই চললো উৎসব। হেনা গাইলে সমাপ্তি সঙ্গীত। এক এক করে অতিথিরা বিদায় নিতে শুরু করছেন। রেবাও এক ফাঁকে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু বাধা দিয়ে হেনা ওকে নিয়ে আসে নিজের ঘরে। অসীমাও সঙ্গে আসে। কোথায় যেন দেখেছে রেবা অসীমাকে, কিন্তু মনে নেই। হেনা ওর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু অসীমা ধীর স্থির। স্বাভাবিক ভদ্রতা ব্যতীত বিশেষ হাল্কা হতে পারে না। তিনজনে এসে বসে দোতলার ঘরে। টেবিলের ওপরেই ছিল মনোজ্ঞ ছবির

এ্যালবামটি। স্বাভাবিক আকর্ষণেই লুফে নেয় রেবা। দেশ বিদেশের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। বড় ভাল লাগে রেবার। শিল্পীর সঙ্গে দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাস করছে, কিঞ্চিৎ রসবোধ জন্মাবারই কথা। খুঁটিয়েই দেখতে থাকে এ্যালবামটি। হেনা চপলতা নিয়েই বাধা দেয়, ছবি দেখবার জন্য তোমাকে ডাকিনি, গল্প করো। ছবি যদি ভালই লাগে তা হলে ওটা বেঁধে দিচ্ছি, বাসায় গিয়ে দেখো।

আজ তো অনেক কিছুই হ'লো রে, আবার গল্প কিসের। আশীর্বাদ করছি, তুই ভালভাবে পাশ কর। তারপর একটি মনের মতো মানুষ আসুক, পাতা উল্টাতে উল্টাতেই উত্তর করে রেবা।

তার কি উপায় আছে, দেখছো না চীনের প্রাচীর রয়েছে সামনে, অসীমার উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে হেনা।

তোদের দু'জনকেই আমার ঐ আশীর্বাদ।

হেনা সহজ কথা সহজভাবেই নেয় কিন্তু অসীমার গাম্ভীর্য কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না। রেবা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতই বোধ করে। হেনা বুঝেই পুনরায় রসিকতায় মন দেয়, দিদিটা যেন কি, কিছুতেই ওর মুখে হাসি নেই। চলো রেবাদি, তোমাকে বাড়ীটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

রেবা এ্যালবামটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়ায়, হেনা পুনরায় বাধা দেয়, বোঝা বইতে হবে না, ওটা এখানে রেখেই চলো, গাড়ীতে তুলে দেবো'খন।

এটা আবার একটা বোঝা নাকি? তবে তুই যখন বলছিস তখন থাক।

হ্যাঁ থাক, তোমার পেলেই হ'লো তো?

উভয়ে বেরিয়ে যায়। অসীমা চুপচাপ বসেই থাকে। হাসতেও পারে না, কাঁদতেও পারে না। অজয়কে ভুলতেই চেষ্টা করে,

তবু অকারণ বার বার তার কথাই মনে পড়ে। মনের কথা কাকেও খুলে বলার অবকাশ নেই। অসীমা মার কাছে উঠে যায়।

সারা বাড়া ঘুরে দেখে সুপ্রভার ঘর থেকে বেরুচ্ছিল হেনা রেবা— অসীমা উপস্থিত হয়। মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতই থমথমে। রেবার ভাল লাগে না। এমন উৎসব দিনে এ মেয়েটি এমন গুরুগম্ভীর কেন? সুপ্রভাদেবীও নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা রক্ষা করা বই বেশী উৎসাহ দেখালেন না। উৎসব শেষে চলে গেলেই ভাল হতো। গোমড়া-মুখো লোকগুলো দু'চক্ষের বিষ। কি দরকার ছিল হেনার ওকে আটকাবার? যদি বাড়ী দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল তবে তাই দেখালেই হতো। যারা হাসতে জানে না কি দরকার ছিল তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার? একটু বিরক্ত হয়েই নীচে নেমে আসে রেবা। সুলাল হলঘরে ছিল, প্রাণখুলেই মাঝে মাঝে আসবার জন্য অনুরোধ জানায়। ভাল লাগে রেবার। এইতো মানুষ, সহজ সরল হাসিখুশি। পুনরায় হাল্কা হয়েই গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। সুলালকেও ওর বাসায় যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। প্রসন্নচিত্তেই রাজী হয় সুলাল। রেবা ভুলে যায়নি। হাল্কাভাবেই আবদার করে, কৈরে হেনা, এ্যালবামটা দিবি বলছিলি?

ঐ যা, ভুলেই গিয়েছিলাম, ড্রাইভার, একটু দাঁড়াও আমি আসছি। হেনা ছুটে ওপরে উঠে যায়।

সুলাল কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়, সেকি! এত উৎসাহ এ্যালবামের জন্য! হেনা কি সব গোলমাল করে ফেললে?

হেনা ততক্ষণে কাছে এসে সুতো দিয়ে বাঁধা এ্যালবামটা এনে রেবার হাতে দেয়।

হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে পুনরায় রসিকতা করে রেবা, ফিরিয়ে নিশ্চয় দেবো, তবে কিছু কিছু চুরি যাবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু।

আর তা নিয়ে মামলা রুজু হলে আমি ব্যারিষ্টার দেবো দাদাকেই। দাদা রাজী আছেন তো ?

অন্তরে বিস্ময়বোধ করলেও, হেসে হেসে উত্তর করে সুলাল, ছোট বোনদের আবদার দাদারা কবে না রেখেছে বলো ?

তাহলে আজ আসি, নমস্কার। হেনা, পারিস তো কাল একবার যাস।

গাড়ী মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুলাল ব্যস্তসমস্ত হয়ে হেনাকে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার মনু, রেবার মধ্যে অতো উৎসাহ।

কাজ হাসিল হলে সাধারণ মানুষের খুশী হবার কথা, কিন্তু হেনা খুশী হতে পারেনি। গম্ভীরভাবেই উত্তর করে, ও জানে না ও কি নিয়ে গেলো।

মানে ?

তোমার কাজ হাসিল করেছি দাদা, ওপরে চলো।

হেনার গাম্ভীর্যে আর কোন প্রশ্ন করতে ভরসা পায় না সুলাল। নীরবেই উভয়ে ওপরে উঠে আসে।

১৮

গাড়ীতে ভালো আলো নেই, নয়তো গাড়ীতেই মোড়ক খুলে ফেলত রেবা। সুলাল নিজের ক্যামেরায় ইউরোপের অনেকগুলো দৃশ্য তুলে এনেছে। স্বপ্নের দেশ ইউরোপ। অশোকের বড় সখ, সে স্বপ্নের দেশ একবার দেখবে। পৃথিবীর কত অসামান্য শিল্পীর জন্মভূমি ইউরোপ। ইতিহাসের পাতায় পাতায় গৌরবদীপ্ত স্বাক্ষর। অশোক যদি যায়, যদি কেন নিশ্চয় যাবে। তাহলে রেবারও দেখা হবে সে পুণ্যভূমি। সুলালের শিল্প কৃতিত্বও কম নয়। ওদেশের সঙ্গে এদেশেরও মহান দৃশ্যপটের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগ্রহ। গাড়ী এসে ফটকে লাগে। ড্রাইভারকে

বিদায় দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠে আসে—সোজা নিজের ঘরে। খাওয়া দাওয়ার আজ আর বালাই নেই। ঠাকুর চাকর ওদের নিজেদের যেমন ইচ্ছে করুক। কলঘর থেকে একবার এসে চুপচাপ শুয়েই পড়বে। শুয়ে শুয়েই চোখ মিলিয়ে দেবে স্বপ্ন-মায়ায়। এ্যালবামটা টেবিলের ওপর রেখে কলঘরে যায় রেবা। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পুনরায় ফিরে আসে নিজের ঘরে। একবারে শয়নকালীন জামা কাপড় পরেই বিছানা নেয়। এ্যালবামটা থাকে বুকের ওপর। লোহা আর চুম্বকের আকর্ষণের মতোই প্রথম পাতা খোলে রেবা। কিন্তু একি! এক মুঠো লঙ্কার ঝাল ছিটিয়ে দিলে কে ওর চোখে? কি দেখছে ও? "প্রিয় অমুকে"—'অজয়', ছোট্ট দু ছত্র লেখা। জলের লেখা নয়, আগুনের শিখা। জ্বলে যাচ্ছে যে চোখ। একই পৃষ্ঠায় ওপরের ডানদিকে অসীমার একখানি আবক্ষ ফটোগ্রাফ, নীচের বাঁ দিকে অজয়ের। অজয়—অজয়—কে এই অজয়? অজয়ের মুখ অশোকের মুখের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে কেন! এ্যালবামটা বুকের ওপর রেখে দু চোখ টিপে চেপে ধরে রেবা। বেড্ সুইচ টিপে দেয়। ঘর অন্ধকার। খাট দুলছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে সমস্ত ঘর, সমস্ত পৃথিবী। ভূমিকম্প হচ্ছে কি? রেবার স্বপ্নে গড়া সোনার সংসার চুরমার হতে চলেছে। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাৎ। রুখতে পারে না রেবা। বালিশে মাথা গুঁজে ডুকরাতে থাকে। সমস্ত জগৎ দাঁত বার করে হাসছে যেন ওর দিকে। জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে কি পৃথিবীময়? বালিশ ভিজে জবজবে। বুকের ভেতরকার কালসাপটা মোচড় দিতে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও চোখ খুলেই দেখবে। যাক, সব খান খান হয়ে ভেঙে যাক। স্বপ্ন দিয়ে নীড় রচেছিল ভাঙনের মুখে চুরমার হয়ে যাক।—আবার সুইচ টিপে আলো জ্বালে রেবা। রুদ্ধনিশ্বাসে এ্যালবামের পাতা উল্টাতে থাকে। ছোট্ট অসীমা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওতো অশোকই। প্রাণ প্রাচুর্যে ছুটোছুটি করছে উভয়ে। গলা জড়িয়ে

ধরে চলেছে আম বাগিচায়। এটা তো পরিণত বয়সেরই ফটো। পাকা দেখার আশীর্বাদ ক্ষণে অসীমা, মহাজীবনের প্রাঙ্গনে। অশোককে বেশ মানিয়েছে তো ধুতি পাঞ্জাবীতে! আর হয়তো একটি মাত্র পদক্ষেপের সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা। বর-বধূর বহুবাঞ্ছিত স্বপ্ন লোক দর্শন। অসীমা অশোক—অশোক আর অসীমা; পাতায় পাতায় চোখ ধাঁধানো আলেক্ষ্য। আবার চোখ বন্ধ করে রেবা, আলো নিভিয়ে দেয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরে এসে দাঁড়ায় রেলিংএ ভর দিয়ে। কৃষ্ণার চাঁদ উঠেছে আকাশে। ধীরে বইছে বসন্তের মলয় হিল্লোল। মহানগরী ঘুমে অচেতন। রেবার চোখে ঘুম নেই। টস টস করে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াতে থাকে দুচোখ দিয়ে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে ফুলে ওঠে বুক। অশোক—অশোক—স্বপ্নমায়া, প্রতারক সে কি? সব কি কবি কল্পনা? দুদিন পরেই তো হাসপাতাল থেকে ফিরছে অশোক। নবজীবন লাভের উৎসবে মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ী। বন্ধুজন আসবেন—আসবেন শুভানুধ্যায়ীরা। অসীমা যদি আসে? হেনাকে নিমন্ত্রণ করলে অসীমাকে বাদ দেবে কেমন করে? অশোক তো হাসপাতালেই বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। হেনা যদি গোলমাল না বাঁধাতো। না না, ঠিকই করেছে হেনা। বোনের বিপদে বোন এসে পাশে দাঁড়াবে এতো স্বাভাবিক কথা। অশোককে নিয়ে পালিয়ে গেলে হয় না? কোথাও স্বাস্থ্যকর স্থানে? কেউ জানবে না, রাতারাতি অন্ধকারে। গুছিয়ে বললে অশোক নিশ্চয় রাজী হবে। কে অসীমা? হেনাই বা কে? জীবনে কি পেয়েছে রেবা? সমস্ত জগৎ যদি ওর সঙ্গে প্রতারণা করে তবে ও কেন অনুকম্পা করবে? হ্যাঁ, পালিয়েই যাবে, সেই ভাল। অসীমা জানবে না, হেনা জানবে না, কেউ না। শুধু ও আর অশোক। বিজন জঙ্গলে হয়েছিল প্রথম সাক্ষাৎ, আবার সেই জঙ্গলেই ফিরে যাবে। অশোক তো হাটের মাঝে আসতেই চেয়েছিল না।...

চাঁদ মাথার ওপর উঠে আসে। কোলাহলময়ী নগরী নিঝুম নিস্তব্ধ। বাতাসে যেন বিষ মাখানো রয়েছে। অশোকই যদি পাশে না রইলো কিসের মলয় হিল্লোল, চাঁদের সৌন্দর্যই বা কোথায়? ঘরে আসে রেবা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে আবদ্ধ রয়েছে অশোক। হৃদয়ের মণি কোঠায় আবদ্ধ অশোক। উচ্ছল হাসি হাসি মুখ। অনেকগুলো ফটোর মধ্যে এইটেই রেবার ভাল লাগে। অশোক হাসপাতালে রয়েছে, তবু সে কত কাছে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রেবা ফটোখানা। তন্ময় আত্মস্থ। না না, কেউ পারবে না অশোককে ছিনিয়ে নিতে। কিছুতেই না—কিছুতেই না।...

পাম গাছের মাথায় নৈশ-পাখীর পাখসাট শোনা যায়। চেঁচিয়ে ওঠে একটা বাদুড়ী। সুখের নীড়ে কালসাপ ছোবল দিচ্ছে কি? রেবা আরো শক্ত করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে অশোককে। একি! অশোক কি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে! রাত্রির এখনো যে অনেক বাকী?··· অসীমা ওরকম করে তাকাচ্ছে কেন? মেয়েটা কি একটু ঝগড়া করতেও জানে না? ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছে বোকার মতো? কি চাই, অশোককে? না না, তা হবে না। পৃথিবীর আর যা চাও পাবে, শুধু অশোককে নয়। হেনাটা বড্ডো খুনসুড়ী জানেতো! কি দরকার ছিল ওর এর মধ্যে অসীমাকে টেনে আনবার?··· ফটোটা আবার জায়গা মতো রেখে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে রেবা। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। অসীমার চোখে শ্রাবণের ধারা। ভেসে যায় রেবা। অশোক কথা বলছে না কেন? অশোক বলো, কাকে তোমার চাই? না না চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও। অসীমা তোমার বাল্যের সাথী; আর রেবা? সে কি তোমার কেউ নয়? নিজ হাতে তার জীবন দান করেছ। ছায়ার মতো পাশে নিয়ে চলেছ, সে কি তোমার কেউ নয়?··· রেবার চোখ কান গরম হয়ে ওঠে। বাথরুমে গিয়ে নাকে

মুখে জল দিয়ে আবার এসে রেলিং ধরে দাঁড়ায়। কৃষ্ণার চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। বুকটা যেন শূন্য। অশোক যেন ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। চাঁদ ডুববে, অশোক ও···না না, নিজেই ও চলে যাবে। কে রেবা, কি সম্পর্ক অশোকের সঙ্গে? দুদিনের পথের পরিচয় পথেই শেষ হয়ে যাক। অশোক রেবা, না না, অজয় অসীমা। কি সুন্দর মিল ওদের নামে। কি সুন্দর মানিয়েছে দুটিকে। সুখে থাক ওরা···রেবা আলো নিভিয়ে দিয়ে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করে।

১৯

ঘুম থেকে উঠতে কিছুটা বেলাই হয়ে যায় রেবার। রোজ বাজার আসে রেবার নির্দেশে। অশোক হাসপাতালে আছে। রুগীর কখন কি খেতে ভাল লাগে তা রেবা ছাড়া কেউ জানে না। কখন সেই চায়ের জল চেপেছে, ঠাকুর চাকর ঝি কেউ খেতে পারছে না। গিন্নীমা না উঠলে ওরা খায়ই বা কি করে! ভোরে বিছানার ওপর বসে বসেই আগে এক বাটি চা খায় রেবা। তারপর যায় কলঘরে। ফিরে এসে পুরো প্রাতরাশ।

নটায় কাছাকাছি ঘুম ভাঙে রেবার। ইস্ অনেকটা বেলা হয়েছে, জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে পিঠের ওপর। অশোক আজ মাংসের স্টু খেতে চেয়েছে। কখন রান্না হবে, হাসপাতালেই বা যাবে কখন!··· বিরক্তিতেই ছিটকানি খুলে বাইরে আসে রেবা। বাড়ীতে তিন তিনটে লোক রয়েছে, ডাকবে তো! সবগুলো কুঁড়ের যম, ফাঁকি দিতে পারলে কেউ নড়েও বসবে না। অসুখ শরীরে ঘন ঘন খিদে পায়। বেচারা হয়তো পথের দিকে চেয়েই হাপিত্তেস করবে।··· সুর সপ্তমে ওঠে রেবার, অনাদি—অনাদি—

ভৃত্য অনাদি কি একটা কাজে মিনিট-খানেক বাইরে গেছে। হেঁসেল থেকে ঠাকুর চায়ের বাটি নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। রেবার মেজাজ দেখে ভীত কণ্ঠেই উত্তর করে, অনাদি এইমাত্র বাইরে গেছে মা। চা ঘরের মধ্যে দেবো কি?

কবে আমি চান না করে খাই, নিয়ে যাও তোমার চা? হতভাগা গেলো কোথায়, এতো বেলা হ'লো, বাজার হাট কিছু হয়েছে?

ঠাকুর বিস্ময় বোধ করে, রোজই তো বিছানায় বসে চা খান, আজ হ'লো কি? রাত্রে তো মেজাজ খুশীই দেখেছে, সকালেই আবার কি হ'লো! ভয়ে ভয়েই জবাব দেয়, ফর্দ না পেলে—

কথা শেষ না হতেই ফেটে পড়ে রেবা, একদিন যদি আমার অসুখ করে তোমরা কেউ বাজারটাও করতে পারবে না?

ঝি লক্ষীর মা চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে। অসুখের কথা শুনে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, কি অসুখ করেছে মা?

রেবা লজ্জা পায়। বোঝে অকারণেই এদের ওপর মেজাজ খারাপ করছে। আমতা আমতা করেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করে, না না, অসুখ করেছে আবার কখন বললাম। এমনিই শরীরটা ভাল লাগছে না।

লক্ষীর মা আর কিছু জিজ্ঞেস করবার পূর্বেই অনাদি এসে হাজির হয়। রেবা পূর্ববৎ চড়া সুরেই আরম্ভ করে, বাজারে যাওয়া হবে কখন নবাব পুত্তুর, বেলা হয়নি?

কি আনব বলে দিন, মাথা চুলকাতে থাকে অনাদি।

আনবি আমার মাথা আর মুণ্ডু। একটু যদি আক্কেল থাকে তোদের। নিজেদের কি, বসে বসে চারবেলা গিলবি, অসুখ-মানুষ কখন খাবে, সে খেয়াল আছে?

অনাদি মাথা নত করে চুপচাপই দাঁড়িয়ে থাকে।

রেবা চেঁচাতেই থাকে, যাও, আর দাঁড়িয়ে না থেকে দৌড়ে ওঁর জন্য কিছু মাংস, বিট, গাজর আর তোমাদের জন্যে যা খুশি নিয়ে এসোগে।

মাথা চুলকাতে চুলকাতেই রওনা হয় অনাদি। নীচে নামতে না নামতেই আবার পেছন ডাকে রেবা, যাচ্ছিস তো, কিসের মাংস আনবি শুনি?

মাথা নত করেই উত্তর দেয় অনাদি, খাসির।

তোর মাথা! খাসির মাংস দিয়ে কখনো স্টু হয়? তোদের কি হয়েছে বলদিকি?

অনাদি তবু নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকে। বলে না দিলে ও বুঝবে কেমন করে, কি রান্না হবে, কি বাজার হবে! আজ হ'লো কি গিন্নীমার, ঘুম থেকে উঠেই গালাগালি করছে!

রেবা পুনরায় ঝাঁজিয়ে ওঠে, যাও, আর দাঁড়িয়ে না থেকে দয়া করে ছোট দেখে একটা মুরগী নিয়ে এস।

অনাদি ঘাড় কাৎ করেই রওনা হয়।

রেবা আবার পেছন ডাকে, দুটো কই মাছ আনতে হবে, সে খেয়াল আছে তো? কেউ শুধু স্টু দিয়ে ভাত খেতে পারে না।

লক্ষ্মীর মা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ভয়ে ভয়েই প্রতিবাদ করে, চোত মাসে কৈ মাছে পোকা হয় মা, অসুখ মানুষের খেতে নেই।

তবে এতক্ষণ সব চুপচাপ বসেছিলে কেন, বলতে পারোনি? যা ইচ্ছে করগে, আমি জানিনে। ঘরে ফিরে এসে ড্রেসিং টেবিলের কাছে বসে রেবা। অনাদি মুশকিলে পড়ে। লক্ষ্মীর মা সাহসে নির্ভর করেই রুই মাছ আনতে বলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে যায়। চা ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাই ঠাকুরও আর দ্বিতীয়বার সাধবার সাহস না পেয়ে হেঁসেলের দিকেই রওনা হয়।

বড় আয়নাটায় নিজের মুখ দেখে নিজেই শিউরে ওঠে রেবা। ইস্,

একরাত্রে কি হাল হয়েছে! অশোককে মুখ দেখাবে কেমন করে? চোখের নীচে কালিমা ফুটে উঠেছে, জবা ফুলের মতো টকটক করছে দুচোখ। চুল আলুথালু। এভাবে হাসপাতালে গেলে অশোকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে যে। যদি মুখ দিয়ে সত্যি কথা বেরিয়ে যায়? বেচারার হয়তো খাওয়াই হবে না। যাই, ভাল করে চান করে আসি। মিছিমিছি ওদের ওপর রাগ দেখানো হ'লো। বেচারারা বোধ হয় এতক্ষণ চা'ও খায়নি। আবার ডাকে রেবা লক্ষীর মাকে। লক্ষীর মা ছুটতে ছুটতে কাছে আসে, সঙ্গে ঠাকুরও। ভালভাবেই জিজ্ঞেস করে রেবা, তোমরা চা খেয়েছ?

কোন উত্তর হয় না ওদের তরফ থেকে।

রেবা বুঝতে পেরেই জের টানে, যাও, চট করে চা জলখাবার খেয়ে সমস্ত রান্না শেষ করে নাও। স্টুটা আমি এসেই করছি। এত বেলায় আমি আর খালি পেটে চা খাবো না। যা হয় কলঘর থেকে এসেই খাবো, বলতে বলতে কলঘরে চলে যায় রেবা। লক্ষীর মা, ঠাকুর বিস্ময়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হেঁসেলের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়।

২০

আহারে রুচি নেই, কিন্তু না খেলে আরো শুকনো দেখাবে যে। অশোক হয়তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করবে। কি জানি, উত্তর দিতে দিতে যদি আসল কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়? রেবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়মিত আহার গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু কোন ক্রমেই গলাধঃকরণ করতে পারে না। এক রাত্রে কণ্ঠনালী যেন শুকিয়ে গিয়েছে। চায়ের কাপে বার দুই চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখে। মাখন

পাঁউরুটিতে তো হাতই পড়ে না। ছ'চোখ জ্বালা করছে, বিছানায় যেতে পারলে হয়তো একটু ঘুম হতো, কিন্তু উপায় নেই। এক্ষুনি হেঁসেলে যেতে হবে। অশোক ওর হাতের স্টু খেতে ভালবাসে। আর ক'দিনই বা সুযোগ পাবে। হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরলেই তো ওর ছুটি। ছুটি নয়, চির বিদায়—। ভাবতে ভাবতে ছ'চোখ জলে ভরে ওঠে রেবার। এইতো সেদিনের কথা, অশোক ওকে কুড়িয়ে এনেছে—জীবন দান করেছে। জীবন সঙ্গিনীই হয়তো করতে চেয়েছে, কিন্তু দমকা হাওয়ায় ভেঙে গেলো সে ঘর। সেদিন অশোকের কাছে ধরা না দিলেই ছিল ভাল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গোয়েঙ্কার কাছে ফিরে গেলে সব গোলমাল চুকে যেতো।

জোর করেই ছ'মুঠো ভাত মুখে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলে এসে বসে রেবা। অন্যদিন অপেক্ষা একটু বেশী করেই রং পালিস করে। অশোক যেন টের না পায় ওর মনের কথা। রোগা শরীর, দুশ্চিন্তা বাড়লে সারতে দেরি হবে। হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে বাড়ী ফিরুক,—তারপর সুযোগ মতো চলে গেলেই হবে। হেনা নিশ্চয় আর একদিন জ্বালাতন করবে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে, কৌশলেই কাজ গুছিয়েছে, কিছুটা ধৈর্য ধরবে বৈকি? বেচারা, বোনের জন্য কতদূর নামতে হয়েছে। মানুষ এমনিই তো স্বার্থপর।···

ভাবতে ভাবতে প্রায় সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি হাসপাতালের দিকে রওনা হয় রেবা। চাকর দিয়ে খাবার পাঠালেও চলতো, ছ'একদিন পাঠিয়েছেও, কিন্তু আজ আর তা হয় না। নিজের হাতে স্টু' রেঁধেছে, নিজের কাছে বসিয়ে না খাওয়ালে তৃপ্তি নেই। তাছাড়া একা একা হয়তো অশোক সবটা খাবেই না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টিফিনকেরিয়ার সমেত ট্যাক্সিতে গিয়ে ওঠে। ইস্, কত বেলা হয়ে গেছে! এগারোটার মধ্যে রোগা মানুষের খাওয়া দরকার। অনুশোচনাই হয়

রেবার। বোঁ করে এসে হাসপাতালের ফটকে লাগে ট্যাক্সি। লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে। অশোক শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল। খিদে তার তেমন হয়নি। সকালে এক বাটি দুধ, দুটো ডিম সেদ্ধ ও মাখন পাঁউরুটি খেয়েছে। বারোটা আন্দাজ ভাত খেলেই যথেষ্ট। রেবাকে আগেও দিনকয়েক বলেছে, কিন্তু রেবা নাছোড় বান্দা। সকাল সকাল না খেলে নাকি বিকেলে জল খাওয়াই হয় না। তারপর রাত্রে আবার লুচি মাংস।

রেবার পায়ের শব্দে বুকের ওপর থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে নেয় অশোক। চোখাচোখি হতেই আবদার করে, আমার কিন্তু এখনো ভাল খিদে হয়নি, খাবার সাজাবে না বলছি।

না, খিদে হয়নি, হাসপাতালে কারো খাওয়া বাকী আছে কি না? উঠে বসো, হাত মুখ ধুয়ে নাও। গম্ভীরভাবেই টিফিন কেরিয়ার খুলে টেবিলের ওপর খাবার সাজাতে থাকে রেবা।

অগত্যা, দেবীর যেরূপ হুকুম, ঈষৎ হেসেই উঠে বসে অশোক। বসতে বসতে পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে, তোমাকে এত রুক্ষ দেখাচ্ছে স্থ। কাল বুঝি সারারাত বোনের জন্মতিথিতে মেতেছিলে?

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ে। তবু ঠোঁটে মৃদু হাসি টেনেই জবাব দেয় রেবা, খুব পণ্ডিত যা'হোক, জন্মতিথি আবার কারো সারারাত জেগে হয় নাকি?

তাহলে বেশী খেয়ে ভাল ঘুম হয়নি বলো। চোখ যে জবাফুলের মতো টকটক করছে?

বুক চিরে যদি দেখানো যেত তা হলে দেখাত রেবা, কেমন খেয়েছে আর কেমন মেতেছে উৎসবে। তবু হাল্কাভাবেই জবাব দেয়, বড় লোকের বাড়ী, কম খাবো কেন?

সেতো বুঝতেই পারছি, বোনকে আদর করলেন, অথচ বোনের বরটিকে—

আঃ, কি হচ্ছে, পাশের ওঁরা শুনতে পাবেন! দম বন্ধ হয়ে আসে রেবার।

কেন, বেফাঁস কিছু বলছি নাকি? মধুর সম্পর্ক হ'লো, এটুকুও বলতে পারবো না?

হয়েছে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, এখন ওঠতো?

ভয় নেই, নতুনে আমার লোভ নেই, পুরোনোই ভাল।

কি যে বাজে বকতে পারো, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি জানি না, রেবার কণ্ঠে অভিমানের স্বর।

আচ্ছা এই নাও, বাজে ছেড়ে এবার কাজের কাজ করছি, বলতে বলতে খেতে শুরু করে অশোক। স্টু'য়ের বাটি থেকে এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে, খাসা হয়েছে তো, খাওনা একটু?

হু, ভর পেট খেয়ে এসে কেউ আবার খেতে পারে? দেখি দেখি, ভাতে যেন একটা চুল দেখলাম। অশোকের হাতের গ্রাস থেকে একটা ছোট চুল বেছে ফেলে দেয় রেবা।

অশোক মুচকী হেসেই পূর্ব কথার জের টানে, ভুলেই গিয়েছিলাম, বোনের বাড়ীর খাওয়া, দুদিন না খেলেও চলবে। কিন্তু সত্যি সু, তোমাকে আজ বড্ডো শুকনো দেখাচ্ছে। অসুখ করেনি তো?

না—না, কি যে সব বলছো, শুকনো দেখাবে কেন?

দেখাচ্ছে তা বলবো না? যা'হোক তোমার বোনটি যে ক'দিন আর হাসপাতালে আসছেন না?

বেশতো, যদি দরকার থাকে বলো, পাঠিয়ে দেবো?

সম্পর্ক হিসেবে দরকার নেই বলছিলে, তবে—

তবে কি—

না থাক, দেবীর আবার অভিমান হবে।

আমার বয়ে গেছে।

চটলে তো ?

চটবো কেন, বেচারা এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে, তাই হয়তো আসতে পারছে না।

অথচ জন্মতিথির উৎসব বেশ জাঁকিয়েই হ'লো।

তা পরীক্ষা বলেতো আর জন্মতিথি পেছিয়ে যেতে পারে না।

খুব হয়েছে, ওদের জন্মতিথি ওরাই করুক, তুমি এখন বাসায় ফিরে একটু ঘুমিয়ে নাওগে তো। বেশ বুঝতে পারছি, রাত্রে তোমার ভাল ঘুম হয়নি।

কেন, এখানে থাকলে কি তোমার অসুবিধে হবে ?

কিছুমাত্র না। সেতো বেশ ভালই হয়, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে একটু ঘুমোও আমি বসে বসে কাগজ পড়ছি।

হু, তারপর হাসপাতাল সুদ্ধ লোক এসে তাই দেখুক, খুব বুদ্ধি ?

তাহলে আর কাজ নেই, তুমি এখন এসো।

রেবাও মনে মনে ভাবে, তা মন্দ হয় না। বেশীক্ষণ কাছে থাকলে কি জানি কি কথায় কি কথা উঠে পড়ে। প্রকাশ্যেই অশোকের কথার জবাব দেয়, বেশ, আমি যাচ্ছি, তুমিও একটু গড়িয়ে নাও, আহারের পর একটু বিশ্রাম দরকার। বিকেলের দিকে না হয়, আর একবার আসবো'খন।

না, আজ আর আসতে হবে না, বরং লেকের দিকে একটু হাওয়া খেয়ো। শরীর যে দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে ?

রেবার মানস পটে আবার ধাক্কা লাগে। শরীর, কি হবে শরীর দিয়ে ? তবু হাল্কাভাবেই উত্তর করে, শরীর ভাঙতে আবার দেখলে

কোথায়, দিন দিনতো খাসি হচ্ছি। শুয়ে পড়ো, আমি চললেম। টিফিন কেরিয়ারটা পুনরায় গুছাতে থাকে রেবা।

শুয়ে বসে আমার আর ভাল লাগে না। কালই ডক্টর বোসকে অনুরোধ করবো, আমাকে ছুটি দিতে।

কালের কথা কাল হবে, এখন ঘুমোও। রেবা আর একবার অশোকের প্রতি গিন্নীপনা করে বেরিয়ে আসে। হাঁটতে আর পারে না। পায়ে যেন কে পাথর বেঁধে দিয়েছে।

২১

আজ সাতদিন, হেনা এপর্যন্ত আর রেবার সঙ্গে দেখা করেনি। নিজের কাছেই নিজকে বড় ছোট মনে হয়েছে ওর। যে কাজ ও করেছে, কোন শিক্ষিতা নারীর পক্ষেই তা করা উচিত নয়। একজনের সোনার সংসারে আগুন জেলে দিয়েছে। অমুদি অজয়বাবুকে শ্রদ্ধা করে। পত্নিত্বের দাবিতেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। হয়তো তার সে দাবি যৌক্তিক নয়। তবু অজয়কে বেঁধে রাখতে পারেনি সে। অজয়বাবু ধরা দিয়েছেন রেবাদির কাছে। তার কাছে সে অশোক। অমুদির নিকট পরিচিত নামটাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন কবি। রেবাদি তো অশোকবাবুকে ভালই বাসে। অমুদির মতো সেও চায় তাকে প্রাণের মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠা করতে। তবে কেন ও উভয়ের প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন করতে উদ্যত হ'লো? ছোট বোনের মতোই পাশে স্থান দিয়েছিল রেবাদি। দুদিনেই অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল, এই কি তার প্রতিদান? হেনা, নিজে নিজেই ধিক্কার বোধ করে। আর এগুতে সাহস পায়নি। কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে মির্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে। মেডিক্যাল কলেজের সুমুখ দিয়ে যেতে ভয় পায়। পাছে রেবার সঙ্গে

দেখা হয়ে যায়। হাসপাতালের ঐ ফটক থেকেই প্রথম দিন রেবাকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল। কালকূট বিষ ঢালবার প্রথম প্রচেষ্টা। আগামী এপ্রিলে ফাইন্যাল পরীক্ষা, মনের ওপর প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে চলেছে। কেন এ কাজ করতে গেলো ও? অমুদি যদি নিজের চেষ্টায় ধরে রাখতে না পারে অশোকবাবুকে তবে ও কেন আর একটি কোমল প্রাণে বিষ ছড়াতে গেলো?...

হাসপাতাল আর বাড়ী, বাড়ী আর হাসপাতাল। রেবা ভাল করে খায় না, ঘুমোয় না, সাজগোজ করে না। অশোক সঠিক ধরতে পারে না। নানাভাবে জেরা করে, রেবা হেসে হেসেই পাশ কাটিয়ে যায়। অশোককে বাড়ী আনতে পারলেই ওর ছুটি। হেনার দেওয়া আঘাতটা প্রথম দিন-দুই বড় দমিয়ে দিয়েছিল। অনেক ভেবেচিন্তে এখন হাল্কা হতে পেরেছে। সেই-ই ভাল, অসীমাকে নিয়েই অশোক সুখী হোক। কে রেবা, কি সম্পর্ক অশোকের সঙ্গে তার? পথের বন্ধু, পথেই মিলিয়ে যাক। ওর পক্ষে ঘর বাঁধতে যাওয়া অন্যায়, প্রতারণাই করা হবে অশোকের সঙ্গে। না না, ও তা করবে না, কিছুতেই না...ড্রেসিং টেবিলের নিকট বসে অশোকের ফটোটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে থাকে রেবা। রোজ রোজ অশোকের নিকট কৈফিয়ৎ না দিয়ে একটু ভাল করে সেজেই আজ হাসপাতালে যাবে। কিন্তু তবু যেন অকারণেই কাঁদনের ধারায় বিগলিত হয়ে যাচ্ছে প্রসাধন পরিবেশ। ছিঃ, অশোক ভাববে কি? আর তো মাত্র কটা দিন, একটা কবিতার বই টেনে নেয়। অশোকের লেখা কবিতা, কতদিন আবৃত্তি করে শুনিয়েছে অশোককে। ওর মুখে আবৃত্তি শুনতে বড় ভালবাসে অশোক। বর্ষায়-বাদলে-বসন্তে একের পর এক কবিতায় মেতেছে দু'জনে। চাই কি, গানের সুর দিয়েও নিশিদিন মুখর করে তুলেছে, কিন্তু আজ অজান্তেই সহসা ছন্দ পতন ঘটে যাচ্ছে। রেবা জানালায়

দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থাকে অশোকের ফটোর দিকে। বিরহিনা যক্ষ প্রিয়া কি নূতন করে রূপ পেলো ওর মধ্যে ?···আচম্বিতে শক্ত হতে চেষ্টা করে রেবা। হাসপাতালের সময় যে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। মোটা করে পাউডারের প্রলেপ ঘষে জামা কাপড় পরে নেয়। ঠোঁটের রং হয়তো যে কোন ফিরিঙ্গী রমণীকেও লজ্জা দেবে, তবু ভেতরের কালসাপটা যেন অবিরতই ছোবল মারছে। কিছুতেই আজ আর ওকে উজ্জ্বল দেখায় না। রেবার বিরক্তিই আসে।

হেনা ওকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। বেচারা লজ্জায়ই হয়তো মুখ দেখাতে পারছে না। বোনের বিপদে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই হয়তো একাজ করতে হয়েছে ওর। হেনার প্রতি অনুকম্পাই হয় রেবার। তাছাড়া হেনাকে ওর একান্ত প্রয়োজন। ওর সাহায্যেই অশোকের নিকট থেকে পালাবার পথ তৈরী করে নিতে হবে। তাই হেনা পাশ কাটিয়ে চললেও রেবার প্রয়োজন ওকে খুঁজে বার করা। হয়তো ওদের বাড়ীতে গেলে সহজেই দেখা হয়। কিন্তু সেখানে যাওয়ায় অনেক বিপদ। অসীমা রয়েছে, সুপ্রভা দেবী সুলালও রয়েছেন। সকলকে যদি মনের কথা বুঝিয়ে না বলা যায় ? নিভৃতে হেনাকেই প্রয়োজন। হেনা তো প্রেসিডেন্সীতেই পড়ে, হাসপাতাল থেকে সামান্য দূর। সেখানে ধরতে পারলে নির্ঝঞ্ঝাট। হাসপাতাল থেকে একটু সকাল সকাল বেরিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের পাশে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করে রেবা। গাড়ীর নম্বরটা মনে আছে। ঐ তো ব্লু রংয়ের বড় ক্রাইসলারটা দাঁড়িয়ে আছে। এখনো তা হলে ছুটি হয়নি হেনার। স্বস্তির হাঁপ ছেড়েই লক্ষ্য ঠিক রাখে রেবা।

ছুটির পর স্বাভাবিকভাবেই গাড়ীতে উঠতে যায় হেনা, রেবা পাশ থেকে এসে মৃদুহাসিতে কাঁধের ওপরে হাত রাখে। বিদ্যুৎ আহতের মতোই চমকে ওঠে হেনা। চকিতে সমস্ত চোখ মুখের

রং বদলে যায়। রেবা সহজভাবেই তাড়া দেয়, চল, তোর সঙ্গে বাসায় ফিরবো বলে অপেক্ষা করছি।

গাড়ী কাঁপুনি দিয়ে চলতে থাকে, হেনা কোন প্রশ্নই খুঁজে পায় না। কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী। বাঁ দিক কেটে পার্ক স্ট্রীট হয়ে ল্যান্সডাউন রোড ধরে চলতে শুরু করেছে গাড়ী, কারো মুখে কোন কথা নেই। প্রথম দিনের কথা মনে পড়ে বুক ফেটে কান্না আসে রেবার। সেদিন মুখর হয়েই পথ চলেছিল ওরা। আর আজ ?···আর হয়তো কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাত্রা থেমে যাবে। রেবা নিজকে চেপেই প্রশ্ন করে, তুই আর যাচ্ছিসনে যে ?

হেনা এতক্ষণ দম ধরে ছিল। এবার ফেটে পড়ে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো রেবাদি, আমি—

বোকা মেয়ে কোথাকার, পরীক্ষার আগে এইসব ছাইপাঁশ ভেবে ভেবে মন খারাপ করছিস তো ?

রেবাদি তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই পাশ করতে পারবো না।

কেন, কি অপরাধ তুই করেছিস যে আমি তোকে ক্ষমা করবো ?

ওকথা বলে তুমি আমাকে আর অপরাধী করো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, বলতে বলতে রেবার পা জড়িয়ে ধরতে যায় হেনা।

আঃ, কি পাগলামো করছিস ? ওরকম করলে সত্যি আমি গাড়ী থেকে নেমে যাবো। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে হেনার হাত।

সত্যি তুমি নেমে যাও রেবাদি, আমার এমুখ তুমি আর দেখো না।

কি সব বাজে বকছিস ? দেখছিস না, ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে রেবা। গাড়ী ততক্ষণে রাসবিহারী এ্যাভেন্যুর জংশনে এসে পৌঁছেছে। কথার মোড় ঘুরিয়ে পুনরায় বলে রেবা, আমি এখানেই নেমে যাই, তোকে আজ আর আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই।

কেন, ভয় করছে? হেনার কণ্ঠে ঔদাসীন্যের সুর।

ক্ষীণ হেসেই জবাব দেয় রেবা, পাগলী কোথাকার, ভয় আবার কিসের! পরীক্ষার আগে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কি বল?

লোকসান হয়তো তোমার ষোল আনাই করেছি, কিন্তু আমারও বোধ হয় সবকিছু গোলমাল হয়ে যায় রেবাদি।

না, তোকে দেখছি এভাবে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। চল, শুনিগে কি তুই বলতে চাস!

হেনা নিরুত্তরই থাকে। গাড়ী এসে রেবার ফটকে লাগে।

হেনাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরেই এসে বসে রেবা। খানিকটা দম নিয়ে অনুরোধ করে, একটু চা খা?

ঘাড় নেড়েই সম্মতি জানায় হেনা, বেশ দিতে বলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে পুনরায় উচ্ছ্বাস জানায় হেনা, রেবাদি, দুদিন তোমার সঙ্গে পরিচয়, কত আপনার করেই নিয়েছিলে তুমি—

রেবার বুকের ভেতরও চৌচির হয়ে যচ্ছিল, তবু হাল্কা হয়েই বাধা দেয়, কেন, এখন কি পর হয়ে যাচ্ছিস নাকি?

এরপরও কি আপনার হয়ে থাকা যায়—রেবাদি? তোমার সংসার তোমার স্বপ্ন—

সত্যি তুই আমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিস। কিন্তু স্বপ্নতো সত্যি নয় বোন! তা ভেঙে দিয়ে তুই কেন পর হতে যাবি? বিশ্বাস কর, আমি তোর কাছে কৃতজ্ঞ—মহা উপকার করেছিস তুই আমার। বুদ্ধিমতী বলেই এমন সুন্দরভাবে আমার চোখের পর্দা খুলে দিতে পেরেছিস। তুই আমার সত্যি বোন।

অমন করে তুমি আমাকে বলো না রেবাদি, আমি সহ্য করতে পারবো না।

কথাটা যখন উঠেছে তখন মাঝ পথে থামিয়ে দিসনে, আমি

পাগল হয়ে যাবো। তুই যে আমার কি উপকার করেছিস, তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না। সেবার অশোক রেজিষ্টারের কাছে যাবার জন্য পেড়াপীড়ি করছিল। কি জানি কেন, মন আমার সায় দেয়নি। এবার হাসপাতাল থেকে ফিরলে হয়তো ওকে আর রুখতে পারতেম না।

সেইটাই তো স্বাভাবিক। অশোকবাবু সত্যি তোমাকে ভালবাসেন, আর তুমিও—

হ্যাঁ, আমিও ভালবাসি অশোককে। চাঁদ আর চকোরী। চাঁদকে ভালই বাসা যায়, হাতের মুঠোর মধ্যে তো পাওয়া যায় না ভাই।

কিন্তু—

এতে কোন কিন্তু নেই। আমার কাছে অশোক চাঁদ, অসীমার কাছে সে জীবন-সত্য। আমি দূর থেকেই চাঁদের শোভায় মোহিত হবো। আমার চাঁদ অসীমার ললাটে মুকুট হয়ে শোভা পাক।

বড় নিষ্ঠুর তোমার পরিকল্পনা রেবাদি।

এ-ই বিধিলিপি বোন। তুই আমাকে দিদি বলে ডেকেছিস, আর প্রশ্ন করিসনে? শুধু জেনে রাখ, আমি মোহগ্রস্ত হয়েছিলাম, তুই আমার ভুল ভেঙে দিয়েছিস।

এইটেই আমার পক্ষে চরম খেদ। যদি তোমার সঙ্গে জীবনে পরিচয় না হতো।

হতেই হবে, ইচ্ছে করলেই কি তুই এড়াতে পারতিস! হাঁরে, তোর পরীক্ষা কবে শেষ হবে?

সাতই মার্চ।

মাত্র আর দশ দিন! তা হ'লে আর দেরি করিসনে, ওঠ।

জীবনের চেয়েও কি পরীক্ষা বড় রেবাদি?

তর্ক করিসনে, ভালভাবে পাশ তোকে করতেই হবে, নইলে নিজের কাছে আমি অপরাধী হবো।

তুমি কেন অপরাধী হবে তা বুঝতে পারছিনে ; তবে ভাল ফল তো দূরের কথা উতরোতে পারি কি না ভগবান জানেন।

অমন পাগলের মতো যা তা বলিসনে। তুই বিশ্বাস কর, তোর প্রতি আমার এতটুকু ঘৃণা কিংবা অভিমান নেই। আমার কথা ভেবে মিছে দুঃখ পাসনে।

বেশ আমি চললেম, তুমি এই যক্ষপুরীতে ডুকরে ডুকরে মরো, উঠে দাঁড়ায় হেনা।

পরীক্ষা হয়ে গেলেই আর একদিন আসিস যেন, কিছু কাজের কথা আছে। উভয়ে নীচে নামতে থাকে। কয়েক পা চলতে চলতে পুনরায় অনুরোধ করে রেবা, দাদাকে একবারটি আসতে বলিস।

কে—সুলাল দাকে ?

তিনি ছাড়া আর আমাদের দাদা কে আছেন ?

না, রেবাদি, দাদা বোধ হয় একা একা তোমার এখানে আসতে সাহস করবেন না। তোমাকে এ্যালবামটা দিতে প্রথম তিনিই খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন বটে, তারপর কেমন যেন মুষড়ে পড়েছেন !

তোরা সকলেই আমাকে বড্ডো ভুল বুঝে চলেছিস ভাই। বেশ, তিনি যদি একা না আসেন তা'হলে তুই-ই সঙ্গে করে পরীক্ষার পর একবার আসিস।

গাড়ীতে এসে ওঠে হেনা। বড় বিমর্ষ দেখায় আজ ওকে। গাড়ী না ছাড়া পর্যন্ত রেবা দাঁড়িয়েই থাকে। বোধ হয় দম আটকে আসছিল। কখন যেন অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়ী।

পরের দিন বিকেল চারটেয় হাসপাতালে আসে রেবা। রোজই আসে, তবে আজ অপেক্ষাকৃত একটু উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। হেনার কাছে কথাগুলো বলতে পেরে অনেকটা হাল্কা হতে পেরেছে ও। অশোক গোঁজ হয়ে বসেছিল। মুখ চোখ থমথম করছে। টের পেলো কি সব কথা? রেবার একটু শঙ্কাই হয়। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়েই প্রশ্ন করে, কবির মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমেছে?

মনের ময়ূর তবু নাচছে কৈ? হাল্কা হেসেই জবাব দেয় অশোক।

কবির মনেতো ময়ূর সর্বদাই নাচে। তবে বসন্তে কোকিলের ডাকই ভাল শোনায়।

হয়তো ভাল, কিন্তু আমার বড় ভয় হয় সু। ওর উদাস ডাকে, কার যেন হাহাকার শুনতে পাই মনের গহনে। কদিন তুমি কাছে নেই, আমার মনে হয়েছে, আমি যেন তোমাকে হারিয়ে বসে আছি। সু, তোমার কেমন লাগছে?

রেবার হৃদয়ের বাঁধ বুঝি ভেঙে যায়, তবু অবিচলতা নিয়েই উত্তর দেয়, আমি তো আর কবি নই যে বিরহী আত্মা কেঁদে উঠবে! তাছাড়া রোজই তো কবি সন্দর্শনে আসছি।

আসছো, কিন্তু রাত্রিটাই কি কম বড়ো?

বেশ, কাল থেকে না হয় বিছানা বালিশ নিয়ে এখানেই হাজির হবো।

না না, আমি তা বলছিনে, এখানে তোমার স্বাস্থ্য থাকবে না। ইজি চেয়ারে কেউ কখনো ঘুমোতে পারে? আমাকে তুমি বাড়ী নিয়ে চলো। সু, দীর্ঘদিন তুমি কাছে কাছে রয়েছ, তোমার অভাব যে কি তা আমি বুঝতে পারিনি। এক মুহূর্তও ভাল লাগে না তুমি কাছে না থাকলে।

রেবার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। কোন উত্তর দিতে পারে না। পশ্চিম গগনের আবীর রাগ এসে পড়েছে চোখে মুখে। ওকি ভৈরবী, মহাপ্রস্থানের অভিযাত্রী? অশোক বলেই চলে, তুমি বুঝি বিশ্বাস করতে পারছো না সু? কিন্তু আমিও আগে জানতুম না, তুমি আমার কে—হৃদয়ের কোথায় তোমার স্থান?

রেবা ম্লান হেসেই উত্তর করে, বুঝেছি, কবিতার জোয়ার এসেছে আজ। কিন্তু পাঁজরার হাড় যে এখনো ভাল করে জোড়া লাগেনি, আর কটা দিন ধৈর্য না ধরে উপায় কি বলো?

ডাক্তারদের সবকথা শুনতে নেই সু, ওঁরা ব্যবসা করেন। তুমি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো আমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবো। এই ক্ষণ-বসন্তে তুমি মুখোমুখি বসে কবিতা শোনাবে আর আমি অবাক হয়ে তাই শুনবো, নয়নভরে দেখবো। সু, তুমি আমার জীবনে অতৃপ্ত কামনা।

আ—! এযে হাসপাতাল, শুনতে পাবে কেউ!

তাই তো বলছি সু, এ হাসপাতাল, এখানে শুধু শল্যই চলে, মনের কথা এরা কেউ জানেন না, তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

আচ্ছা, কাল আমি ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবো। ঐ হাস-পাতালের ঘন্টি পড়লো, আমি এবার উঠি।

আর একটুও তো থাকতে পারো সু, ওঁরা কেউ আমাদের বাধা দেন না।

বাধা আসার আগেই সতর্ক হওয়া উচিত কবি, ওটা আসলে আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না।

বেশ, তাহলে তুমি এসো। অশোকের কণ্ঠে উদাস সুর।

কিন্তু কথায় কথায় এগুলো যে সব পড়েই রইলো, খেয়ে নাও? টেবিলের ওপর রাখা খাবারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেবা।

না, শুধু গুচ্চের খাও আর শুয়ে থাক, আমার ভাল লাগে না। আজ আর আমি কিচ্ছু খাবো না। বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর করে অশোক।

লক্ষ্মীটি, আমার মাথা খাও, ওরকম জিদ করলে শরীর সারবে না। নাও, খেয়ে নাও, অশোকের মুখে জোর করেই একটা সন্দেশ গুঁজে দেয় রেবা।

কতকটা অভিমান নিয়েই সবগুলো খাবার খেয়ে নেয় অশোক। রেবা হেসে হেসেই রসিকতা করে, এখন কে খেলে? পেটে খিদে থাকলে রাত্রে ভাল ঘুম হয় না।

তুমি খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমোও তো?

কবি হতে পারলেম কৈ যে, ঘুম হবে না?

কবিপ্রিয়া তো বটে, হেসে ফেলে অশোক।

তাহলে এবার স্বপ্ন দেখ, আমি চললেম। ওষ্ঠে হাসি টেনেই বেরিয়ে আসে রেবা। হাসপাতালের দরজা পার হতে হতে দুচোখ জলে ভরে ওঠে। অশোক—অশোক—ওর ধ্যান জ্ঞান ইষ্টদেবতা··· না না, একি অলীক মোহ ওর! হেনাকে কথা দেওয়া হয়েছে, অসীমার জন্য পথ ছেড়ে দেবে ও। অশোকের পথ ওর পথ আলাদা। অশোক চাঁদ ও চকোরী। হাত বাড়ালে কিছুতেই চাঁদের নাগাল পায় না চকোরী। রেবা ট্যাক্সী থামিয়ে উঠে পড়ে। মনের ময়ূরটা বোধ হয় ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। স্বপ্ন—স্বপ্ন—সব স্বপ্ন!

২৩

হেনার পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। হিসেব মত আসলে আজকেই হেনা আসবে। তবু রেবা পত্র দিয়ে পূর্বাহ্লেই আর একবার স্মরণ

করিয়ে দিয়েছে। সুলালকে সঙ্গে করে আনতেও বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। আর তো সময় নেই, অশোক আসছে সপ্তাহেই ফিরে আসছে। এবার অশোককে রোখা দায় হবে। রেবা সান্ধ্য প্রসাধন শেষ করে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। হাসপাতাল থেকে বেলা থাকতেই ফিরেছে। অশোকের নিকট বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি। ভাগ্যক্রমে কে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এসে অশোকের সঙ্গে জুটেছিল। উপন্যাস চাই একখানা।

সামনের পার্কেই খেলা করছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। প্রাণ প্রচুর্য উপচে পড়ছে। বছর দশেক অতীতের এক ছায়াছবি ভেসে ওঠে রেবার চোখের ওপর। মা, বলিষ্ঠ শিশুর মা হওয়া নারীত্বের এক মহিমাময় পরিণতি। অতীত বঞ্চনা করেছে বর্তমানও ব্যর্থ হতে চলেছে। যাক, সব ধূলোর সঙ্গে মিশে যাক। হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ কোটি প্রাণী মিছিল করে চলেছে, কে তার হিসেব রাখে? মহাকালের বুকে ঘর বাঁধা সে তো দুর্লভ ভাগ্যের কথা। ভাগ্য ওর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। অমৃত বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, গরল হয়ে করাঘাত করছে ···রেবা যেন শূন্যে উড়ে চলেছে। সহসা আলোর সংকেতে চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হেনার গাড়ী এসে ফটকে লাগে। আচম্বিতে সম্বিত ফিরে পায় রেবা। ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে আসে। সাদর সম্ভাষণে ওপরে এনে বসায় ওদের। সুলাল উৎসাহ বোধ করে না। গুরুতর অপরাধটা যেন সেই সব চেয়ে বেশী করে বসে আছে। ঘরের চারদিকে অশোকের স্মৃতি জড়ানো। নিপুণ হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে রেবা। সুলাল পা দিয়েই বুঝতে পারে, রেবা অশোক অভিন্ন। দিবা রাত্রির মতোই পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষ ছড়াতে যাওয়া ঘাতকেরই কাজ হবে। না না, অসীমা যদি সারা জীবন দুঃখ পায়, পাক; তবু রেবাকে ও আঘাত দিতে

পারবে না। ফুলের মতো মেয়েটি, কি ভদ্র, কি নম্র! দেহ থেকে শিরচ্ছেদ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সুলাল একটা পত্রিকার ওপর চোখ রেখে নীরব থাকে। হেনাও স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। কিন্তু রেবার মৌন থাকার উপায় নেই। একদিকে অতিথির অবমাননা অন্যদিকে নিজের পথ রচনায় বিমুখতা করা। পাত্র থেকে চা ঢালতে ঢালতে ঠোঁটে হাসি টেনেই প্রশ্ন করে রেবা, হেনার পরীক্ষা কেমন হ'লোরে? সুলালদা যে চুপচাপ?

হেনা উদাসভাবেই উত্তর দেয়, হয়েছে এক রকম।

কিন্তু সুলাল সহসা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। কোন রকমে নিমন্ত্রণটা রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। মনের মধ্যে যে গ্লানি রয়েছে, তাতে মুখর হবার উপায় নেই। রেবার সম্বোধনের মধ্যেও যেন আজ একটু কৃত্রিম সৌজন্যের গন্ধ আসছে। এ্যালবামটা হাতে পাবার আগে যথেষ্ট আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। সেদিন সহোদরার মতোই দাদা ডাকে অনুরণিত হয়েছিল কণ্ঠ। আর আজ শুধু নামের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক দা শব্দটা জুড়ে সৌজন্য রক্ষা করতে চাইছে মাত্র। না, এতে বলার কিছু নেই। আঘাতে প্রতিঘাত অনিবার্য। সুলাল কোন রকমে জবাব দেয়, চুপচাপ দেখলে কই, মুখের ক্রিয়া তো ঠিকই চলেছে, বলতে বলতে চায়ের কাপে একটু জোরেই চুমুক দেয়। কথা কয়টা সহজভাবে বলতে পারলে হাস্য রসেরই সৃষ্টি হতো। সুলাল চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ওর কণ্ঠে কেমন যেন শুকনো শুনালো।

রেবা সুলালের মনের ভাব বোঝে। ওর সঙ্গে আজ একটু ঘনিষ্ঠ হতেই ওর বাসনা। তাই মাত্রা চড়িয়েই পুনরায় বলে, মুখের ক্রিয়াই বা তেমন চলছে কই? খাবার যে নড়ছেই না, চপল হাসি উপচে পড়ে।

দাদা থেকে দা'তে ঠেকেছে। রামধনুর রংএর মতোই বদলে যাচ্ছে

রেবা। কি মিষ্টি চাউনী! কবি অশোক রায় ধন্য। কাব্যের মূর্তিমতী প্রেরণা নিয়ত জাগ্রত তার পাশে। সহসা অকারণেই যেন কথাগুলো মনে আসে স্থলালের। রেবা আজ অমন করে দেখছে কি বার বার ওর দিকে চেয়ে?···মিষ্টিরস রসিয়ে রসিয়ে খাওয়াই ভাল, রেবার প্রশ্নের উত্তর একটু সহজ হয়েই দেয় স্থলাল।

একটা গান গাইবো? জোয়ারের উচ্ছ্বাসেই পুনরায় হাল্কা হয় রেবা।

হেনা স্থলাল দুজনে এক সঙ্গেই উল্লসিত হয়, সে তো আমাদের সৌভাগ্য।

একা একা থাকি, আপনাদের সঙ্গ লাভও কম সৌভাগ্যের কথা নয়! আচ্ছা শুনুন, শুধু গলায়ই গাইতে থাকে রেবা—

হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, হৃদয়-পানেই চাই নি॥

গান থামলে হেনা উচ্ছ্বাস জানায়, তোমার গলা কি মিষ্টি রেবাদি!

ছাই মিষ্টি, এ আবার একটা গান হ'লো!

এর চেয়ে বেশী রস হলে আমাদের মতো বেরসিকেরা যে ডুবে মরবে রেবা, হেসে হেসেই বলে স্থলাল।

বাট বাট, শতায়ু হোন। যা বলছিলেম, অশোক শীগ্‌গীরই ফিরে আসছে। ওর আরোগ্যকে কেন্দ্র করে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে একটা প্রীতি সম্মেলন ডাকতে চাই।

মুখ থেকে কথাটা লুফে নিয়েই সম্মতি জানায় স্থলাল, বেশ তো, সে তো ভাল কথা।

আপনাদের কিন্তু সাহায্য করতে হবে আমাকে। এর আগে যত সভা সমিতি হয়েছে, অশোক নিজে তার বন্ধুদের নিয়ে ব্যবস্থা করেছে। এবার সব কিছু করতে হবে আমাকে। আর আমার সম্বল আপনারাই।

কবির প্রতি আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে রেবাদি, উত্তরটা হেনাই দেয়।

তাহলে সুলালদা, আপনাকে কিন্তু এ'কদিন রোজই একবার করে আসতে হবে।

আমন্ত্রণটা পেয়ে সুলাল খুশীই হয়। মন্দ কি, আর না হোক, রেবার কণ্ঠে রোজ অন্তত দুটো একটা গান শোনাও হবে তো। অশোকবাবু ফিরলে কতটুকু সুযোগ মিলবে সে কথা বলা যায় না। অন্তত এমন নিবিড় সান্নিধ্য লাভ কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। রেবাকে তো উৎসাহীই দেখা যাচ্ছে। এ্যালবামের প্রতিক্রিয়া বোধ হয় তেমন কিছু হয়নি। ভালই হয়েছে, লজ্জার হাত থেকে বাঁচা গেছে। অসীমা লেখাপড়া করুক, নিজের পথ নিজে খুঁজে পাবে।...বেশ, চেষ্টা করবো, তবে আর একটা গান না শোনালে কিন্তু উঠছিনে, সুলাল পুনরায় আবদার করে!

আমারও ঐ কথা রেবাদি, হেনাও নাছোড়-বান্দা।

কিসে যে তোদের ভাল লাগছে বুঝিনে, শোন তবে। আবার শুধু গলায় গাইতে থাকে রেবা।

আমি বেসেছি যে ভাল তোমার কবিতা
তাইতো তোমারে কবি।
আমি বাহুর বাঁধনে চাইনে বলে কি
ভুলিয়া যাবেগো সবি॥
মাটির এ খেলা ঘরে
মাটির এ দেহখানি,
লুটায়ে পড়িবে প্রিয়
দুদিনের কানাকানি;
(তখন) কেবা তোমারে স্মরিবে আমারে
মুছে যায় যদি ছবি॥

আমি আপনি মাতিয়া
গাই তব গান গাই,
যেথা শয়নে স্বপনে
তোমারেই শুধু পাই ;
তবে কেন মিছে খেদ কেন ভেবে মর
জাগ জাগ উষা রবি ॥

গান থেমে যায়, স্থলালের কানে তবু যেন রেশ চলে। তন্ময় আত্মহারা সে। রেবা পুনরায় রসিকতা করে, আগেই বলেছিলাম, ভাল লাগবে না। স্থলালদা তো একবর্ণও শোনেননি, অন্য মনস্ক হয়ে বাইরের দিকেই চেয়ে আছেন।

আচম্বিতে সম্বিত ফিরে পায় স্থলাল, কি যে বলো, অপূর্ব তোমার কণ্ঠ, গানের ভাষাও অপূর্ব। এটা কি অশোকবাবুর লেখা ?

আপনারা সকলেই শুধু তেলা মাথায় তেল দিতে জানেন !

তবে কি তোমার লেখা !

খুব আশ্চর্য হচ্ছেন তো ?

তা হচ্ছি বই কি। কিন্তু তুমি প্রকাশ করো না কেন ?

এবার কিন্তু সত্যি হাসালেন। তবু যদি আপনি কোন পত্রিকার সম্পাদক হতেন।

যে কোন সম্পাদক তোমার এ লেখা ছাপবেন রেবা।

কি দায় পড়েছে তাঁদের, সপ্তাহে দুটো কবিতা ছাপতে গিয়ে, দু'শ কবিতা পড়ে দেখবার ? তা ছাড়া বেচারাদের সময়ই বা কোথায় ? শুধু সম্পাদনা করেতো আর কারো পেট চলে না এ পোড়া দেশে !

তাহলেও তোমার চেষ্টা করা উচিত।

কোন আশাই নেই, কেউ নবীনদের পোঁছে না।

কেউ না পুঁছুক, সত্যি বলছি, আমার খুব ভাল লেগেছে।

বেশ, এইতো ভাল, নগদ দাম পেয়ে গেলাম। সত্যি বলুন, মন রাখছেন না তো? তির্যকভাবে তাকায় রেবা স্থলালের চোখে চোখ রেখে। স্থলাল থতমত খায়। সত্যি, বাড়াবাড়ি হচ্ছে না তো? কথা না স্থর, কোনটা ভাল?

একটু দম নিয়ে পুনরায় সায় দেয় স্থলাল, এ মন রাখবার কথা নয় রেবা, সত্যি আমার ভাল লেগেছে। আচ্ছা স্থরও কি তোমার নিজের?

সে বিদ্যে আর হ'লো কই। অশোক নিজে গাইতে পারে না বটে, কিন্তু স্থর জ্ঞান ওর অসাধারণ। লিখে ওকে দেখাতে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্থর দিয়ে দিলে। শুধু স্থর নয়, সেই রাত্রেই ওকে ছাদে বসে গেয়ে শোনাতে হ'লো। গানের সঙ্গে কোন যন্ত্রের সাহায্য একদম পছন্দ করে না অশোক।

যতখানি খুশী হবার কথা স্থলালের, কেন যেন ততখানি খুশী হতে পারে না। অশোকের গুণের সীমা নেই। কবি, ঔপন্যাসিক, স্থরশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী, কি না অশোক! কিন্তু অশোক তো বিলেত যায়নি। আইন কানুন কিছুই সে জানে না। দেশের যত বড় বড় নেতা, সে তো আইন জীবীরাই হয়ে থাকেন। মন্ত্রী, দূত, বিচারক সব। ভাল ছবি তুলতেই কি জানে অশোক? চারু কলায় ছবির স্থানও কম নয়।··· কিন্তু একি ভাবছে ও! অশোকের সঙ্গে ওর কি তুলনার থাকতে পারে! মিছিমিছি সে তুলনা করবে কেন ও? রেবা অশোক এক আত্মা, পৃথক দেহ। স্থখী হোক রেবা। আজীবন অশোকের ছত্র-ছায়ায় নির্বিঘ্নে ঘর সংসার করুক।···এলোমেলো চিন্তায় আচ্ছন্ন হয় স্থলাল।

রেবা যেন কি বলতে যাচ্ছিল, হেনা তাকে থামিয়ে দিয়ে ব্যস্ততা দেখায়, ওঠো, রাঙাদা? রাত যে অনেক হ'লো? রেবাদি হয়তো দুপুরে ভাল করে ঘুমোতে পারেনি।

কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেয় রেবা, না সুলালদা, আপনি বসুন। আমি অনেক দেরি করেই শুই।

বেশ দেরি হয়েছে ভাই, আজ ওঠি, বলে সুলাল।

তাহলে কাল কিন্তু সকাল সকালই আসছেন? অনেক কাজের কথা আছে।

চেষ্টা করবো।

চেষ্টা নয়, কথা রইলো।

আচ্ছা, তুমি এখন বিশ্রাম করো, তোমাকে আর নীচে যেতে হবে না। রেবা বাধা মানে না। ঠিক সদর পর্যন্ত এসে দুজনকে গাড়ীতে তুলে দেয়।

২৪

পরের দিন সন্ধ্যা সাতটা। হাইকোর্ট থেকে ফিরে ইজি চেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল সুলাল। আজকের সন্ধ্যাটি একেবারেই ছুটি। আজ আর কোন মক্কেল আসছে না। ইচ্ছে করেই কাউকে সময় দেয়নি সুলাল। একটু বিশ্রাম আবশ্যক, মন আর শরীর দুই হাঁপিয়ে উঠেছে।

অসীমা আর রেবা, আলো আর আগুন, মাঝখানে অশোক। এ্যালবামের প্রতিক্রিয়া তেমন আর কি হ'লো? রেবা তো দিব্যি অশোককে নিয়ে মেতে থাকতে চায়। এইতো তার নবজীবন লাভকে কেন্দ্র করে চলবে উৎসব। এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্যই সাহায্য চেয়েছে ও। কিন্তু সত্যি কি তাই? অশোকের পুরোনো বন্ধুদের কাউকে ডাকলেও তো পারতো। এমন কি করতে চায় যে রোজ ঘটা করে পরামর্শ করতে হবে!··· একা বাড়ীতে হয়তো

ভাল লাগে না বেচারার, তাই হয়তো সঙ্গ লাভের প্রয়োজন। কিন্তু আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ কতক্ষণ ঠিক থাকতে পারে? না, না যাওয়াই ভাল। রেবা অসন্তুষ্ট হলে ওর কি এসে যায়?…

আষাঢ়ের মেঘের মতোই থমথম করছে অসীমার মুখখানা। বেচারা, আজীবন তপস্যা করেই চলেছে। বোধ হয় দুঃখই আছে সারা জীবন কপালে। সুপ্রভা পিসীতো আহার নিদ্রা ছেড়েই দিয়েছে। হয়তো অন্তিম দিনের আর বেশী দেরি নেই। ছুটি পেলে বেঁচেই যায় বেচারা। টাকা কড়ির অভাব নেই, তবু সুখ নেই সংসারে। একমাত্র বংশধর ঐ অসীমা—ভাগ্যহীনা। খাঁ খাঁ করছে বিশাল অট্টালিকা দেশে। হ্যাঁ, সুপ্রভা পিসীর মরাই ভাল। অসাবধানতা বশতই কথাটা মনে হয় সুলালের। দুঃখও হয়।

প্রথম দিনকয়েক কোলকাতায় এসে বেশ লেখা পড়ায় মন দিয়েছিল অসীমা। সহজ সরল হয়ে মেলামেশাও শুরু করেছিল হেনা আর ওর বান্ধবীদের সঙ্গে। গান গেয়ে গেয়ে মাতিয়ে তুলেছিল ওদের, নিজেও মেতে উঠেছিল। কিন্তু অশুভক্ষণে পরিচয় হ'লো রেবার সঙ্গে। লজ্জা ঢাকবার আর জায়গা রইলো না। সেই থেকে দোর জানালা বন্ধ করে সারাদিন ঠাকুর ঘরেই বসে থাকে। কে অজয়, কে রেবা, সংসারের কাউকে ওর প্রয়োজন নেই। শুধু একা থাকতে চায়, শুধু একা। ব্যারিষ্টার হলেও কুলদেবতাকে বর্জন করতে পারেনি সুলাল। পূজারী রেখে নিয়মিত ভোগরাগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাধাগোবিন্দজীর। কিন্তু প্রাণহীন পূজায় ঠাকুর হয়তো তুষ্ট ছিলেন না। অসীমার ভক্তি যত্নে নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় পাষাণ দেহে। দিনে মাত্র বার দুই তিন মার বিছানার কাছে যাওয়া বই ঠাকুরঘর ছেড়ে আর কোথাও যায় না। তাও মাত্র সামান্য কয়েক মিনিটের জন্য। গানের মাষ্টার লেখাপড়ার মাষ্টারকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে তাদের আর প্রয়োজন হবে না। সুলালকে

না বলেই বলে দিয়েছে। বেচারারা হয়তো অবাকই হয়েছে। ভাল বেতনের সঙ্গে সুনামের স্বপ্নও দেখেছিল ওরা। ছাত্রী হিসেবে অনন্য সাধারণ অসীমা। পিতৃপিতামহের গোঁড়ামি না থাকলে অনেক আগেই হয়তো দু'তিনটে পাশ করতে পারতো। গান বাজনায়ও সুখ্যাতি অর্জন করা অসম্ভব ছিল না। মাত্র কয়েকদিন সে স্বপ্নে বিভোর হতে পেরেছিল। কিন্তু সহসা রেবার আবির্ভাবে ভেঙে গেছে স্বপ্ন। যশ, মান, খ্যাতি, সংসারে আজ আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই ওর।

সুলাল কদিন থেকেই লক্ষ্য করছে অসীমাকে, কিন্তু ডেকে দুটো সান্ত্বনা বাণী শোনাবার মতো সুযোগ পায়নি এ পর্যন্ত। সহসা দৃষ্টি পড়ে, অসীমা ঠাকুরঘর থেকে মার ঘরে যাচ্ছে। পেছন থেকে ডাকে সুলাল, অমু শোন।

উদাসীনীর মতোই পেছন ফিরে কাছে এসে দাঁড়ায় অসীমা। কিছুটা হাল্কা হতেও চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বুক ঠেলে যেন কান্না বেরিয়ে আসছে।

সুলাল সহৃদয়েই প্রশ্ন করে, তুই নাকি মাষ্টার মশায়দের বলে দিয়েছিস, ওঁদের আর প্রয়োজন হবে না ?

মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে অসীমা, কোন উত্তর দিতে পারে না।

সুলাল পুনরায় সান্ত্বনা দেয়, ছিঃ বোন, অবুঝ হতে নেই। একটু ধৈর্য ধরলে আমি জানি, জয়ী তুই হবিই। তা'ছাড়া আমার মনে হচ্ছে, রেবা তোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে অসীমার। তবু অনুযোগের সুরেই বাধা দেয়, তুমি কেন ওঁকে ওভাবে অনুরোধ করতে গেলে রাঙাদা ?

নারে, আমি ওকে কোন অনুরোধ করতে যাইনি। হাবভাবে মনে হচ্ছে, তোর ব্যথা ও বুঝতে পেরেছে।

ছি ছি ছি, হেনার মুখে আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমি ওঁর এ দান হাত পেতে নিতে যাবো কেন? না না, তুমি ওঁকে......

দান করবার মতো বিন্দুমাত্র অহংকার ওর মধ্যে আমি দেখিনি। অজয়কে হয়তো সত্যি ও ভালবাসে এবং তা বাসে বলেই হয়তো তোর ভালবাসার মর্যাদা বুঝতে পেরেছে।

আমি ওঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করছি, বিন্দুমাত্র ঘৃণা কিংবা ক্ষোভ ওঁর প্রতি আমার নেই। অজয় যদি ওঁকে পেয়ে সুখী হয়, হোক। আমি বাদ সাধবো কেন?

শোন, তুই এখন বড় হয়েছিস. সব কথা তোর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করাই উচিত। যা বললি, তোর মধ্যে সেই রকম দৃঢ়তা থাকাই গৌরবের কথা। কিন্তু—তাই যদি হবে তাহলে সকল দিক থেকে তুই বা হাল ছেড়ে দিলি কেন?

সত্যি রাঙাদা, ঠাকুর ঘরে আমার আর মন বসছে না। তুমি আমাকে বলে দাও, আমি কি করব!

ঘ্যাখ, পুজো আহ্নিক আমি অবিশ্বাস করি তা বলছিনে, কিন্তু অতদিনের সংস্কার কি এক মুহূর্তে ত্যাগ করা যায়? রেবা তার বিবেকের নির্দেশেই কাজ করছে, ওকে আমি বাধা দেবো না। আমি বলছি, তুই যেমন লেখাপড়া করছিলি তাই কর। শুধু চোখের জল দিয়ে কারো চিত্ত জয় করা যায় না। বৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্যেকেরই আত্মনির্ভরশীল হওয়া উচিত। মাঝপথে কেউ এসে হাতে হাত রাখে উত্তম নয়তো একাই পথ চলতে পারবি।

মনকে যে কিছুতেই বাঁধতে পারছিনে রাঙাদা। অকারণেই অনেক কথা মনে পড়ে যায়।

সেটা স্বাভাবিক এবং তা স্বাভাবিক বলেই মনের সঙ্গে সংগ্রাম প্রয়োজন।

বেশ, কাল থেকে তাহলে তুমি আবার মাষ্টার মশায়দের আসতে বলে দাও, আমি প্রাণপণে সাধনা করবো।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ তোর অনিবার্য। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সবকিছুকে সহজ সরলভাবে মেনে নিতে না পারলে সুখ কোথায় বলদিকি? তোকে একটা কথা বলে রাখি, অজয়কে আমি ভাল করে জানিনে সুতরাং তার সম্বন্ধে কিছু বলবো না। কিন্তু তুই কিংবা রেবা কারো অনুকম্পার ওপর নির্ভর করে চলবি, এ আমি চাইনে।

আমি হয়তো একাকীই পথ চলতে পারবো রাঙাদা।

হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তাই চলবি, অকারণ কারো কাছে মাথা নত করতে যাসনে। ওতে নিজেরও ক্ষতি হবে তারও ক্ষতি হবে। আচ্ছা যা, পিসীমাকে ওষুধ দেগে, কাগজের ওপর পুনরায় দৃষ্টিক্ষেপ করে সুলাল।

২৫

অশোকের প্রত্যাগমনে সারা বাড়ীতে বইছে খুশীর হাওয়া। শুভানুধ্যায়ীরা একে একে এসে আন্তরিকতা জানিয়ে গেছেন। আসছে শনিবার প্রীতি সম্মেলন। কবির নবজীবন লাভকে দীর্ঘজীবন লাভের কামনা জানাবেন প্রিয়জনেরা। রেবার বিশ্রাম নেই। ঘরদোর গুছানো থেকে আরম্ভ করে অশোকের যত্ন-আত্তি সব একা করছে। অশোক হাসপাতালে ছিল, এতদিন সংসারের দিকে ফিরে তাকাবারও অবসর ছিল না। অশোক না থাকলে কিসের সংসার? রেবার পটু-হাতের ছোঁয়ায় আবার শ্রী ফিরে আসছে চারদিকে। হাসপাতালে থেকে কেমন যেন পরিবর্তন হয়েছে অশোকের। এক মুহূর্ত চোখের

আড়াল হতে দিতে চায় না। নিষ্ঠুর বিধাতা। উৎসব শেষেই তো বেজে উঠবে বিসর্জনের বাজনা। না না, অশোকের সঙ্গে আর কিছুতেই একসঙ্গে থাকা যায় না।……

কবি—ঔপন্যাসিক অশোক। মানুষের মনের গহনে ডুব দেবার চোখ ওর আছে। সহজে ছেড়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। চুম্বকের মতোই আঁকড়ে ধরে আছে এই দীর্ঘকাল। হ্যাঁ, ভালই তো বাসে অশোক ওকে। কিন্তু কি পেয়েছে বেচারা এই সুদীর্ঘ সময়ে! ভালবাসার হিসেব হয়তো অঙ্ক কষে হয় না। তাই হয়তো অশোক আজো মজে আছে। যদি সেদিন দেখা না হ'তো। বা দেখা যদি হ'লোই কোলকাতায় যদি না আসতো, তাহলে আজ আর ছেড়ে যাবার প্রশ্ন উঠতো না……রেবা নিঃসীম আকাশের দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আর কদিন, কদিন আর অশোকের সেবা যত্ন করতে পারবে ও? যার বিগ্রহ সে তার নিজের মন্দিরে ফিরিয়ে নিতে আসছে। মাঝখানে শুধু দিন কয়েকের ভার পড়েছিল ওর ওপর। সে তো শুধু স্বপ্ন, শুধু হৃদয়ের ব্যাকুলতা।…… অশোককে কি ছেড়ে যেতে পারবে ও? নিজহাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলা কি সম্ভব? না না, পারতেই হবে। অশোকতো আজন্ম অসীমাকেই ভালবেসে এসেছে। হয়তো কোন তুচ্ছ মান অভিমানে এই বিচ্যুতি! পরের ধন ও কেন কেড়ে নেবে? সুস্থ মস্তিষ্কে কেন খুন করবে একজনকে? না না, সে হতে পারে না। কে রেবা? সে মরে মরুক, তবু অসীমা বাঁচুক। সংসারে কি মূল্য আছে রেবার?…… ভাবতে ভাবতে উড়ে চলে রেবা। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়ায়। ওকি! অশোক ডাকছে না ওঘর থেকে? হ্যাঁ, অশোকই তো, হয়তো কিছু চাইছে, হয়তো একটা প্রেমের কবিতাই শোনাতে চায়, আঁচলে চোখ মুছে অশোকের ঘরের দিকেই রওনা হয় রেবা।

শনিবার—সন্ধ্যা সাতটা। দোতলার হলঘরে বসেছে সম্মেলন। নির্দিষ্ট জনকয়েককে আহ্বান জানিয়েছে রেবা, একান্ত কাছের জন যারা। এসেছেন অশোকের জনকয়েক সাহিত্যিক বন্ধু, শ্রদ্ধাভাজন শুভানুধ্যায়ীরা। অনুজ লেখক লেখিকারাও এসেছেন জনকয়েক। আর এসেছে রেবার বান্ধবীরা, যারা আজকের উৎসবে নাচবে গাইবে। হেনা বেলা থাকতে এসেই রেবাকে সাহায্য করছে। সুলাল নির্দিষ্ট সময়েই আসে। প্রত্যেককেই যত্ন সহকারে হলঘরে নিয়ে বসায় রেবা।

ছোট্ট হলঘর—'নিয়নের' স্নিগ্ধ আলোকে ঝলমল করছে। ভুর ভুর করছে রজনীগন্ধার মনোহারী গন্ধ। অতিথিদের জন্য জোড়ায় জোড়ায় বসবার টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা। এক কোণে তৈরী হয়েছে ছোট্ট একটি মঞ্চ। বিচিত্র ফুলের সমারোহে সজ্জিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ফুলের আদর মানব মনে। ফুল দিয়েই জানানো হয় প্রিয়জনকে সম্বর্ধনা। রাজসভা থেকে নগর সভা, সকলস্তরেই পুষ্পমাল্যে বরণ করে নেওয়া হয় কবি সাহিত্যিক সুধীকে। তাই ফুলের সমারোহই আজকের সম্মেলনের বৈশিষ্ট। অতিথিদের মধ্যেও কেউ দিচ্ছেন গোড়ের মালা, বেল কুঁড়ি, পদ্ম স্তবক। শুধু ফুল আর ফুল। কবি অশোক শুভ্র ফুলের মতোই সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে বসেছে এসে বন্ধুদের মাঝে। রেবার উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু অন্তর্লোক থেকে কে যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে চাইছে। ঐতো অশোক বসে আছে। মনে বইছে খুশীর হাওয়া। হয়তো আন্তরিকভাবেই ভালবাসে অশোক ওকে। হয়তো সামাজিক স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠা নেই। কিন্তু ওর হৃদয়তন্ত্রী যে ছিঁড়ে গেছে। এই হয়তো শেষ উৎসব। এর পরেই পড়বে যবনিকা—অনন্তকাল ব্যাপি অমাবস্যার অন্ধকার।

সামান্য চা পানের ব্যবস্থা। কিন্তু এই সামান্য আয়োজনও অসামান্য হয়ে ওঠে আন্তরিকতার যাদু স্পর্শে। কোন কোন টেবিলে চারজন,

কোন কোন টেবিলে ছুজন করে বসবার ব্যবস্থা। যারা যুগলে এসেছেন তারা আত্মকেন্দ্রিকভাবেই ছ'জনের উপযোগী টেবিলে মুখোমুখি বসেছেন অন্যেরা বন্ধু বান্ধব মিলে চারজনের টেবিলে। উদ্বোধন সঙ্গীতের শেষে অশোকেরই এক সাহিত্যিক বন্ধু কিছু বললেন। জোরালো ভাষায় সামান্য ছ'চার কথা। অশোকের নিরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করে। মাত্রা রেখেই বললেন। বাগাড়ম্বর অপেক্ষা রসনার রসাস্বাদনের দিকেই সকলের ঝোঁক। সঙ্গে কিছু নাচ গান।

চা পরিবেশিত হ'লো। চায়ের সঙ্গে 'টা'য়ের ব্যবস্থাও সুপ্রচুর। কেক, সন্দেশ, ফ্রাই, আইসক্রীম যার যত খুশি যা খুশি। ওয়েটার দাঁড়িয়েই আছে শুধু হুকুম করলেই হ'লো। ঘণ্টা খানেক চললো নাচ আর গান। রেবাও গাইলে। অশোকের লেখা গান কিন্তু বড়ো করুণ সুর। হাততালির অভাব হ'লো না। একটা শেষ না হতে আর একটা, আবার একটা। রেবার আপত্তি নেই। এই হয়তো অশোককে শেষ গান শোনানো। অন্তত এরকম পরিবেশ আর পাওয়া যাবে না। কাব্য আর সুর এসে যেন এক জায়গায় মিশেছে। থম থম করছে আসর। যেন একটি পরীক্ষার হলঘর। উৎসবের চাপল্য নেই। রেবা এরকম গান গাইলে কেন! এযে বর্ষার কেকা ধ্বনি! হৃদয়ের গহন স্তর মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু দোলা কই! অশোকের যে চাই বসন্তের দোলা। খুশী উপচে পড়বে আকাশে বাতাসে রেবার ঠোঁটে। ভাবতে পারে না অশোক। ভাবগম্ভীর হয়ে গেছে। সুলালও বিভ্রাটে পড়ে। সহসা এ ছন্দ পতন কেন? রেবা কি চায় না অশোককে?...গান থামলে উঠে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে সুলাল, রেবা দেবীকে এবার আমি অনুরোধ করবো নাচের জন্য। অতিথিদের সকলের চোখ মুখেই ঔৎসুক্য উপচে পড়ে। কিন্তু অশোকের মুখে বিস্ময়ের ছোপ। রেবা নাচতে পারে, একথা যে ওরও জানা নেই! নিশ্চয় আপত্তি জানাবে রেবা। সুলালের

খাপছাড়া প্রস্তাবে কিছুটা বিরক্তই হয় অশোক, কি দরকার মানুষকে এভাবে অপ্রস্তুত করার ?···কিন্তু রেবা এক কথায় রাজী হয়ে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের ছুটি নিয়ে বাইরে আসে। হয়তো নিজের ঘরেই যায় তৈরী হতে। মহা ফাঁপরে পড়ে অশোক, হলময় ওঠে মৃদু গুঞ্জরন। সুলাল ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পিয়ানোতে ঝঙ্কার তোলে টুং টাং টাং। ওকি ! সহসা বসন্তরাণী কি পথ ভুলে আবির্ভূতা হলেন ! কিংবা ইন্দ্রসভার কোন অপ্সরী ! ললিত লাস্যে অপূর্ব গমকে সারা হল ফেটে পড়ছে। হ্যাঁ, এই নাচই বোধ হয় নেচেছিলেন স্বয়ং রতিদেবী মহাকালের ঘুম ভাঙাতে। মন্ত্রমুগ্ধ দর্শককুল, অশোক হয়তো স্বপ্নই দেখছে। রেবা— রেবা—রেবা হয়তো ওর নাগালের বাইরে। হয়তো আদিম নারীই সে। সংখ্যাতীত যুগধরে পুরুষ মনের প্রবল বিস্ময়। ক্ষণ বসন্তে যার আবির্ভাব চোখের পলকেই তার বিলয়। মাত্র কয়েক মুহূর্ত ঝঙ্কার তুলে পুনঃ অন্তপুরে যায় রেবা। অতিথিকুল স্বপ্নভঙ্গের মতোই হাততালিতে মুখর হয়ে ওঠে। পর মুহূর্তে পটপরিবর্তন করে আবার ফিরে আসে রেবা। এ সেই রেবা—অশোকের চেনা। খানিক উচ্ছ্বাসের ঢেউ চলে সকলের মধ্যে। তারপর মামুলি শুভেচ্ছা আর প্রীতি জানিয়ে একে একে বিদায় নিতে থাকেন অভ্যাগতেরা। সুলালও সকলের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক বিদায় প্রার্থনা করে, কিন্তু রেবা বাধা দেয়। সকলে চলে গেলে অশোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় রেবা সুলালকে। বেচারা অশোক, সারা অন্তরখানা বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে আছে। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, এরই মধ্যে সে রেবার আনাচ কানাচ জেনে ফেলেছে ! যা অশোক আজ পর্যন্তও জানে না ! তবু নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা রক্ষা করতে ত্রুটি হয় না। মাঝে মাঝে আসতেও অনুরোধ জানায় সুলালকে। বড় ভাল লেগেছে তার বাজনা—এই সঙ্গ লাভ। সুলাল সহজ সরলভাবেই প্রতিদান দিয়ে উঠে পড়ে।

রাত প্রায় আনুমানিক দশটা। বসন্তের রাত—বালীগঞ্জ এলকার এ অঞ্চলটি এ সময়ে প্রায় নিস্তব্ধই থাকে। ধীরে বইছে মলয় সমীর। শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। বৈদ্যুতিক আলোও যেন ম্লান বোধ হয় এই জ্যোৎস্নাধারায়। ছোট বড়ো বৃক্ষ শোভায় পল্লীর সুষমা ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। অশোক একক এসে বসে গাড়ী বারান্দায়। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে সারাবাড়ী উৎসবে মেতেছিল। রেবা হেসেছে, ও নিজেও হেসেছে। তবু অকারণ কেন যেন মনটা উদাস হয়ে উঠেছে। সুলাল কি ওর অন্তর্লোকে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে গেল? রেবা যেন অনেকখানিই দিয়ে বসে আছে সুলালকে। হোক না, ক্ষতি কি? এমন তো কখনো কখনো হয়, মানুষ নানাভাবে একজন আর একজনকে ভালবাসে। রেবা যদি বন্ধুজন ভেবেই সুলালের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশে থাকে ক্ষতি কি? এ নিয়ে মন খারাপ করা বোকামীই হবে।…অশোক অহেতুক ভাবনাকে ছুঁড়ে ফেলতে আপন মনেই 'গিটারে' হাত চালায়। বড়ো মিষ্টি হাত—কিন্তু বড়ো করুণ। রেবা সকল কাজ সেরে কখন যে পাশে এসে বসেছে টেরও পায় না। রেবাও ধ্যান ভাঙে না। কি দরকার, এমনি করেই তো চুপচাপ ছেড়ে যেতে হবে। অলক্ষ্যে সেই সুরই তো বাজছে আজ অশোকের হাতে। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে রেবা অশোকের দিকে।

অনেকক্ষণ ধরে চলে সুরের মূর্ছনা। এক সময় থেমেও যায়। হাতের গিটার রাখতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে অশোক, শুতে গেলে না সু? সারাদিন খাটুনী গিয়েছে, রাত কিন্তু কম হয়নি?

তোমার বুঝি রাত হয়নি?

তা হয়েছে, কিন্তু এই জ্যোৎস্না ছেড়ে শুতে ইচ্ছে করছে না।

বেশতো, বাজাও না আর খানিক ক্ষণ?

তোমার ভাল লাগছে?

কবে খারাপ বলেছি ?

তাহ'লে কাছে এসে বসো।

রেবা মুচকি হেসে কোচের ওপর অশোকের পাশে গিয়ে বসে।

আবার চলে সুরের মূর্ছনা। ভাব যেন ভাষা পেলে।

ধীরে ধীরে অশোকের কোলের ওপর এলিয়ে পড়ে রেবার দেহলতা।

২৭

পরের দিন দুপুরের আহারের পর একাকী নিজের ঘরের মধ্যে ছটপট করতে থাকে অশোক। হাসপাতালে দীর্ঘকাল শুয়ে থেকে থেকে চোখে আর ঘুম নেই। রেবার যেন কি হয়েছে! দিনকয়েক বড় অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে ওকে। যেন এড়িয়ে এড়িয়েই চলতে চায়। সেই কখন কোন সকালে খাওয়া হয়ে গেছে, এখন প্রায় দুপুর গড়াতে চললো, একবারও দেখা নেই। ঘুমই যদি পেয়ে থাকে এঘরে এসেও তো শুতে পারে। দিনের বেলায় গল্প করতে করতে ইজিচেয়ারে খানিক গড়িয়ে নেওয়াই তো ভাল। না, আর দেরি নয়, এই ফাল্গুনেই রেজিষ্টারের কাছে যেতে হবে। রেবার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কালকেই এটর্নীকে দলিল করতে দেওয়া হবে। এভাবে কাছে থেকে দূরে থাকা অসহ্য।

রেবার চোখেও ঘুম নেই। ঘরের দরজা বন্ধ করে ভাবছিল নিজের জীবন-কথা। এক এক করে সংসারের সব কিছুই যেন হারাতে বসেছে ও। অশোককেও হারাতে হবে। সুলাল হয়তো স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে শুধু স্বপ্নই।

বড় আঘাত পাবে বেচারা। দূরে অপরিচিতের মধ্যে চলে যাওয়াই

ভাল। কারো অনুগ্রহের ওপর আর নয়। নার্সের কাজ, ধাত্রীর কাজ, এমন কি দরকার হলে ঝি'য়ের কাজ পর্যন্ত করতে হবে তবু আর কারো কৃপাপ্রার্থী হওয়া চলবে না। কেউ ওকে ভালবাসতে পারে না, বাসলেও ওর পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। না না, ও কারো সঙ্গে প্রতারণা করবে না। যতশীঘ্র সম্ভব অশোকের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাবে। হয়তো অশোক ওকে ভুলই বুঝবে, তা বুঝুক, উপায় নেই।·· নিবিড় ভাবে ভাবছিল রেবা, দোরে করাঘাত পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই উঠে গিয়ে দোর খুলে দেয়। অশোক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করে, তুমি শোওনি সু?

শুলে বুঝি কেউ আবার দাঁড়িয়ে থাকে? রেবার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

তবে এতক্ষণ একা একা করছিলে কি?

ভাবছিলেম।

ভাবছিলে! কি বলতো?

হেনা যে তাড়া দিয়ে গেছে—ওদের কাগজে একটা গল্প দিতে হবে।

অঃ, এই কথা! আমিতো ভাবছিলাম, তুমি বুঝি বিয়ের দিন ঠিক করছো। সু, মিছিমিছি দেরি করতে আমি রাজী নই। কালকেই এটর্নীর কাছে যেতে চাই, কি বলো?

দাঁড়াও দাঁড়াও গল্পটা তোমাকে দেখাচ্ছি, ঠিক করে দিতে হবে কিন্তু। শেষটায় যেন লোকের কাছে হাততালি না খাই।

একটা কেন, দশটা গল্প তুমি লিখবে সু। আমি তোমাকে সাহায্য করবো, দরকার হলে নিজে লিখে দেবো।

বারে, তা কেন হবে? তোমার লেখা কেন আমি নিজের নামে ছাপতে যাবো?

তুমি আমি কি ভিন্ন সু?

না মশাই, সাহিত্যে ও জুচ্চুরি চলে না। তোমার পাকা হাতের লেখা, লোকে পড়লেই বুঝতে পারবে। শেষটায় অযথা গালাগাল খাই আর কি। কাজ নেই, তুমি বরং আমারটাই একটু দেখে দাও, বলতে বলতে ড্রয়ার টেনে নিজের লেখা গল্পটা বার করে রেবা।

সে হবে'খন, তুমি আগে বলো, কালকে আমরা এটর্নীর কাছে যাচ্ছি কিনা ?

কালকের কথা কালকে হবে, এখন তুমি পড়ে দেখো ?

তাহলে তুমি নিজেই পড়ে শোনাও। তোমার মুখ থেকে শুনলে, ভাব আর ভাষার অসঙ্গতি সহজেই ধরতে পারবো।

বেশ, শোন তাহলে, রেবা পড়ে চলে :

ইভা চ্যাটার্জির বাপের বাড়ী বাঁকড়ো জেলার পল্লী অঞ্চলে। বিয়ে হয় ঢাকা জেলার নরেন ভট্টচার্যের সঙ্গে। ইভা রূপে গুণে ডানা কাটা পরী না হলেও আধুনিক রুচিতে চোখ-ঝলসানো তার তনুশ্রী। শ্বশুরালয়ে রাঙা বউ'এর বড় আদর।

দেবর শশাঙ্কমোহন কোলকাতায় থার্ড ইয়ারে আর্টস পড়ে। ছত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে সে যেমন কুস্তিখানায় খ্যাতি অর্জন করেছে তেমনি বৈপ্লবিক দলেরও অগ্রনায়ক। মহিলা 'আর্গানিজেসন' নিয়ে শশাঙ্কমোহন হাবুডুবু খাচ্ছিল। উপযুক্ত কর্মী খুঁজে বার করা এপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। রাঙা বউকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে শশাঙ্ক। উপর্যুপরি খানকতক উত্তেজক বই দিয়ে ইভাকে দলে টানে। নরেন সঙ্ঘের সক্রিয় সভ্য না হলেও পৃষ্ঠপোষক। ইভাকে বাধা দেয় না, অন্তরে অন্তরে বরং গর্বই অনুভব করে।

সেবার শশাঙ্ক গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। নরেন গিয়েছে কি একটা জরুরী কাজে দিন কয়েকের জন্য মফস্বল। ইভার সঙ্গে নিভৃত সলাপরামর্শের অপূর্ব সুযোগ। কোথায় কবে কোন সাহেবকে

রিভলবারের গুলিতে হত্যা করতে হবে, কোথায় ডাকলুট, অস্ত্রাগার লুট, ভূগর্ভে দুর্গনির্মাণ, সে এক মহা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার। শশাঙ্কের দেওয়া রিভলবারটা মুঠোর মধ্যে পেয়ে শক্তি সহস্রগুণ বেড়ে যায় ইভার। গত জন্মে ও বোধ হয় রাণী লক্ষী বাঈ ছিলেন। সেদিনের মতো এবার আর ভুল করবে না। এবার ইংরেজকে সাগর পাড়ি দিতেই হবে।

বিপ্লবীর পক্ষে ঘর-সংসার অবাঞ্ছিত। তাই মাস তিনেক আগে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাওয়ায় নিজকে মুক্তই মনে করে ইভা। শশাঙ্ক মোহনের মতো আগে যদি কেউ ওকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করতো তাহলে বিয়ে করে কিছুতেই নিজকে বিপন্ন করতো না ও। যা'হোক সন্তানের জননী হবার মতো সঙ্কীর্ণতা যে জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না, এ ওর দৃঢ় সঙ্কল্প।

বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকগণ দ্রব্যগুণকে অস্বীকার করা পাগলামো মনে করলেও ওদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মহৎ ব্রতের ব্রতী ওরা, ওদের আবার কিসের ভয়? কথাটা আর যাই হোক, ওদের ঐ প্রশস্ত মনকে কেন্দ্র করে যে রক্ত মাংসময় বিরাট একটা দেহ আছে, তার ক্ষুধা তৃষ্ণাকে ওরা আমলই দিতে চাইতো না। দীর্ঘ এই গ্রীষ্মাবকাশে শশাঙ্কের প্রতি ইভার এমন একটা আসক্তি এসে গেছে যে, যতক্ষণ না সংসারের নিয়মিত কাজ সেরে ওর সঙ্গে নিভৃত গবেষণায় নিমগ্ন হতে পারে, স্বস্তি পায় না। নরেন মফস্বল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে। লৌকিকতা রাখতে তার সঙ্গে এক ঘরে শুলেও পৃথক বিছানায়ই রাত কাটায় ইভা। সাধারণ মাটির মানুষ নরেন, ইভার রূপে মুগ্ধ। প্রথম দিন কয়েক মান অভিমান, তারপর অনুরোধ উপরোধ, তারপর মৃদু শাসন। কিন্তু ইভা নারাজ, কিছুতেই এক বিছানায় শোবে না। বাধ্য করাবার মতো দুঃসাহস নরেনের নেই। কেননা, সে জানে, ইভার ওপর জুলুমবাজিতে যে কোন মুহূর্তে একটা রিভলবারের গুলি ওর বুকের

পাঁজরা ভেদ করে যেতে পারে। চাপা দুঃখকে চেপেই অপেক্ষায় থাকে নরেন।

আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, একথা হয়তো ধ্রুব জেনেও শশাঙ্ক ইভার সঙ্গে ছিনিমিনি খেলেই চলে। ইভাকে নিভৃতে কাছে না পেলে এখন আর স্বস্তি পায় না সে। দিনদিন ছেলে মানুষিরও অন্ত নেই। হয়তো ইভার কোলের ওপর মাথা রেখেই খানিক ঘুমিয়ে নিলে। পাঞ্জা ধরতে ধরতে হয়তো চেপেই ধরে রইলো কিছুক্ষণ। ইভার প্রথম প্রথম বড়ো সঙ্কোচ হতো, লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো কিন্তু শশাঙ্ককে দেবতুল্য মনে করে কোন কিছুতেই বাধা দিতে পারতো না।

আষাঢ়ের বৃষ্টি পড়ছে নীল আকাশের আঁচল ছেয়ে ঝর্ণা ধারায়। দুপুরের আহার শেষ করে বাড়ীর কেউ আর জেগে নেই। চাকর বাকর থেকে আরম্ভ করে কর্তা গিন্নী পর্যন্ত সকলেই ঘুমের আমেজে মৌন। বাস্তব ঘুম যদি বা কারো না এসে থাকে তবু দোর জানালা বন্ধ করে নিভৃত কক্ষে প্রত্যেকেই আলস্য যাপনে রত।

নরেন সকলের আগে আহার শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে আসে। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ। ইভা যে কাছে আসবে না জানা কথা। তবু নির্বাসিত যক্ষের মতো বিরহী আত্মা মোচড় দিয়ে ওঠে নরেনের। অদম্য বাসনায় দোর খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসে ইভার মুখখানা দেখবার বাসনায়। যদি একটি বারের জন্যও সে কাছে আসে। স্বেচ্ছায় যদি না আসে জোর করেই আজ নিজের কাছে টেনে আনবে নরেন। ইভা যদি ছেলে মানুষি করে, ওর উচিত তার ভুল ভেঙে দেয়া। বাহ্যিক প্রায় উন্মত্ত নরেন···

বৃষ্টি পড়ছে আরো বেগে মুষলধারায়। বাইরের কোন শব্দ আবদ্ধ ঘর থেকে শোনা সম্ভব নয়। শশাঙ্কর ঘর ভেতর থেকে ভেজানো ছিল। নরেন সজোরে এসে ধাক্কা দিয়েই লজ্জায় মাথা হেঁট করে ঘুরে দাঁড়ায়।

এক মুঠো লঙ্কার ঝাল ছিটিয়ে দিলে যেন কেউ ওর চোখে। কে ওখানে ওরা, আদম আর ইভ কি?···সটান নিজের ঘরে ফিরে এসে দোর বন্ধ করে দেয় নরেন। অসংখ্য ঢাক ঢোল বাজতে থাকে কানের কাছে। বুকের মধ্যে সহস্র ছুঁচ ফুটছে যেন। লজ্জায় দেয়ালের দিকে পর্যন্ত চাইতে পারে না, বিদ্রূপ আর লাঞ্ছনা।

ইভা শশাঙ্করও লজ্জা রাখবার জায়গা থাকে না। নরেনের চোখের ওপর আজ যে দৃশ্য ঘটে গেলো তার গ্লানি কোন বৈপ্লবিক ব্যাখ্যায়ই অপনোদিত হবার নয়। ইভার মুখ ভয়ে চুন, সারা বাড়ী পালিয়ে পালিয়ে চলে শশাঙ্ক।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে চলে। ইভা আর শুতে আসে না। বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। শশাঙ্ক বোধ হয় বাড়ী নেই। নরেনের মাথায় খুন চাপে। কিন্তু সেটা অন্য কাউকে লক্ষ্য করে নয়, নিজের ওপরেই। সারা রাত ঘুমুতে পারে না। দোয়াত কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসে, ছোট্ট চিঠি :

ইভা, আজ থেকে তুমি মুক্ত। কেউ আর তোমাকে বাধা দেবে না, সুখী হ'য়ো। ইতি—

শ্রীন

আর একখানি পত্র পুলিসের নামে, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাউকে যেন বিরক্ত করা না হয়। ইতি— শ্রীনরেন ভট্টাচার্য

আষাঢ়ের গভীর রাত। আকাশে একটিও তারা নেই। দীপ নিভে গেলো দমকা হাওয়ায়। সিঁড়িতে বসে গোঙানি শুনেছিল ইভা। কালপেঁচার অলক্ষুণে ডাকে ভয়ও করেছিল ওর, কিন্তু মাথা তুলতে পারেনি। নরেন ছিল বুদ্ধিমান। ইভার চিঠিটা ইভার ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দেয়, শুধু পুলিসের চিঠিটাই থাকে টেবিলের ওপর।

পরদিন সকালে নরেনের কোন সাড়া শব্দ নেই। বেলা যতই বাড়ে বাড়ীর লোক ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ইভাকে সেদিন ঘরে শুতে দেয়নি শুনে আশঙ্কা আরো বেড়ে যায়। অগত্যা দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে দেখে, নরেন উদ্বন্ধনে ঝুলছে।

বাড়ীময় কান্নার রোল ওঠে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। কেউ কোন কারণ খুঁজে পায় না। ইভাও বুক ভাসিয়ে কাঁদে। ওর সঙ্গে সুর মিলিয়ে শশাঙ্কও মায়াকান্নায় স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। শ্রাদ্ধ শান্তি যথারীতি হয়ে যায়। শশাঙ্ক ছাড়া বউ'এর প্রতি সকলেরই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। কানাঘুষায় চারদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছড়াতে থাকে। ইভার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। মুখবুজেই একদিন চলে আসে বাপের বাড়ী। সেখানে অগ্রজ দীনেশবাবু আবার শশাঙ্কমোহনেরই মন্ত্র শিষ্য। সুতরাং বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে অব্যাহতি পাবার আর ফুরসৎ হয় না ইভার। শশাঙ্কর আক্রমণ পুরোপুরি চলতে থাকে। সময় সময় ভারাক্রান্ত মনে হলেও নিঃসঙ্গ জীবনে ইভার এ-আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত মন্দ লাগে না। একে একে নরেনের সকল স্মৃতিই ভুলতে থাকে। বাঁচতে হলে ভুলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তরও নেই। জীবনে কি একটা অঘটন ঘটে গেলো। সংসারের পাকে জড়িয়ে পড়বে না—এই ছিল সঙ্কল্প। স্বদেশ সেবার সঙ্কল্পই এ সঙ্কল্পে পৌঁছে দিয়েছিল ওকে। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেলো। শশাঙ্ক তো সত্যি বলিষ্ঠ পুরুষ, তবু তার এ ভুল হ'লো কেন? কেন ওকে রুখতে পারলে না ইভা?…বাপের বাড়ীও স্বস্তি নেই ইভার। চতুর্দিকে কেবল নিন্দা আর কুৎসা। নরেনই ওকে ডাকছে কি? ঐ ফাঁসীর রজ্জু? না না, আত্মহত্যা ও করবে না। জীবনের শেষ দেখবে। মানুষ ঘৃণা করে করুক,—দেশমাতৃকা ওর পুজো নেবেনই। সংসারে আগুন জেলেই তো এই শ্মশানে এসে পৌঁছেছে। দাদার কাছে প্রস্তাব করে, কোলকাতায় গিয়ে আবার কলেজে ভর্তি হবে।

সরল চিত্ত দীনেশ বাবু মায়াবী মানুষ। বোনের দুঃখ বোঝেন, ইভার প্রস্তাবে খুশী হয়েই রাজী হন।

হোস্টেলে থাকে রেবা। দেখাশুনোর ভার শশাঙ্কর ওপর। আস্তে আস্তে কেমন করে যেন পায়ের নীচের মাটি সরে চলে। বৈপ্লবিক ক্রিয়া কলাপ রাজনৈতিক কারণেই ভিন্নমুখী। শশাঙ্কর সঙ্গে ইভার বর্তমান সম্পর্ক সাধারণ একটি নরনারীর সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। কলেজে পড়ে জীবনের অনেক উচ্ছ্বাস মন্থর হয়ে চলে। জীবনের সব কিছুকেই বাস্তবের নিরিখে দেখে ইভা। শশাঙ্ক যদি ওকে সত্যি ভালবাসে, পাবে। স্বাভাবিক ভাবেই পাবে। যা ছিল এতদিন ঢাক ঢাক গুড়গুড় তা আজ প্রকাশ্য স্বীকৃত লাভে দোষ কি?··· আজ মাসীমার বাসায়, পরশু দাদার বাসায় প্রভৃতি অকাট্য অজুহাতে মাঝে মাঝেই হোস্টেলে অনুপস্থিত থাকে ইভা। শশাঙ্কর প্রাণ প্রাচুর্য উপচে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়েই ইভাকে নিয়ে পাকা ঘর বাঁধবে ও। সিভিল ম্যারেজ আটকাবে না। আত্মীয় স্বজন কাছে না আসে ক্ষতি নেই, ওরা পরস্পর ঘর বাঁধবেই। সাবালক অবস্থায় এ অধিকার ওদের আছে। আইনই ওদের দিয়েছে এ অধিকার। আইন কেন রামায়ণ মহাভারতেও যথেষ্ট নজির আছে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভাতৃবধূর দেবরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে···এতএব কোনরূপ সঙ্কোচ এখন আর বাধা মানে না।

আনুষ্ঠানিক বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা ছিল খুবই, তবু পা ফসকে যায়। ইভা অন্তঃসত্ত্বা। শশাঙ্ক বলে, এ যাত্রা নষ্ট করে ফেলাই ভাল। কিন্তু ইভা রাজী হয় না। ভাবী সন্তানের প্রতি আসে গভীর মমতা। তাছাড়া নষ্ট করবে কেন? যে আসছে সে তো বৈধভাবেই আসছে। সে তো শশাঙ্করই দান, পরস্পরের ভালবাসার নিদর্শন! বিয়েটা চুকিয়ে নিলে লোক নিন্দার কি আছে? শশাঙ্ক বলে, এযাত্রা থাক,

এখনো ল'টা পাশ করা হয়নি। বাড়ী থেকে টাকা না এলে খাবে কি, সন্তানকেই বা খাওয়াবে কি?

শুনে ইভার বিরক্তি বোধ হয়, এই পুরুষ, এই শোনায় ভালবাসার কথা!··· মনান্তর মতান্তরে পরিণত হয়। ইভা নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিরুদ্দেশ হয়···

তোমার গল্প বড্ডো বড় হয়ে যাচ্ছে স্থ। তাছাড়া এটা গল্প হয়নি। জোরালো কাহিনী বলা যেতে পারে, বাধা দেয় অশোক।

রেবা চোখ বিস্ফারিত করেই প্রশ্ন করে, হেনা কি ওর কাগজে এটা ছাপতে রাজী হবে না?

না হওয়াই স্বাভাবিক।

কারণ?

কারণ, যে বিপ্লবীদের নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি তুমি তাঁদেরই একজনের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছ।

রামায়ণে কিন্তু রাম আর রাবণ দুটি চরিত্রই আছে!

তা হলে তোমার কাহিনীর মধ্যে একটি রাম চরিত্রের প্রয়োজন।

আমার কাহিনীতে রাম চরিত্র অলক্ষ্যে আছে। বিপ্লবীদের চরিত্র যদি মহানই না হবে তাহলে ইভার মতো মেয়ে আকৃষ্ট হবে কেন?

কিন্তু শশাঙ্কর চরিত্রের তুমি বাহ্যিক যে বর্ণনা দিয়েছ তাতে তাকে শয়তান বলা যায় না।

হয়তো হবে, শশাঙ্কর ভুল হয়েছিল। তবু আমার এ কাহিনীর মূল্য এইখানেই আমি বলবো, ভাবিকালের বিপ্লবীরা সতর্ক হতে পারবে।

তাহলে তোমার কাহিনী ভাল হয়েছে। বলবার ভঙ্গীটি তুমি অপূর্ব আয়ত্ব করেছ তো স্থ? ভবিষ্যতে তুমি বেশ ভাল উপন্যাস লিখতে পারবে।

ঐ তো তোমাদের নামকরা সাহিত্যিকদের দোষ, কিছুতেই তোমরা

একজন নবীনকে স্বীকৃতি দিতে চাও না, ভবিষ্যতের স্তোকবাক্য দিয়ে পিঠ চাপড়াতে চাও।

বললুম তো তোমার কাহিনী ভাল হয়েছে।

তা হলে মাস্টার মশায়কে ধন্যবাদ।

শুধু ধন্যবাদে চলবে না, আমার আর্জিটা তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কালকেই কিন্তু আমরা এটর্নীর কাছে যাচ্ছি ?

কালকেই ?

নয় কেন স্থ ? হাত চেপে ধরে অশোক।

আঃ ছাড় ; ওরা কেউ এসে পড়বে ?

আসে আসুক, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।

কি মুশকিল, সে না হয় হবে, এখন ছাড়ো, গা হাত ধোবার সময় হ'লো। ঠাকুর এক্ষুনি চা নিয়ে আসবে!

বেশ, এবার তাহলে যাও। কিন্তু কলঘরে বেশী দেরি করো না যেন, আজ একটু লেকের দিকে যাবো।

তুমিও তৈরী হয়ে নাও তাহলে, সহাস্যেই অশোককে তাড়া দিয়ে উঠে যায় রেবা।

২৮

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে খেতে আবার কথা পাড়ে অশোক, তাহলে স্থ, এটর্নী সাহেবকে ফোন করে দিচ্ছি—বিকেলে আমরা দুজনে গিয়ে দলিলটা নিয়ে আসবো। সেই সঙ্গে লাইট হাউসে ম্যাকবেথ এসেছে সেটাও দেখা হবে।

বুড়ো বয়সে তুমি দেখছি ক্ষেপে গেলে, হাসতে থাকে রেবা।

গালাগাল দেবে না বলছি, বুড়ো কোথায় দেখলে বলতো ? হেসে হেসেই প্রতিবাদ করে অশোক।

বেশ মশায় আমার ঘাট হয়েছে—আপনি নওজোয়ান। কিন্তু বিকেলে তো আমার সময় হবে না, স্থলালবাবু আসবেন।

স্থলাল স্থলাল স্থলাল; এই জীবটি দেখছি তোমার জপের মালা হয়েছে রেবা।

উঁহু, অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে ওরকমভাবে একজন ভদ্রলোককে হেনস্তা করা উচিত নয় তোমার! জীব শব্দটির ব্যবহার কেবলমাত্র ইতর অর্থে কবি, রেবা পুনরায় হাসতে থাকে।

খুব লাগলো যে, অশোকের কণ্ঠে ঝাঁজালো স্থর।

লাগালাগির কথা নয়, তুমি সাহিত্যিক, তোমার কাছে সকলেই সঙ্গত আচরণ আশা করে।

বেশ আমার ঘাট হয়েছে, এই আমি কানমলা খাচ্ছি। তিনি বাবু, মহাশয়—সদাশয়, হ'লো তো?

তুমি দেখছি সকালবেলাই চটে গেলে। ভদ্রলোক বড়মুখ ক'রে নেমন্তন্ন করেছেন। হয়তো গাড়ী নিয়ে নিজেই আসবেন, না যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে?

কই, আমাকে তো সেকথা আগে বলোনি?

তুমি এ নিয়ে আপত্তি করবে আমি ভাবতেই পারিনি।

তা পারবে কেন, আমি—কে?

লক্ষীটি রাগ করো না, বেশ আমি ওঁকে ফোন করে বারণ করে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, তা না করলে আর আমাকে হাস্যাস্পদ করবে কি করে?

তবে আমি কি করবো বলো?

তোমাকে কিছু করতে হবে না, দয়া করে ওঁর গাড়ীতে চড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসো তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো।

ওরকম রাগ দেখালে আমি কোথাও না গিয়ে বাড়ীতেই চুপচাপ শুয়ে থাকবো।

শুতে পার কিন্তু ঘুম হবে না ; অনর্থক রক্তের চাপ বাড়বে।

হ্যাঁ, তুমিতো তাই চাও, রক্তের চাপ বেড়ে যাতে আমি মরি!

স্থু, এতবড়ো কথা তুমি আমাকে বললে! আমি তোমার মরণ কামনা করি?

নয়তো তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি ক্ষেপে যাচ্ছ কেন?

কেন আমি ক্ষেপে যাচ্ছি তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? আমি চাইনে তোমার আমার মধ্যে অন্য কেউ এসে মাথা গলায়।

তাহলে আমাকে ট্যাঁকে করে রাখো।

ট্যাঁকে কেন, হৃদয়ের মণি কোঠায় তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারলে আমি খুশী হই।

বাব্‌বা, অনেক কাজ রয়েছে আমার, সকালবেলায় কাব্যি করবার ফুরসৎ নেই। আমি উঠি, হাসতে হাসতেই রেবা উঠে দাঁড়ায়।

কাব্য নয় স্থু, হৃদয় চিরে যদি দেখাবার হতো তাহলে দেখাতেম কোথায় তোমার স্থান।

রেবার বোধ হয় ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে, তবু কৃত্রিমতা রেখেই জবাব দেয়, এ যে সেই পত্র দলিলের ভাষা হ'লো কবি। লক্ষীটি, আর দেরি করিয়ে দিয়ো না, এখনো বাজারের টাকা দেওয়া হয়নি।

বেশ যাও, দীর্ঘশ্বাসে ফেটে পড়ে অশোক।

রেবা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় সান্ত্বনা দেয়, সত্যি আমি দুঃখিত অশোক। তোমার সঙ্গে আজ যেতে পারছিনে। বলো তুমি রাগ করবে না?

রাগ আমি করিনি স্থু, আমার ভয় হয়, হয়তো রাহুর দৃষ্টি পড়েছে তোমার ওপর।

ছি, এ তোমার অহেতুক আশঙ্কা। আর যা-ই হোক, স্থলালবাবুকে তুমি অভদ্র বলতে পার না।

তাও কি কখনো হয়! উচ্চ শিক্ষিত—ভাল প্র্যাকটিস—গাড়ী বাড়ী আছে!

অশোক—

তুমি কাজে যাও রেবা।

রেবা মুখ ভার করে গাড়ী বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসে। অশোক অন্য মনস্কভাবেই জোরে জোরে সিগারেট টানতে থাকে।

আজ অনেকদিন পর রেবা খুব পরিপাটি করে সেজেছে। শাড়ী, ব্লাউজ, গহনায় আভিজাত্যের ছাপ। অশোক গেলো পুজোয় কিনে দিয়েছে এই নেভী রংএর জর্জেট আর হীরের ইয়ারিং জোড়া। বিকেল পাঁচটার মধ্যেই প্রসাধন শেষ হয়েছে রেবার। আয়নায় নিজের রূপ দেখে নিজেই চমকে ওঠে। এখনো যেন জোয়ার বইছে। স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে অশোক হয়তো খুশিতে উপচে পড়তো। কিন্তু খুশী হওয়াতো দূরের কথা হয়তো অন্তর্দাহ উপস্থিত হবে বেচারার। হয়তো কেন, নিশ্চয় অশোক আজ মাথা কুটে মরবে, ফুলে ঢোল হবে। হবারই কথা, প্রিয়তমকে এরকম ঘটা করে সেজে অন্যের সঙ্গে পাশাপাশি গাড়ীতে যেতে দেখলে কার না রাগ হয়। মানুষ নিজকে যতো নিঃস্বার্থপর ভাবুক, প্রেমের ব্যাপারে কখনো দ্বৈরথ সহ্য করতে পারে না। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে কোনো ভেদ নেই প্রেমের ব্যাপারে। অশোকের বুকে আজ দাউ দাউ করেই আগুন জ্বলবে। তা জ্বলুক, যতো শীগগীর সকল স্মৃতি পুড়ে ছাই হয়ে যায় ততোই মঙ্গল। অশোক বলছিল, হৃদয় মানসে ও আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছে; কিন্তু ওতো জানে না, ওর মানসী নিজ হাতেই সে স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে ফেলতে চায়। হ্যাঁ, আর মায়া নয়। প্রথম সুযোগেই আগুন ধরিয়ে দিতে হবে অশোকের মনে। রেবা ড্রেসিং টেবিলের বড়ো আয়নাটার দিকে চেয়ে

পুনরায় এক পোঁচ লিপষ্টিক বুলিয়ে নেয় ঠোঁটে। কামরাঙা ঠোঁট অধিকতর কমণীয় হয়ে ওঠে। হাসতে হাসতে এসে প্রবেশ করে অশোকের ঘরে।

ইজিচেয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবেই মাসিক পত্রিকার ওপর চোখ বুলোচ্ছিল অশোক। রেবা ঘরে ঢুকেই বিস্ময় প্রকাশ করে, একি, এখনো হাত মুখ ধুতে যাওনি যে! এটর্নীর ওখানে যাবে না?

ইন্দ্রপাতের মতোই চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে অশোকের। এক ঝলক চোখ না পড়তেই মুখের ওপর পত্রিকাটা রেখে ভারী গলায় জবাব দেয়, আজ আর আমি কোথাও যাবো না, এটর্নী সাহেবকে ফোন করে দিয়েছি দলিলটা হলেই পাঠিয়ে দেবেন।

রেবার হাসি পায়, দুঃখও কম হয় না। তবু চাঞ্চল্য রেখেই পুনরায় প্রশ্ন করে, বেশ, কোথাও না যাও হাত মুখ ধোবে তো? ঠাকুরকে আমি চা আনতে বলেছি, ওঠো?

তুমি খেয়ে নাও, আমি পরে খাবো।

না, তা হবে না, এক সঙ্গেই দু'জনে খাবো, তুমি ওঠো।

এক সঙ্গে বসে খাবার লোক আসছে, আমার এখনো খিদে পায়নি।

ছি, তোমার কি হয়েছে বলতো, সেই সকাল থেকে কেবলি গজরাচ্ছ?

আমাকে বিরক্ত করো না রেবা, নিজের ঘরে যাও।

ঘরে যাওয়া আর হয় না রেবার, সদরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। চেনা আওয়াজ, এ হর্ণ সুলালের মোটর থেকেই বাজছে। রেবা সুর চড়িয়েই প্রত্যুত্তর করে, বেশ ঠাকুর এলে বলো আমিও খাবো না, গড় গড় করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায় রেবা।

অশোক কি করবে ভেবে পায় না। রেবাকে পেছন ডাকতেও কুণ্ঠা হয়। একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলেন তাঁকে উপরে না আসতে

বলাই বা কেমন দেখায়। সংশয়ভরা চিত্তে উঠে গিয়ে গাড়ী বারান্দায় দাঁড়ায়। সম্ভব হলে ডেকে পাঠাবে ওদের। কিন্তু রেবা ফিরেও তাকায় না। ঝাঁ করে স্থলালের পাশে গিয়ে বসে। গাড়ীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। স্থলাল নিজেই ড্রাইভ করছে। খুব খুশীই দেখাচ্ছে ওকে। অশোক চোখ মেলে চাইতে পারে না। গাড়ী মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ল্যান্সডাউন রোড ধরে সোজা এসে রাসবিহারী রোডে পড়ে গাড়ী। মোড় ঘুরে রসা রোড। প্রথমটা ক্ষিপ্র গতিতেই চলেছিল, এখন গতি মন্থর হয়ে এসেছে। কোথায় যাবে জানে না স্থলাল। পাশে রেবা স্থানুর মতো বসে আছে। অশোকের বুকে হয়তো আগুন জ্বলছে কিন্তু সে আগুনের হল্কায় রেবাকেও কম জ্বলতে হচ্ছে না। এইতো ভাঙন শুরু হ'লো। যতটা সহজে পার পাবে ভেবেছিল রেবা ঠিক ততটা সহজে পার পায় না। বেচারা অশোক, সবে মাত্র অসুখ থেকে উঠেছে। বুকে কত আশা, কি দরকার ছিল এভাবে প্রচণ্ড আঘাত হানবার! অসীমা সুখী হবে, কিন্তু ওর যে বুক পুড়ে যাচ্ছে। যদি অশোককে নিয়ে কোলকাতায় না আসতো, যদি পাহাড়ের দেশেই আজীবন কাটিয়ে দিতো…

সহজ সরলভাবেই অভিনয় করবার কথা ছিল। কিন্তু রেবা তা পারছে না। স্থলালের মনের খাদেও যেন নূতন একটি নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে। তবু গম্ভীরভাবেই অনুরোধ করে স্থলাল, চলো ফিরে যাই।

রেবা অন্য মনস্কভাবেই ঠোঁটে হাসি টেনে জবাব দেয়, আমাকে কি খুব দুর্বল মনে হচ্ছে স্থলালদা? আমাদের সঙ্কল্প সামনে এগিয়ে যাওয়া, পেছন তাকানো নয়।

কিন্তু তোমার যে বড্ডো কষ্ট হচ্ছে।

বিন্দুমাত্র না, রেবার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

সুলালের বুকের ভেতরের নির্ঝরিণী বোধ হয় কল্লোলিত হয়ে ওঠে। ঢোক গিলে নিয়ে প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে তাহলে? চলো আমাদের বাড়ী যাই।

না, আজ নয়, একটু ফাঁকায় চলুন।

ফাঁকায়,—তার চেয়ে চলোনা লাইট হাউসে 'ম্যাকবেথ' দেখিগে?

বেশ চলুন। সম্মতি জানিয়ে রেবা অধিকতর মুষড়ে পড়ে। অশোক পাশাপাশি বসে ম্যাকবেথ দেখবার কথাই বলেছিল, কিন্তু ও রাজী হতে পারেনি। আর এখন সেই ছবি দেখতেই চলেছে। অশোকের জায়গায় পাশে বসবে সুলাল, কিসে আর কিসে? তা হোক, আজকের দিনে উপযুক্ত ছবিই দেখা হবে। কে জানে, কোথায় এর পরিণতি! ম্যাকবেথের প্রেত যদি অশোকের ঘাড়ে চাপে?···

হল অন্ধকার। টুকরো খবরের পর আসল ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে, একটু দেরিতেই এসেছে ওরা। উঁচু দরের খান কয়েক সীট বাদে "হাউস ফুল"। তারই দুখানা টিকেট কিনে ঢুকে পড়ে দু'জনে। টর্চের আলো জেলে গাইড বসিয়ে দেয় সীটে। দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়ে রেবা। মাঝখানে পড়ে ইণ্টারভেল। আলো জ্বলে ওঠে আবার। দর্শকরা এদিক ওদিক উঠে যায় কেউ কেউ। রেবা সুলালের সঙ্গে হলে বসেই অপেক্ষা করে, ম্যাকবেথ নিয়ে হয় আলোচনা। ছবি নয়, সেক্সপিয়ারের চরিত্রগুলো যেন জীবন্ত ভেসে চলেছে রুপোলী পর্দায়। ফটোগ্রাফী, মিউজিক, সাউণ্ড—কোন কিছুতে খুঁৎ নেই। অসম্ভব ভাল লাগে রেবার। আজকের দিনে সুলাল বেছে বেছে ঠিক ছবিই বার করেছে। লেডী ম্যাকবেথের মতো অশোকের হাতে যদি ওরও মৃত্যু হয়! না না, অশোক কখনো খুনী হতে পারবে না, কিছুতেই না। আবার ভাবে, নয় কেন? প্রেম মানুষকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে। দস্যু, তস্কর, ঘাতক সব হতে পারে মানুষ ব্যর্থ প্রেমের তাড়নায়।

প্রথম ওয়ার্নিং পড়ে। মৃদু রেকর্ড বাজনার সঙ্গে চলেছে বিজ্ঞাপন দেখানো। দর্শকরা আবার ফিরে আসছে সীটে। সহসা পাশ ফিরে চাইতেই কে যেন এক মুঠো লঙ্কার ঝাল ছিটিয়ে দেয় রেবার চোখে। কে ও 'ব্যালকনিতে' বসে। অশোক না ? হ্যাঁ অশোকই তো! চোখ দুটো অমন ঠিকরে পড়ছে কেন ? খুন করবে নাকি অশোক! ওর যদি মন না চায় ওর সঙ্গে বসে দেখতে ? কেনা বাঁদী নয় ও কারো। না না, অশোক কেন খুনী হতে যাবে। ঐ তো বেচারার মুখখানা অভিমানে লাল হয়ে উঠেছে। আর একবার চোখ খুলে চাইতেই হল অন্ধকার হয়ে যায়। রুপোলী পর্দায় আবার শুরু হয় ছায়া ছবির নর্তন। রেবা সহ্য করতে পারে না। কে যেন গলা টিপে ধরে ওর। এক্ষুনি বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে কেউ। ঝাঁ করে সীট ছেড়ে উঠে পড়ে। সুলালকে কোন প্রকার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে আসে হল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সুলালও বেরিয়ে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, কি হ'লো, উঠে এলে যে ?

আমার বড্ডো মাথা ধরেছে, মাঠের দিকে চলুন।

একটা এ্যাসপেরিন্ খেয়ে নাও না, এখনো ইণ্টারেষ্টিং অনেক কিছু রয়েছে।

না না, আমি আর ছবি দেখবো না, আপনি একটু ফাঁকায় চলুন।

বেশ চলো, আবার এসে গাড়ীতে বসে দু'জনে।

গড়ের মাঠে এসে কয়েক পাক ঘুরতে থাকে। রেবা চোখ বুজেই সীটে হেলান দিয়ে আছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ ওকে, কিন্তু বড় করুণ। সুলালের মায়া হয়। গাড়ীর গতি কমিয়ে শান্ত ভাবেই শুধোয়, মিছে আর রাত করে লাভ কি, চলো তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিই ?

রেবা মনে মনে ভাবে, বাড়ীতে কে আছে ওর। কি দরকার বাড়ী পৌঁছে ? অশোক যদি তাড়িয়েই দেয় ? বেশতো দিক না, সেতো

ভালই হয়। সব সমস্যা সহজেই মিটে যায়। চোখ বুজে বুজেই উত্তর করে রেবা, বেশ চলুন। গাড়ী আবার রসা রোড দিয়ে ফিরে চলে। রেবা ভেবে ঠিক করে নেয়, সোজা গিয়ে নিজের ঘরে খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। ঠাকুরকে বলবে, শরীর ভাল নেই, আজ আর কিছু খাবে না। অশোক নিশ্চয় এর মধ্যে ফেরেনি, ভালই হয় আজ ওর সঙ্গে দেখা না হলে। উঃ, কি লজ্জা! আগে জানলে কিছুতেই একদিনে এতোটা বাড়াবাড়ি করতে পারতো না। না, এর চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ছিল ঢের ভাল। পুরুষ মানুষের ভুলতে ক'দিন লাগতো? বিশেষ করে হেনা যদি অসীমাকে নিয়ে হাজির হতো। আর ভাবতে পারে না রেবা। মাথাটা টন টন করতে থাকে। কাল যা হয় হবে। এখন অশোক ফিরবার আগে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। স্থলালকে তাড়া দিয়ে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে নেয়।

২৯

রাত প্রায় ন'টা। গাড়ী এসে সদরে লাগে। স্থলাল নীরবেই দরজা খুলে দেয়। অন্তর পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে রেবার। তবু সহজ-ভাবেই গাড়ী থেকে নেমে ওপর পানে চেয়ে দেখে। না, অশোকের ঘরে আলো জ্বলছে না। নিশ্চয় এখনো ফেরেনি অশোক। স্থলালের নিকট হতে যথারীতি বিদায় নিয়ে ওপরে উঠে আসে।

সিঁড়ির পাশে বসে ঝিমোচ্ছে লক্ষীর মা। অনাদি আর ঠাকুর মিলে জটলা করছে রান্না ঘরে। রেবার জুতোর শব্দে সকলেই হকচকিয়ে ওঠে। লক্ষীর মা কলিং বেলের শব্দ শুনে দোর খুলে দিয়ে এক পাশে দাঁড়ায়।

শরীরটা ভাল নেই, রাতে আমি আর কিছু খাবো না। বাবু এলে খেতে দিয়ো। আমাকে আর ডাকাডাকি করো না, আমি শুতে

চললেম। একদমে কথাগুলো বলে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায় রেবা।

ঝি চাকরের মন মনিবের অমঙ্গলে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। লক্ষীর মা উৎকণ্ঠা জানায়, কি হ'লো মা, জ্বর হয়েছে ?

না না, কিছু হয়নি, এমনিই ভাল লাগছে না। বাবুর খাওয়া হলে তোমরা খেয়ে নিয়ো। আর কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে রেবা নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়।

ফ্লাট বাড়ীর রান্না ঘর, অনাদি আর ঠাকুরের কানেও রেবার কণ্ঠস্বর পৌঁছোয়। ওরাও উভয়ে কাছে এসে দাঁড়ায় সঠিক জানবার জন্যে। কিন্তু রেবা কাকেও কোন সুযোগ দেয় না। সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বিস্ময়ে। দীর্ঘদিনের চাকরি জীবনে এই প্রথম দেখছে, রেবা সামান্য অসুস্থতার অজুহাতে অশোকের খাওয়ার কাছে থাকছে না। স্বাভাবিক অবস্থায় দু'জনে এক টেবিলে বসেই খায়। কারো একআধটু শরীর খারাপ হলেও খাবার টেবিলে কেউ অনুপস্থিত থাকে না। নিজে কিছু না খেলেও অন্যকে সঙ্গসুখ দিয়ে খেতে সাহায্য করে। বিশেষ করে রেবা তো এরকম সামান্য শরীর খারাপকে কোনদিন গ্রাহ্যই করে না। লক্ষীর মা বয়সে বড়ো। ঘটে বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলেও সাংসারিক অভিজ্ঞতায় ঝুনো। ঠিক বুঝে নেয়, রেবার অসুখ শরীরে নয়, মনে। আজ সকাল থেকেই দু'জনকে কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে দেখেছে। বেড়াতে বেরিয়েছেও উভয়ে আলাদা। কিন্তু রেবার যে রকম রাশভারি মেজাজ, ঘরের দোর ঠেলতে কেউ সাহস করে না। বাবু ফিরুন, তারপরেই যা হয় হবে।

দশটার কাছাকাছি অশোক বাড়ী ফেরে। কি ছবি দেখেছে, কোথা দিয়ে বাড়ী ফিরলো. কিছুই যেন খেয়াল হয় না। বিশ্বাসঘাতিনী রেবা ! চোখা-চোখি হতে হল থেকে পর্যন্ত পালিয়ে এলো ! মনে যদি কোন

ক্লেদই না থাকবে তা হলে সংশয়ের কি ছিল? দিব্যি তো শেষ পর্যন্ত দেখতে পারতো এমন কি হলের মধ্যে এসেও কথাবার্তা বলে যেতে পারতো।···ভাবতে ভাবতেই কলিং বেল টেপে অশোক। ঠাকুর, অনাদি, লক্ষীর মা বারান্দায় বসেই ফিস্‌ফিস্ করছিল। কলিং বেল বাজতেই অনাদি উঠে এসে দরজা খুলে দেয়। বড়ো গম্ভীর দেখায় অশোককে। মুখ বুজেই নিজের ঘরের দিকে এগুতে থাকে। রেবার ঘর অন্ধকার। একবার ভাবে, লক্ষীর মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, বাড়ী ফিরেছে কিনা রেবা। আবার ভাবে, কি দরকার? যখন খুশি ফিরুক চাই না ফিরুক, ওর তাতে কি? স্পষ্টই তো বুঝা যাচ্ছে, রেবা পাশ কাটাতে চাচ্ছে! কি দরকার খোঁজে?···ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে যাবে অশোক, লক্ষীর মা তাড়াতাড়ি কাছে এসে অনুরোধ করে, মার শরীল ভাল নেই, কিছু খাবে না। আপনি হাতমুখ ধুতে যাও।

জল বিচুটির চাবুক পড়ে যেন অশোকের পিঠে। তবু সংযম রেখেই উত্তর করে, আমারও খিদে পায়নি, আমি কিছু খাবো না। তোমরা খেয়ে নাও গে।

যা'হয় দুইডা—

না না, আজ আর আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না, তোমরা খাও গে যাও।

পাশাপাশি ঘর। রেবা আলো নিভিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা গুঁজে চুপচাপ পড়েছিল। অনন্ত ভাবনা কিলবিল করছে মগজে। চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে বালিশ। নিজের হাতেই নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলছে। জগৎ কি নিষ্ঠুর। কিন্তু কর্তব্য বড়ো, না নিজের সুখ শান্তি? কে—অসীমা? কেন ও ওর জন্য হাতের মুঠোর ধন ছেড়ে দেবে?··· ঘুমোতে পারলে হয়তো এখনকার মতো বাঁচতে পারতো। কিন্তু

ঘুমতো দূরের কথা দু'চোখের পাতা পর্যন্ত যে এক করতে পারছে না। অশোক যেন সারা নয়ন জুড়ে বসে আছে। অশোক—অশোক—সবটাই কি শুধু স্বপ্ন, শুধু মায়া !···

অশোকের আপত্তিতে লক্ষীর মা আর জোর দেখাতে সাহস করে না। চুপচাপই মুখ ভার করে চলে আসে। সারাদিন খাটুনী গিয়েছে দু'দণ্ড ঘুমুতে পারলে শরীরের আসান হয়। খিদেও পেয়েছে, কিন্তু কর্তা গিন্নী উপোস দিয়ে থাকলে ওরাই বা খায় কি করে! হয়তো রেবার ঘরেই কড়া নাড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর দরকার হয় না। বাড়ীতে অশোকের পা পড়তেই রেবা টের পেয়েছে। তবু চুপচাপ আছে, ভালয় ভালয় যদি খেয়ে দেয়ে বিছানা নিতো অশোক, তাহলে আর ঝঞ্ঝাট বাড়াতো না। কিন্তু অশোকও যে ওর মতো অভিমান করে না খেয়েই দরজা বন্ধ করে দিলে! এইতো মাত্র ক'দিন হাসপাতাল থেকে ফিরেছে, উপোস সইবে কেন? রেবা ভাবনায় পড়ে। অনর্গল অশ্রুধারায় দু'চোখ ফুলে উঠেছে। আঁচল দিয়ে ভাল করে চোখমুখ মুছে ছিটকানি খুলে বেরিয়ে আসে। লক্ষীর মা থতমত খেয়ে যায়। ঝাঁজালো মুখেই আক্রমণ করে রেবা, কি, বাবুকে খেতে দিলে না?

খিদে নেই বলে বাবু যে দরজা বন্ধ করে দিলা।

না, খিদে নেই, ভাল করে বলেছিলে? কুঁড়ের যম যতো! অভিমানে ফেটে পড়ে অশোকের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে থাকে রেবা। অনাদি, লক্ষীর মা ভয় পেয়ে একটু দূরেই সরে দাঁড়ায়।

অশোক জামা ছাড়ছিল। রেবাই যে কড়া নাড়ছে একথা খুবই স্পষ্ট। একবার ভাবে দোর খুলবে না। জুতো মেরে গরু দান। আমি খাই না খাই ওর কি?···কিন্তু কবি প্রকৃতি, ক্রোধ সহজেই আবার খাদে নামে। ঝি, চাকরের সামনে কেলেঙ্কারী করে লাভ নেই।

অশোক গম্ভীর হয়েই দরজা খুলে দিয়ে আলনার কাছে সরে আসে। কত যেন জ্বালা যন্ত্রণার ধকল যাচ্ছে রেবার। চোখ মুখে বিরক্তির ভাব টেনে ফেটে পড়ে, খাবে না কেন শুনি? অসুখ শরীরে উপোস দিয়ে আমাকে আবার না জ্বালালে চলছে না, কেমন?

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতোই কথাগুলো অশোকের বুকে গিয়ে বেঁধে। পাল্টাভাবেই ছোবল মারে ও, খিদে না পেলেও কি খেতে হবে?

খিদে পেয়েছে কি না পেয়েছে সে আমি জানি। মিছে রাত না করে হাতমুখ ধুয়ে এসো!

বিস্ফারিত চোখে এক ঝলক তাকিয়ে নীরবেই কলঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় অশোক। মনে মনে ভাবে, উঃ, কত দরদ! পেটখানা যেন ওরই! এতই যদি ভাবনা, তবে অতো ঢং দেখাবার দরকার কি ছিল? কিন্তু সব রাগ অন্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। একবর্ণও রেবার মুখের ওপর ব্যক্ত করতে পারে না। রেবা যেন ওর মাস্টার মশায়। দুষ্টুমী করলেই পিঠে বেত পড়বে। চোখে মুখে জল দিতে দিতে রাগটা আরো জল হয়ে যায়। এও তো হতে পারে, সুলালের অনুরোধেই হঠাৎ ওকে সিনেমায় যেতে হয়েছে। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এমন হামেশাই তো মানুষ যেয়ে থাকে। তাতে হয়েছে কি? রেবা যদি ভালই না বাসবে তাহলে কি দরকার ছিল ওর অসুখ শরীরে উঠে এসে সেধে খাওয়াবার? কই আমি তো একবারও জিজ্ঞেস করলেম না, কি ওর অসুখ? নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পায় অশোক। তাড়াতাড়ি কলঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রেবা যদি চোখমুখের ভাবটা একটু হাল্কা করে তাহলে ও সহজেই সব মিটিয়ে ফেলবে।

অশোকের ঘরেই আজ খাবার ব্যবস্থা হয়। দুখানি টিপয়ের ওপর দু'জনের খাবার দেওয়া হয়েছে। লুচি, মাংস তরকারী। রাত্রে ওরা

কেউ ভাত খায় না। অশোক ঘরে ঢুকেই বিস্ময় প্রকাশ করে, অসুখ শরীরে তুমিও আবার খাবে নাকি ?

মনে মনে হাসিই পায় রেবার। তবু কৃত্রিম ক্রোধেই উত্তর দেয়, হ্যাঁ, তুমি তো আমাকে না খাইয়ে মারতে পারলেই বাঁচ! সামান্য একটু মাথা ধরেছিল বলে সারা রাতটাই উপোস দিয়ে থাকতে হবে, না ?

অশোকেরও হাসি পায়, লঘু স্বরেই জবাব দেয়, আমি কি তাই বলেছি ?

বলবে কেন, তোমার ভাবখানাই তো ঐরকম।

অশোক নিজের কাছে নিজে বোকা বনে। কোথায় আজ ওর রাগ দেখাবার কথা তা না উল্টে রেবাই ওর ওপর ঝাল ঝাড়ছে। চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার জবাব দেয় অশোক, বেশ, সে যখন মরবে তখন দেখা যাবে, এখন বসো, আমি কিন্তু আর দেরি করতে পারছিনে।

অন্যদিন খাবার টেবিল মুখর হয়ে ওঠে গল্পে। খাওয়াটা যেন গৌণ, গল্প আলোচনাই মুখ্য। রাশি রাশি খাবার পড়েই থাকে দু'জনের পাতে। কিন্তু আজ নীরবে শুধু মুখের ক্রিয়াই চলেছে। দেখতে দেখতে পাত খালি হয়ে যায়। আবার লুচি আসে, আসে মাংস। শুধু মুখ টিপে টিপে পরস্পরের মধ্যে হাসি বিনিময় করা ছাড়া আর কোন কথাই হয় না। ঠাকুর আর লক্ষীর মা হতবাক হয়। ওদের ভাগে হয়তো আজ আর মাংস জুটবেই না। বাবাঃ, এর নাম খিদে নেই, আর এর নাম শরীর খারাপ! ...

আহারের পর চুপচাপই নিজের ঘরে চলে আসে রেবা। অশোকও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। নিজের কাছে নিজকে একটু ছোটই মনে হয় ওর। ছি ছি ছি রেবার বয়েস হয়েছে, যদি ও

ভালইবাসে আর একজনকে, তাই বলে এমনভাবে পেছন লাগতে হবে! একদিনের তুচ্ছ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবুঝ হতে হবে!···কিন্তু রেবার ঘুম আসে না। বেশ তো এক ডিগ্রী এগোনো গিয়েছিল। প্রথম কিস্তিতেই তো অশোকের মনে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে, তবে কেন প্রতিষেধক দিয়ে প্রক্রিয়া নষ্ট করতে গেলো ও? একবেলা না খেয়ে থাকলে নিশ্চয় অশোক মরে যেতো না। হয়তো এই অঙ্কুর থেকেই বিষবৃক্ষের বিস্তার সম্ভব ছিল। দু'চার দিনের মধ্যেই হয়তো পালাবার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে উঠতো, তবু কেন আবার ওকে সাধতে গেলাম! হৃদয়বৃত্তির বুঝি এমনিই তাড়না। মনের ঘোড়াকে বোধ হয় কিছুতেই লাগাম পরানো যায় না।···

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে চলে। নিঃসীম আকাশে অনন্ত কোটি তারার ঝলমলানি। লেক অঞ্চল নিঝুম নিস্তব্ধ। বাইরের রেলিং ধরে দাঁড়ায় এসে রেবা অশোকের ঘরের দিকে মুখ করে। কতদিন কতরাত্রে এমনি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে কবির পাশে। স্বপ্নসাধে মুখর হয়ে উঠতো মনের আনাচে কানাচে। না না, অশোককে নিয়ে আর স্বপ্নজাল নয়। ভোরে উঠেই হয়তো অশোক আবার স্বচ্ছন্দ আবেশে অভিভূত হতে চাইবে। চায়ের টেবিলে শুরু করবে গুঞ্জরন। কিন্তু তা আর কিছুতেই হতে পারে না। দুলালের সঙ্গেও এ খেলা বেশীদিন চলতে পারে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রেহাই দিতে হবে বেচারাকে। বলাতো যায় না, অশোকের সঙ্গে খেলতে গিয়ে আবার যদি তার মায়ায় জড়াতে হয়? কি ভাববে দুলাল? অনর্থক শুধু ছোটই করা হবে ওঁকে। স্বচ্ছন্দ মনেই হেনাকে কথা দেয়া হয়েছে। অসীমা হয়তো আবার স্বপ্ন দেখতেই শুরু করেছে। বেচারা, আজীবন শুধু আঘাতে আঘাতেই দিন গুনছে। কি দরকার ওর জিনিসে ভাগ বসিয়ে? কাল সকাল থেকেই আবার রাশ টেনে ধরতে হবে। অশোক

ক্ষণক্রোধী। হয়তো এতক্ষণে সমস্ত রাগ গলে জল হয়ে গেছে মুখভার করে বেশীক্ষণ থাকা ওর ধাতই নয়। অন্যের মুখভারও বেশীক্ষণ সইতে পারে না। কাল ঘুম থেকে উঠে কৃত্রিম পথেই আবার চলতে হবে। গুমরে গুমরে মরবে বিরহী আত্মা। তার পরেই তো অনন্ত ব্যবধান। এমন জায়গায় যাবো শত চেষ্টা করেও আর খুঁজে পাবে না। এমনও হতে পারে, হেনা যদি অসীমাকে নিয়ে বাঁধা রাস্তায় চলতে পারে তাহলে হয়তো ও আর ওর খোঁজও করবে না।···ভাবতে ভাবতে আবার এসে শয্যা নেয় রেবা। তন্দ্রায় ঢলে পড়ে এক সময়।

অশোক সত্যি সত্যি ঘুম থেকে উঠে রেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিন ভোর ভোরই ওঠে রেবা, কিন্তু আজ ওর হ'লো কি? রোদ যে জানালা ছেড়ে বারান্দায় এসে পড়লো!···রেবা সত্যি ঘুমিয়েই পড়েছিল। পূবের জানালা দিয়ে পিঠের ওপর কড়া রোদ পড়ায় এইমাত্র জেগে বসেছে। ছিটকানি খুলে বেরিয়ে আসতে লজ্জাই হয়। অন্যদিন এসময় চা জলখাবার হয়ে যায়। বাজারের ফর্দ পর্যন্ত অনাদিকে বুঝিয়ে দেয়। না, আর দেরি নয়। আড়মোড়া ভেঙে বিছানা ছেড়ে মেঝেয়, এসে দাঁড়ায় রেবা। ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটায় নিজের মুখ দেখে শিউরে ওঠে। ইস্, হু'চোখ যে ফুলে ঢোল হয়েছে, রাঙা টুকটুকে! হাতের চেটো দিয়ে খানিক রগড়াতে থাকে চোখমুখ। বেশ ছিল ঘুমিয়ে, জেগে উঠতেই অনন্ত চিন্তাজাল এসে ভিড় করছে। লজ্জাই হয় রেবার অশোককে মুখ দেখাতে। কিন্তু উপায় কি? পথ যে ডাকছে। পরনের শাড়ীটা গায়ে জড়াতে জড়াতে ছিটকানি খুলে বেরোয় রেবা। অশোকের ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। গাড়ী বারান্দা পর্যন্ত সটান দেখা যায়। একাকী বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে অশোক। রেবাকে রেখে চা জলখাবার কিছুই খায়নি। ছিটকানি খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে ভেতরের দিকে তাকায়। রেবা গম্ভীর মুখেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল, কে

জানতো অশোক এমনিভাবে তাকিয়ে থাকবে। চোখাচোখি হতে না হেসে পারে না। সঙ্কল্পের কথা মনে হতে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে কলঘরে ছুটে যায়। সকালেই স্নান করা অভ্যাস ওর। প্রাতঃকৃত্যাদি নিয়মিত সেরে ধারাযন্ত্র খুলে দেয়। ঝির ঝির করে পড়ে কলের জল মাথায় মুখে সারা দেহে। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। দেহের শিরা উপশিরাগুলো যেন তেতে উঠেছে। তেলে জলে স্নিগ্ধ হোক। অনেকক্ষণ বসে বসে স্নান করে রেবা। ইচ্ছে করে আরো খানিকক্ষণ থাকে। কিন্তু অশোক যে না খেয়ে বসে আছে। কিন্তু কি দরকার ওর বসে থাকবার? খেয়ে নিলেই তো পারে। রেবা মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কোথায় যেন বাঁধন ঢিলে হয়ে আছে। বেচারা, হয়তো ভালইবাসে। কালকের ব্যাপার আজ আর নিশ্চয় মনে নেই। ভুলো মন না হলে কি আর কবি হওয়া চলে? যাই, যতক্ষণ কাছে আছি ভদ্রতা রেখেই চলি। রেবা জামা কাপড় পরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে কলঘর থেকে। রাশি রাশি কালো এলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঢল ঢল করছে মুখখানা। যেন প্রভাতের কমল, এইমাত্র দীঘির জল থেকে উঠে এসেছে। অশোকের চোখ ধাঁধায়। মুখের ওপর থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে রেবার দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষ। রেবা ব্যস্তভাবেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে প্রবেশ করেছিল, ব্যস্তভাবেই কলঘর থেকে নিজের ঘরে প্রবেশ করে। মাঝখানের এই নিমেষটুকু অশোকের মনে কবিত্ব ফুটিয়ে তোলে। হাতে কাগজ কলম নেই, অশোক মনে মনেই আওড়াতে থাকে—

কে রাঙালো রাঙা ঊষা
হিয়া-মরু হায়রে ;
দরশন বিনা বুঝি—
দিল টুটে যায়রে।

না, অশোককে আর বেশীক্ষণ হাবুডুবু খেতে হয় না। দীঘির কমল প্রসাধন ছটায় আরো দীপ্ত হয়ে ফিরে আসে। অশোক মুগ্ধ নয়নেই ধ্যান গম্ভীর। রেবা ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি টেনে টিপ্পনী কাটে, ঢং করে এতো বেলা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি কেন, শুনি?

খেয়ে নিলে কি সত্যি এ ঢং দেখতে পেতুম সু? হেসে হেসেই জবাব দেয় অশোক।

হ্যাঁ, না খেয়ে আবার অসুখ করুক আর কি?

তার জন্য তো তুমিই রয়েছো। আবার কাছে কাছে পাবো।

রেবার বুকের মধ্যে তীর বেঁধে। হায় পোড়া বরাত, কাছে থাকাতো দূরের কথা, ওযে ছেড়ে যেতেই চলেছে। তবু সমতা রেখেই জবাব দেয়, আমার দায় পড়েছে।

না পড়ে থাকে টেনে ঘর থেকে বার করে দিয়ো। এখন আরো দেরি করবে নাকি? আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে?

চা আসে, সঙ্গে খাবার। উভয়ে প্রতিদিনের মতো এক সঙ্গে বসেই খেতে থাকে। রেবার আশঙ্কা হয়, এই বুঝি অশোক কালকের ঘটনা নিয়ে তিরস্কার শুরু করে। তা করে করুক। এ নিয়েই যদি বাদ বিসম্বাদ শুরু হয়, মন্দ হয় না। কিন্তু অশোক আজ তন্ময়। কাছের রেবা যেন আজ আরো কাছে এসেছে—বাহুর বন্ধনে। রেবার পেয়ালা নিঃশেষে শেষ হয়ে যায়। কোন কটুক্তি তো দূরের কথা, কবি প্রাণ বুঝি আজ বর্ষার ময়ূরীর মতোই নেচে উঠেছে। ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল রেবা, বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। বুঝিবা সকল বাঁধন টুটে যায় ওর। প্রতিরোধের আর কোন উপায় না পেয়ে অনাদিকে বাজারের ফর্দ দেবার অছিলায় উঠে যায়। ভোরের কমল সূর্য কিরণে প্রদীপ্ত! অশোক একাকী বসে বসে রূপ-সায়রে ডুব দেয়।

পাঁচ ছয় দিন, রেবার আর কোন কলা-কৌশল খাটে না। অশোক এমন ভাল ব্যবহার শুরু করেছে যে মাথা নাড়া দেবার উপায় নেই। সুলালকে মাঝখানে একদিন খবর দিয়ে আনিয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিও অশোক এমন নম্র ব্যবহার করেছে যে, রেবার আশঙ্কা হয়, সুলালকে নিয়ে ও যতো ছলা কলাই করুক না কেন, অশোক কোন গুরুত্বই দেবে না। অশোকের চোখেই যদি গোলক ধাঁধার সৃষ্টি না হ'লো তা'হলে আর অভিনয়ে লাভ কি? রেবা অনেকটা দমে যায়। অনুকম্পাও হয় অশোকের জন্য। এমন নিঃসংশয়ে যে ভালবাসে, তার বন্ধন ছিন্ন করা কি সহজ? নিষ্ঠুর বিধাতা, যা হবার নয় তাই নিয়ে ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছেন। রেবা পথ খুঁজে পায় না। একবার ভাবে, অশোককে নিয়ে পালিয়েই যায় এখান থেকে। কে অসীমা, কে হেনা, কাউকে চেনে না ও। এই বিশাল পৃথিবীর কোন এক নিভৃত কোণে কি ওদের এতটুকু ঠাঁই হবে না? জীবন তো দু'দিনের, তবে সরস পথ ছেড়ে কেন ও মরু যাত্রী হবে?···ভাবনায় ভাবনায় কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ে রেবা। কিন্তু অশোক প্রাণ বন্যায় উদ্বেল। খাবার টেবিলে, পড়ার টেবিলে, নিভৃত গাড়ী বারান্দায় অস্থির করে তোলে রেবাকে। সাড়া না দিয়ে পারে না রেবা, তবু যেন কেমন জড়—মৃত—অচঞ্চল ও।

আজ রবিবার। সকালে চা খেতে খেতে মুখর হয়ে ওঠে অশোক, সু, আজ কিন্তু থিয়েটারে যাবো। অনেকদিন পর ভাদুড়ী ম'শায় মাইকেল করছেন। দেখো, আজ যেন কোথাও বেরিয়ে যেয়ো না? আমি ফোনে 'সীট রিজার্ভ' করে রেখেছি।

রেবা হাসে, পেয়ালায় ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে সায় দেয়, বেশ তো চলো। তবে মাইকেল তো আমার ঘরেই রয়েছেন

কি যে বলো স্থ, কোথায় মহাকবি মধুসূদন আর কোথায় অখ্যাত কবি অশোক রায়? সূর্য আর মাটির প্রদীপে কি কোন তুলনা হয়?

হয়তো হয় না, কিন্তু সূর্যের তেজ যতোই বলীয়ান হোক—মাটির প্রদীপও তুচ্ছ নয়। সন্ধ্যায় গৃহলক্ষ্মীর হাতে মাটির দীপ মনোরম।

তুমি যে সত্যি কবি হয়ে উঠলে স্থ?

হিংসে হয় বুঝি?

হিংসে কেন হবে, এতো আমার গৌরব।

রেবা মনে মনে হাসে। বেশ, তা হলে সেই আনন্দেই কবি প্রাণ বিভোর থাক, আমি এখন উঠি। ঠাকুরকে মাছের চচ্চড়ির আনাজটা কুটে দিতে হবে।

তুমি বসো, ওরা যা হয় করবে'খন।

আজ্ঞে না মশায়, যাতা দিয়ে আপনার খাওয়া হয় না। রেবা উঠে দাঁড়ায়, অশোক খবরের কাগজে মন দেয়।

বিকেল পাঁচটায় থিয়েটার আরম্ভ, অশোক তিনটে বাজতেই তাড়া দেয়। কলঘরে রেবার প্রচুর সময় লাগে, সাজতেও ঘণ্টা খানেকের কম নয়। অশোকের তাড়া খেয়ে কলঘর থেকে এসে কেশ বিন্যাসে বসে রেবা। এলো খোপা, না একহারা বিনুনী? না না, ওর কোনটাই নয়, দুটোই সেকেলে—পুরোনো। ক্লিপ্ এঁটে এঁটে বব্ ছাঁটের মতোই স্কন্ধ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয় রাশিকৃত কৃষ্ণ কালো কেশগুচ্ছ। সরু কাজল রেখা মৃগ-নয়নে। নিঁখুত সাজই তো আজ সাজতে হবে। হয়তো আজকেই হবে চরম অভিনয়। হেন্‌রিয়েটা আর মাইকেল, সে তো মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধান সমাধি-যাত্রায়। কিন্তু রেবা অশোককে ছেড়ে যাবে ইহজগতেই—জন্মের মতো। সুলালকে তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে আসতে ফোন করে জানিয়ে দেয়। সুলালের চোখেও মায়াঞ্জন থাকা চাই। বেচারা, আলেয়ার আলো হাত দিয়ে ধরতে চায়।

কোন শিক্ষাই বোধ হয় মানুষকে এ প্রলোভন থেকে মুক্তি দিতে পারে না।

সাড়ে চারটে, অশোক ধুতি পাঞ্জাবী পরে প্রস্তুত। কবিত্বের ছোপ সারা বেশ ভূষায়—দেহ-মনে। স্বর্গের অপ্সরী নেমে এলো কি পৃথিবীর মাটিতে! চোখ ঝলসে যায় অশোকের রেবাকে দেখে। তাড়াতাড়ি অনাদিকে ট্যাক্সি ডাকতে পাঠায়। অনেকদিন পর আজ আবার হু'জনে পাশাপাশি বেরুবে। অনাদি নীচে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সদরে হর্ণ শোনা যায়। কিন্তু এতো ট্যাক্সি নয়, এযে চেনা আওয়াজ। সুলাল এলো কি অসময়ে! এসময়ে তার আবার কি প্রয়োজন থাকতে পারে! অশোক গাড়ী বারান্দায় গিয়ে দেখে। হ্যাঁ, সুলালই তো একক গাড়ী নিয়ে এসেছে, আঃ, কি জ্বালাতন!

রেবা উৎকর্ণ হয়েই ছিল। প্রসাধন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, শুধু সুলালের দেরি দেখেই একবারের জায়গায় তিনবার পরিপাটি করছিল। অশোকের পাশে গিয়ে নিজেও দাঁড়ায়। সুলালকে দেখে আশাতীত খুশী হয়ে ওঠে। সুলাল গাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে—সোজা দোতলায়। সাদর সম্ভাষণেই বসতে বলে রেবা। সাধা-সুরেই বাধা আসে সুলালের তরফ থেকে, বসবো কি, সময় যে হয়ে এলো! আপনার তো সবই হয়ে গেছে দেখছি, চলুন বেরিয়ে পড়ি? অশোকবাবু, আপনিও চলুন না? অশোক পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বিস্ময়ে হতবাক হয়। ওকি স্বপ্ন দেখছে! নয়তো আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের সেই যাদুকরের আবির্ভাব কি করে সম্ভব! রেবা সোৎসাহেই আবদার করে, সেই ভাল, তুমিও চলো। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সুলালবাবুর নেমন্তন্নের কথা। আজ ওদের ক্লাবে থিয়েটার—আমাকে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে।

পায়ের নীচের মাটি বোধ হয় সরে চলেছে। মূর্ছা যাবে কি অশোক,

না শক্ত এক ঘুষিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর নাক মুখ থেঁতো করে দেবে! রেবার আব্দারের কোন জবাবই দিতে পারে না মুখে।

রেবা আবার তাড়া দেয়, কই কি হ'লো তোমার, চলো।

আমি আজ কোথাও যাবো না রেবা, তুমি যেতে পারো। বজ্র-গম্ভীর স্বরেই কথাগুলো ঝরে পরে অশোকের কণ্ঠ থেকে।

সুলাল পুনরায় অনুরোধ করে, চলুন না, অশোকবাবু?

আমি গেলে আপনি খুশী হবেন না সুলালবাবু, অশোকের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ।

খেই হারার মতোই রেবাকে লক্ষ্য করে সুলাল পুনরায় সম্বোধন করে, রেবা দেবী, সময় যে হয়ে এলো।

তা'হলে তুমি যাবে না তো? অশোককে লক্ষ্য করে পুনরায় জিজ্ঞেস করে রেবা।

না, কঠোরভাবে জবাব দিয়ে অশোক নিজের ঘরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুলাল রেবাও নীচে নেমে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে। গাড়ী ছাড়ার শব্দে কান যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায় অশোকের। দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে কান। মিনিট কয়েকের মধ্যেই অনাদি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসে। অশোক ড্রাইভারের পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি ফেরৎ দিতে বলে দেয় অনাদিকে। বেচারা অনাদি, কি করবে ভেবে পায় না। হঠাৎ কি হ'লো? মা-ইবা গেলো কোথায়! ওকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে মনের রাগ ওর ওপরই ঝাড়ে অশোক, যা না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ট্যাক্সির মিটার উঠছে না?

অনাদি চলে যায়। অশোকের কানের কাছে যেন শত সহস্র ঢাক ঢোল বাজতে থাকে। বুঝি বা পাগল হয়ে যাবে ও।

* * *

গাড়ীতে পাশাপাশি চলেছে রেবা সুলাল। রাসবিহারী এভেন্যূ,

রসা রোড, চৌরঙ্গী হয়ে গড়ের মাঠ। তীর বেগে চলেছে গাড়ী। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মতোই থমথম করছে রেবার মুখ চোখ। হয় তো একটা দমকা হাওয়ার আলোড়ন অপেক্ষা, উছলে পড়বে অনন্ত জলরাশি। সুলালেরও নিজের কাছে নিজকে বড় ছোট মনে হয়। এক বৃন্তে ফোটা দুটি কুসুমকে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করতে চলেছে ও। এযে নিতান্ত ঘাতকের কাজ। আদি দেবতা কি ক্ষমা করবেন ওকে? গাড়ীর রাস টেনে গম্ভীর স্বরেই প্রশ্ন করে সুলাল, আর কতদূর যাবে?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চলুন না, অন্য মনস্কভাবেই জবাব দেয় রেবা।

কিন্তু—অশোকবাবু যদি পেছু নিয়ে থাকেন?

তাতে কোন ক্ষতি হবে না, বরং ভালই হবে, ঈষৎ হাসে রেবা।

সুলাল বিদ্যুৎ আহত হয়। মোড় ঘুরিয়ে গাড়ী এনে স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করায়। দু'জনে বসে এসে বড়ো পুকুরটার ধারে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, লোকের ভিড় অজস্র। তবু এরই মধ্যে এ জায়গাটা একটু নিরিবিলি।

গ্যাসের ক্ষীণ আলো পড়েছে পুকুরের জলে। ডোরা কাটা ওড়নার মতো ঝলমল করছে নীল জল। মলয় হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে। রেবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অশোক ঠায় চেয়ে আছে ওর দিকে। করুণ সজল সে চাউনি। না না, ক্রুদ্ধ দুচোখ যেন ফুঁসে উঠছে অন্তর্জ্বালায়। নীল জলের রেখায় রেখায় ও কার সোনা মুখ মলিন হয়ে উঠেছে?···অশোক—অশোক—অশোক। সারা অন্তর জুড়ে অশোক। ভুলতে গিয়ে একি ওকে পেয়ে বসলো!··· রেবা দু'হাটুর মধ্যে গুঁজে দেয় স্বীয় মস্তক।

রাত প্রায় আটটা। লোকের ভিড় কমে এসেছে। জায়গাটা এখন বেশ ফাঁকাই বোধ হচ্ছে। রেবার হ'লো কি! এতোটা পথ টেনে

এনে এমন চুপচাপ বসে আছে? বিস্ময়ের সুরেই প্রশ্ন করে স্থলাল, মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে কি?

হঁ্যা, বড্ডো বেশী, মুখ ঢেকেই উত্তর করে রেবা।

মাথার না বুকের?

ঠিক বুঝতে পারছিনে।

এর পর কি সাওয়াল করবে ভেবে পায় না সুলাল। হাইকোর্টের জজের চেয়েও যেন রেবাকে কঠিন মনে হয়। একটু দম নিয়ে কেবল ছোট্ট করেই ডাকে, রেবা—

বলুন, হাঁটুর ওপর থেকে মাথা তুলে চোখে চোখ রেখেই তাকায় রেবা।

আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

তার কি কোন প্রয়োজন আছে?

হয় তো নেই, তবু বড়ো কৌতূহল হচ্ছে।

আজ থাক না, তির্যক ভাবেই আবার দৃষ্টি হানে রেবা।

তবে থাক। কিন্তু যন্ত্রণাটা খুব বেশী মনে হচ্ছে কি?

হচ্ছিল, এখন একটু কম।

তা হলে চলো না, গাড়ীতেই একটু পাক খাওয়া যাক?

তবে ব্যারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে চলুন।

রাত অনেক হয়ে যাবে না?

তা একটু হোক না, ক্ষতি কি?

অশোকবাবু হয়তো ভাববেন।

সে এমনিও ভাবছেন, আবার হাসে রেবা।

সুলালও হেসে হেসেই সম্মতি জানায়, বেশ তবে চলো।

ঝড়ের বেগে ছুটছে গাড়ী। সুলালের পাশেই বসেছে রেবা, পেছনের সীট খালি। পুলিসের সঙ্কেতে সহসা গাড়ী থামাতে গিয়ে

কেউ আর ধাক্কা সামলাতে পারে না। এ ওর গায়ে গিয়ে ঠিকরে পড়ে। সুলাল যেন বহুবাঞ্ছিত কল্পলোকের মুখোমুখি বসে। এ রাত্রির বুঝি বা শেষ নেই। মনের ময়ূরটা নাচ শুরু করেছে। কিন্তু রেবার এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর মনে পড়ছে, দুর্যোগপূর্ণ সেই রাত্রির কথা। সেদিনও আকাশে এমনি জ্যোৎস্না ছিল। এমনিই পাশাপাশি চলেছিল অশোকের সঙ্গে। চাঁদ আর চকোরী। শুধু স্বপ্ন আর স্বপ্ন। সহসা ঘটলো দুর্ঘটনা। সেই সুড়ঙ্গ পথেই হাজির হ'লো অসীমা, হেনা আর সুলাল। এত চেষ্টা করেও নিষ্কৃতি দিলে না ওরা। আজো সুলাল পাথরের মতোই পাশে চেপে বসে আছে। কোথায় অশোক আর কোথায় সুলাল। কিসে আর কিসে!···

ডান হাতে স্ট্রিয়ারিং ধরে বাঁ হাত রেবার কাঁধের ওপর এলিয়ে দিয়েছে সুলাল। ধীরে ধীরে পদ সঞ্চারণ। কৈ, রেবাতো কোন আপত্তিই করছে না। আর একটু এগুলে ক্ষতি কি? সুলাল আরো ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে।

সহসা ধ্যান ভেঙে যায় রেবার। কার সঙ্গে ও পাশাপাশি চলেছে, ছি ছি ছি! অশোক যদি সত্যি পেছু নিয়ে থাকে, কি ভাববে!···রেবা যথাসম্ভব নিজকে সামলাতে উদ্যত হয়। সুলাল লজ্জাই পায়। দুহাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ী এনে দাঁড় করায় গান্ধী ঘাটে।

নিঝুম নিস্তব্ধ ঘাট। থৈ থৈ করছে গঙ্গার জল। দু'চারখানা নৌকোও দেখা যাচ্ছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে চারদিক। নিপুণ হাতেই ছবি এঁকেছেন বিশ্বকর্মা। উভয়ে গাড়ী থেকে নেমে ঘাটলার ওপর চলে আসে। সুলাল ভাবে, গঙ্গার দিকে মুখ করে খানিক বসলে হয়। রেবা যদি রাজী হয়, নৌ-বিলাসও চলতে পারে। সুলাল ভাবতে ভাবতেই অনুরোধ করে, খানিক বসবে কি?

খানিক কেন, সারারাতই তো থাকতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু—

কিন্তু অশোকবাবুর জন্য মন কেমন করছে, না? সুলাল যেন খুশী হতে পারে না। একটু শ্লেষই প্রকাশ পায় তার কণ্ঠে।

রেবা হেসে হেসেই জবাব দেয়, মনের কথা যা-ই হোক, রীতির কথা তো বটেই।

বেশ, তবে চলো ফিরি।

হ্যাঁ, আজকে তাই চলুন।

রাত প্রায় একটা। অশোকের মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। ঝড়ের পর নিস্তব্ধের মতোই এই রাত। ঝড়ের সমুদ্রে সাঁতার কেটে অশোক বুঝেছে, রেবার প্রেম-গগনে সে অস্তমিত, সুলালের নবোদয়। তা হোক, ভালবাসায় কোন গণ্ডি থাকতে পারে না। রেবা ফিরলে আজ তাকে ডেকে সহজভাবেই বলবে ও, ওরা সুখী হোক। এ সাজানো সংসার সবই ওর। কেন ও পালিয়ে পালিয়ে ফিরবে। সুলালকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করুক। অশোক দূরেই থাকবে, ভুলে যেতেই চেষ্টা করবে।

নিশুতি রাত। মৃদু হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে পাম গাছের পাতা, কেঁপে উঠছে অশোকের বুকের ভেতর। বড় সাধ ছিল রেবাকে নিয়ে ঘর বাঁধে, কিন্তু বিধাতা তা দিলেন না। জীবনে পেল কি অশোক? অসীমা তো বিস্মৃতির অতল তলেই ডুবতে বসেছে। ওকে শুধু শ্রদ্ধাই করা চলে, ভালবাসা যায় না। ভালবাসা সবটুকু রেবাই নিংড়ে নিয়েছিল। নয়তো সুপ্রভা দেবী সন্ধান পেয়েই তো কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অসীমাকে হাতে তুলে দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু ও তা নিতে পারলো কি? চোরের মতো পালিয়েই এলো—নিদারুণ অক্ষমতায়। চোখের জলে ভাসছে অসীমা—আবাল্যের সহচরী। বুক হয়তো ফেটে যাচ্ছে। অশোকের মতো ওও হয়তো আর একটি পুরুষকে ভালবাসতে পারতো,

হয়তো সুখীই হতো। তবুতো আজীবন তাপসীই রয়ে গেলো। কিন্তু কেন? অশোক নিজের মনেই নিজকে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পায় না। মানুষ বোধ হয় কোন দিনই এর উত্তর খুঁজে পাবে না। ছক কাটা এর কোন উত্তরই হয়তো নেই। কবি অশোক ভাবে, ভাবতে ভাবতে অশ্রুতে ভরে ওঠে আঁখি। গাল বেয়ে গড়িয়েও পড়ে ফোঁটা ফোঁটা। গিটারটা নিয়ে বসে এসে গাড়ী বারান্দায়। বেহাগের করুণ রাগিণী হাহাকারে ফেটে পড়ে। অন্তরে বাহিরে সুরের মূর্ছনা। কবিতা আজ সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠছে। রামগিরির বিরহী যক্ষ বুঝি ভর করে এসে ওর কাঁধে। শুধু সুর শুধু আত্মার বিরহ বন্দনা। কিন্তু হঠাৎ একি ছন্দ পতন!···হুঙ্কার ছেড়ে সুলালের গাড়ী এসে সদরে লাগে। হাতের গিটার টিপয়ের ওপর রেখে রেলিংএ ভর করে দাঁড়ায় অশোক। আবার কে ওর চোখে এক মুঠো লঙ্কার ঝাল ঝিটিয়ে দিলে? চোখ মেলে চাইতেই পারছে না যে। ফিরে এসে দপ করে কোচের ওপর বসে অশোক। গাড়ীতে আলো জ্বলছে। ওটা রেবার হাত না? রেবাই তো দু'বাহু দিয়ে আবেগে জড়িয়ে ধরে বসে আছে সুলালের গলা। এতোটুকুও কি সরম নেই! সারা পথ এসেও কি সাধ মেটেনি!··· অশোকের মাথায় খুন চাপে।

হতবাক সুলালও হয়। বাড়ীর দোরে এসে একি করছে রেবা! ইভো কি সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠলো!···হাসি রেবারও পায়। বিতৃষ্ণায় রেলিং থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অশোক পালালো। বেচারা, অশোককে লক্ষ্য করেই তো ওর সহসা এই বিস্ময়কর যবনিকা টানা। অন্তর হয়তো জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে অশোকের। তা জ্বলুক, সেই চিতার আগুনের ভেতর দিয়েই শুরু হবে বিদায় যাত্রা। সুলালের মাথার পোকাও হয়তো কিলবিল করছে। সহসা গলা জড়িয়ে ধরেছিল আবার সহসাই গলা ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ীর দরজা খুলে

বেরিয়ে আসে রেবা। স্থলাল বিদ্যুৎ আহতের মতোই গাড়ী নিয়ে উধাও হয়।

কলিং বেল টিপতেই অনাদি এসে দোর খুলে দেয়। রেবা যেন সিঁড়ি দিয়ে আর উঠতে পারছে না। পায়ে কে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছে। এ জীবনের সবই তো শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ, নিজেই তো ও শেষ করে দিলে। ভাবতে ভাবতে উপরে উঠে আসে। অশোকের ঘরের দরজা খোলাই রয়েছে।···বেচারার বোধ হয় বাহ্যিক কোন চেতনা নেই। কিংবা দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। নিজের ঘরে না গিয়ে গাড়ী বারান্দাতেই আসে রেবা।

কপালে হাত রেখে চুপচাপ কোচের ওপর বসে আছে অশোক। গিটারটা পাশেই রয়েছে। একটু আগেও বেজেছে, এখন নিস্তব্ধ। রেবার দুঃখই হয়। তবু গদগদভাবেই বিস্ময় প্রকাশ করে, একি! চুপচাপ বসে আছ যে! খাওয়া হয়েছে?

অশোকের ইচ্ছে হয় গিটারটা তুলে রেবার মাথায় ছুঁড়ে মারে। ঢং দেখাতে এসেছে! তবু অতি কষ্টেই নিজকে সামলিয়ে নিয়ে ফেটে পড়ে, সে খোঁজে তোমার কোন দরকার আছে?

রেবা বুঝেও পুনরায় আবদার করে, অঃ, বাবুর বুঝি রাগ হয়েছে, তা গেলেই হতো আমার সঙ্গে?

তোমার সঙ্গে, ছি! অশোক রেবাকে আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সোজা এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

রেবাও টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে আসে।

সে রাত্রে কারো খাওয়া হয় না।

পরদিন সকালে সবার আগে ওঠে রেবা। স্নান সেরে জামা কাপড় পরে অনাদিকে ডেকে তোলে। রেবার ঘরে উপস্থিত হয়ে হতবাক হয় অনাদি। বিছানা সুটকেশ সব গুছানো। বিস্ফারিত নয়নেই ও রেবার মুখের দিকে তাকায়। রেবা মৃদু হেসে প্রশ্ন করে, ওকি রে, ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছিস কেন ?

তুমি কি কোথাও যাচ্ছ মা ?

হ্যাঁরে আমি বোধ হয় আর ফিরবো না। তোদের বাবুকে একটু দেখিস।

বাবু যাবেন না ?

না।

গত রাত্রে গাড়ী বারান্দায় কি কথা হয়েছে ওরা কেউ জানে না। তবে রাত্রে কেউ খায়নি। এ রকম তো আগেও দু'চারবার হয়েছে। তাই বলে মা চলে যাবে! অনাদি ভাবতেও পারে না। বিস্মিত মুখে পুনরায় প্রশ্ন করে, বাবুকে বলেছ মা ?

ঘুম থেকে উঠলেই বলবো। তুই তাড়াতাড়ি একটু উনুনে আগুন দে, বাবুর জন্য খাবার তৈরী করতে হবে।

ঠাকুরকে ডাকবো ?

না, আমিই আজ তৈরী করবো।

অনাদি যেতে উদ্যত হয়। রেবা পেছন ডাকে, শোন, বাবুর চা জলখাওয়া হয়ে গেলেই একখানা গাড়ী ডেকে আনবি, বুঝলি ?

বিষণ্ণ মুখেই অনাদি মাথা নাড়ে। একবার ভাবে, বাবুকে ডেকে এক্ষুনি সব বলে দেয়। বাবু জানতে পারলে কিছুতেই মাকে যেতে দেবে না।

ভাল ঘুম না হলেও একটু বেলা করেই বিছানা থেকে ওঠে অশোক। মুখ চোখ গুরু গম্ভীর। রেবা যে হেঁসেলে গিয়ে সব তৈরী করছে, বিন্দুমাত্রও টের পায় না। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যথারীতি এসে খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাতে থাকে। ঠাকুর রাশিকৃত খাবার এনে হাজির করে। অসুখ থেকে ওঠবার পর ঘন ঘন খিদে পায়। অথচ কাল রাত্রে কিছুই খাওয়া হয়নি। পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো সব জট পাকাতে শুরু করেছে। এপর্যন্ত তো দুজনে এক সঙ্গে বসেই খেয়েছে। কিন্তু আজ একা। রেবার অভাব অনুভব করে অশোক। তবু গত রাত্রের সেই নাটকীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে বিতৃষ্ণা জাগে। কে রেবা, চেনে না অশোক এ নামে কাউকে। কেন খাবে না; এ খাবার তো সবই ওর নিজের পয়সায় তৈরী। গোগ্রাসেই সব গিলতে থাকে অশোক।

অন্যদিন হলে হয়তো রেবা জলবিন্দুও মুখে দিত না। কিন্তু আজ চলে যাবে, হয়তো জন্মের মতোই যাবে। শুধু-মুখে গেলে যদি অশোকের অকল্যাণ হয়! তাছাড়া ওতো স্বেচ্ছায়ই যাচ্ছে। অশোক যা বলেছে সেতো সামান্যই। ভালবাসার পাত্রীকে এরূপ অসংলগ্ন অবস্থায় দেখলে কার না রাগ হয়। রেবা, কিছু খাবার ও চা বিনা আদর আপ্পায়নেই খেয়ে নেয়। অশোকের অলক্ষ্যেই নিজের ঘরে চলে আসে। দীর্ঘদিনের স্মৃতি জড়িত এই ঘর। প্রতিটি আসবাব-পত্রের মধ্যে রয়েছে প্রাণের স্পর্শ। আসবাব-পত্র তো দূরের কথা একখানা বইও ও সঙ্গে নেবে না। অশোককে একান্তভাবেই অসীমাকে উপহার দিয়ে যাবে। ভুলেই যাবে অশোককে। কোন স্মৃতি কোন বন্ধন বয়ে নিয়ে যাবে না। কালো পাড় সাদা ধোপ ধোয়া একখানা শাড়ী ও সাধারণ সাদা একটা ব্লাউজের মধ্যেই নিজের বেশভূষাকে সীমাবদ্ধ রাখে। এই শাড়ী ব্লাউজই প্রথম দিন ওর পরনে ছিল। অশোক এই দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। আজ

বিদায়ের দিনেও এই পরেই যাবে। যেখানকার যে জিনিস সেখানেই গুছানো আছে। অসীমার কোন কষ্ট হবে না। আঁচলে চোখ মুছেই ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরোয় রেবা। অনাদি গাড়ী ডাকতে গিয়েছে। ঘর বন্ধ করে সোজা গাড়ী বারান্দায় এসে অশোকের সন্মুখে দাঁড়ায়।

খবরের কাগজে চোখ ঢেকে বসে আছে অশোক। রেবার পায়ের শব্দ টের পেয়েও নিষ্ক্রিয়ই থাকে।

রেবা শান্তভাবেই বিদায় মাগে, আমি চললেম, চাবিগুলো রইলো। হাত থেকে চাবির গোছাটা টিপয়ের ওপর রাখে।

অশোকের উনপঞ্চাশ বায়ু মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এতবড়ো স্পর্দ্ধা, নির্লজ্জ বেহায়াপনাও করবে অথচ কিছু বলবার উপায় নেই! ওকি তাড়িয়ে দিয়েছে ওকে? তবে কেন এভাবে অপমান করে চলে যাবে? কেন, কেন?...অশোক বিদ্রূপাত্মক স্বরেই হুল ফোটায়, কোথায়, ব্যারিস্টার সাহেবের বাংলোতে নিশ্চয়?

না, তেপান্তরের মাঠে—জন্মের মতো; শান্তভাবেই জবাব দেয় রেবা।

হ্যাঁ, মাঠেঘাটের অভিসার না হলে আর চলবে কেন?

অশোক তুমি এখন উত্তেজিত, তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলা এখন উচিত হবে না। আমি চলে যাচ্ছি তুমি আমাকে হাসি মুখে বিদায় দাও।

হাসি মুখ দেখবার লোকের কি তোমার অভাব আছে?

যতো খুশী থাক; আজ আর তুমি অমন করে বলো না অশোক! ইচ্ছে হয় সারা জীবন আমার কুৎসা রটিয়ো, শুধু আজ আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও!

কুৎসা রটাবো আমি। আর সেটা কি একান্তই মিথ্যে?

অন্তর্যামী জানেন, আমি চললেম; গুরু গম্ভীর ভাবেই রেবা কয়েক পা অগ্রসর হয়।

অশোক খবরের কাগজে মুখ ঢেকে নিস্তব্ধই থাকে। অন্তরে শুরু হয় কালবৈশাখীর নর্তন।

রেবা পুনরায় কাছে এসে অনুরোধ করে, আমার একটা উপকার করবে অশোক ?

বলতে পারো।

আমার ঘরের টেবিলের ওপর একটা প্যাকেট আছে ওটা সুলাল-বাবুকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবে ?

খুব শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাচ্ছ যে ! সুলালবাবুর কাছেই যে তুমি যাচ্ছ সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে। মিথ্যে আর সতীপনা দেখিয়ো না।

রেবার মুখে যেন জলবিচুটির চাবুক পড়ে। তবু ক্ষীণ হেসেই বাধা দেয়, তাও কি সম্ভব অশোক ? তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করছি, সুলালবাবুই বা বিশ্বাস করবেন কেন ?

মুখের মতো জবাব পেয়ে অশোক আর মুখ খুলতে পারে না। রেবা পুনরায় বলতে থাকে, অশোক আমি চলে যাচ্ছি। যাবার সময় তোমাকে একটা প্রণাম করে যেতে চাই।

রেবার এ প্রস্তাবে নিজকে বিপন্ন মনে করে অশোক। তাড়াতাড়ি পা সোফার ওপর তুলে গুটিসুটি হয়ে বসে। এতক্ষণ তার কথার মধ্যে ঝাঁজ ছিল, এখন যেন অন্তর গলে উছলে পড়তে চায়। সত্যি চলে যাবে রেবা, ওর স্বপ্ন ওর সম্ভাবনা সব কিছু ধুয়ে মুছে যাবে !…পাথরের মতোই নিশ্চুপ থাকে অশোক।

রেবা পুনরায় হেসে হেসেই বলে, ভয় নেই, আমি তোমাকে স্পর্শ করবো না। অস্পৃশ্যেরও দূর থেকে বিগ্রহকে প্রণাম করবার অধিকার আছে। দুহাত কপালে তুলে প্রণাম করে পুনরায় বেরিয়ে যায় রেবা।

অশোক হতভম্বের মতোই ওর পথের দিকে চেয়ে থাকে।

রেবা চলে যায়, অশোকের মাথায় খুন চাপে। অনাদি, লক্ষ্মীর মা, ঠাকুর সকলেই যেন মুষড়ে পড়ে। কেউ যেন খুশী নয় ওরা ওর ওপর। ও যেন সকলের কাছেই অপরাধী। বেশ তাই হোক, কাউকে ওর প্রয়োজন নেই। ভেঙে দেবে এ সংসার, এ ঘর দোর —মায়াপুরী। রেবার রেখে যাওয়া চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে উঠে আসে অশোক আসন ছেড়ে। এক লহমায় তালা খুলে রেবার ঘরে প্রবেশ করে। কি এমন অমূল্য সম্পদ রেখে গেলো ও স্থলালের জন্য! সত্যি কি তাহলে স্থলালের কাছে যাচ্ছে না ?···ঘরে ঢুকে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রের ওপর। পাশেই রয়েছে প্যাকেটটা। একি! এ যে ওকেই লেখা! "শ্রীচরণ কমলেষু"—মোড়ক খুলে অস্থিরভাবে পড়তে থাকে অশোক। কি লিখেছে রেবা! সেদিন যে গল্প লিখে শুনিয়েছে সেটা তার নিজের জীবন-ইতিহাস! ইভাই রেবা! এ কি করলেম! জীবন দুখিনী একটি নারীকে আশ্রয় থেকেও বঞ্চিত করলেম! তবে কিসের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটা, উপন্যাস লেখা! কাছে থেকেও ধরতে পারলেম না সামান্য একটি নারীর মর্ম বেদনা? অনুশোচনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে অশোক।···একি, শেষ পঙক্তিতে এ সব কি লেখা রয়েছে! স্থলাল দাদা! প্রেমাস্পদ নয়! সবটাই অভিনয়! কেন, কেন এ মিথ্যে অভিনয়? কি আছে ঐ প্যাকেটের ভেতর? অশোক বিদ্যুৎ গতিতে খুলে ফেলে বাঁধন। প্রথম দৃষ্টিতেই ঝিমিয়ে পড়ে। এযে অসীমাকে দেওয়া ওরই প্রীতি উপহার! এমনিভাবেই কি প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিলে অসীমা? সেদিন হাসপাতালে তাহলে ভুল দেখেনি ও! হেনা আর স্থলালের সঙ্গে অসীমাই তাহলে ছিল। ···ব্যাণ্ডেজের নীচে ঝাপসা ছিল দৃষ্টি। দ্বিতীয় দিন আর ওকে

না দেখে ভেবেছিল, অন্য কেউ হবে, হয়তো দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে, সে স্বপ্ন নয়, সত্য! অসীমা—অসীমা, জীবনের সর্বস্তরে এই অসীমা। নিজেও সুখী হতে পারেনি আমাকেও সুখী হতে দেবে না। হ্যাঁ, অসীমাকে ও শ্রদ্ধা করে। হয়তো আজীবন ওর জন্য তপস্যা করছে ও। সংস্কারাবদ্ধ মন নিয়ে হয়তো একটিবারের জন্যও অন্য কোন পুরুষকে হৃদয়ে ঠাঁই দেয়নি। কিন্তু তাতে ওর কি? কৈশোরে কাদামাটি দিয়ে যে ঘর বেঁধেছিল, যৌবনের উত্তাল ঝড়ে তা ভেঙে গেছে। তাই বলে কি আজীবন সেই স্মৃতি বুকে করে জ্বলতে হবে? না না, অসীমাকে সত্যই ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ভালবাসা আর শ্রদ্ধা তো এক নয়। শ্রদ্ধা তো যে কেউ যে কাউকে করতে পারে কিন্তু ভালবাসতে পারে কি? অসীমা কি এই সহজ কথাটা এতদিনেও বুঝতে পারলে না। শ্রদ্ধা, সে তো ভালবাসার অংশ বিশেষ, হৃদয়ের পরিপূর্ণ অনুভূতিই তো ভালবাসা। রেবা চলে গেছে, হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীতেই তো ঘা লাগছে। কিন্তু অসীমার জন্যে তো তা হয়নি। শ্রদ্ধা তো দূর থেকেও করা যায়, ভালবাসা যায় কি?…অশোকের কবি মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অসীমার প্রতি বোধ হয় ওর শ্রদ্ধাটুকুও নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ নারী-প্রবৃত্তি নিয়েই অসীমা আজ ওকে দংশন করতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, সেই জন্যেই এই এ্যালবাম, যা একান্তভাবে একদিন ও ওকেই দিয়েছিল, যা শুধু ওর আর ওর নিজের কায়া নিয়ে রূপায়িত, কৌশলে রেবার হাতে দিয়েছে। ঘর ভাঙবার অমোঘ অস্ত্র। আশ্চর্য, রেবা সেই অস্ত্রে ঘায়েল হ'লো। ও যদি যাবার আগে অন্তত একটি বারও সবকথা খুলে বলতো, যদি একটি বারও এ চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতো, তাহলে কিছুতেই এ পরিণতি হতো না। রেবা লিখেছে, একবার ওর বিয়ে হয়েছিল, ওকে আমি ভাল বাসতে পারি না। হায় মূর্খতা, ও যদি একবার মুক্ত বায়ুতে দাঁড়িয়ে ভাবতে

পারতো, ভালবাসা ও গণ্ডি মানে না। আদিমকাল থেকে বর্তমানকাল মানুষ ও-সীমা বহুবার লঙ্ঘন করেছে। প্রয়োজন বোধে আবার লঙ্ঘন করবে। রেবা এ তুমি কি করলে?···আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে অশোক। ক্ষিপ্তভাবেই অনাদিকে ডাকে। ব্যস্তসমস্ত হয়েই ছুটে আসে অনাদি।

অশোক প্রশ্ন করে, তোদের মা কোথায় গেলেন, জানিস?

মাথা চুলকাতে থাকে অনাদি। সত্যিই তো, একবারও তো জিজ্ঞেস করেনি ও, মা তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমতা আমতা করেই ঘাড় নেড়ে অজ্ঞতা জানায়।

বিরক্তি বোধ হয় অশোকের, যত সব বেইমান। একটা মানুষ কোথায় গেল কেউ তা জিজ্ঞেস করলে না। গলার স্বর তীব্র করেই হুকুম করে, যা, জলদি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়?

অনাদি কয়েক পা অগ্রসর হয়। অশোক পুনরায় বাধা দেয়, থাক, তোকে দিয়ে হবে না, বলতে বলতে নিজের ঘরে এসে একটা পাঞ্জাবী গায় দিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়ে। এক লহমায় মনে হয়, দুলালের সঙ্গে যখন যায়নি রেবা তখন হয়তো কোন দূর দেশকে লক্ষ্য করেই পথ ধরেছে। চেষ্টা করলে এখনো হয়তো ফেরানো সম্ভব। একটা ট্যাক্সি ডেকে হাওড়া স্টেশনের দিকে ছোটে অশোক। রাস্তার উভয় দিকে রাখে শ্যেন দৃষ্টি। যদি কোথাও কোন কারণে দেরি করে রেবা। যদি কোন জিনিস কেনবার তাগিদ থাকে।

নিষ্ফল চেষ্টা। সমস্ত পথঘাট, সমস্ত স্টেশন, কোথাও রেবা নেই। ঝড়ের পাখী ঝড়ের হাওয়ায় উধাও হয়েছে। অশোকের আর চলার শক্তি থাকে না। অবসন্ন দেহ মন। অনন্ত বিস্তৃত পথ। দানবের মতোই ফোঁস ফোঁস করছে স্টেশনে ইঞ্জিনগুলো। মিনিটে মিনিটে আসা যাওয়া। কে জানে, রেবাকে নিয়ে কোন দৈত্য পালিয়েছে?···

রেবা পালিয়েছে কিন্তু ওর স্মৃতি মুখর হয়ে উঠেছে অশোকের অন্তর্লোকে। বুকখানা যেন খালি করে দিয়ে গেছে। পাশাপাশি থাকতো, কিন্তু ও যে এমনভাবে হৃদয় জুড়ে বসেছিল সে কথা আগে কখনো টের পায়নি। টের পেলেও ভাবতে পারেনি রেবা পালাবে। পাগলের মতোই ট্যাক্সি নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে অশোক। সারাদিন স্নান খাওয়া হয় না। বিকেল প্রায় পাঁচটা, ছেড়ে দেয় ট্যাক্সি। আউটরাম ঘাটে সূর্য ডুবছে। পশ্চিম দিগন্তে চাপ চাপ হয়ে জমে আছে খুন। এইমাত্র যেন রেবাকে খুন করে ফিরলো আশোক। সারা গঙ্গার জল লালে লাল। না, এভাবে বসে থাকলে চলবে না। সারা কোলকাতা সারা পৃথিবী ও খুঁজে দেখবে। উঠে পড়ে অশোক। হাতে এ্যালবামের প্যাকেটটা। হ্যাঁ, সূর্যাস্তের পূর্বেই সুলালকে ফিরিয়ে দেবে এটা। তার বারিষ্টারী চাল সার্থক হয়েছে। অসীমার কাছে প্রচুর পুরস্কার পাবে। অশোক অন্য কোথাও খোঁজার আগে সুলালের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়। এইতো কাছেই হাইকোর্ট, সুলাল নিশ্চয় এখনো চেম্বার থেকে বেরোয়নি। একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ে।

সুলাল চেম্বারেই ছিল। একাকাই ছিল। বসে বসে কি জানি একটা জটিল মামলার কথা চিন্তা করছিল, বেয়ারা এসে অশোকের উপস্থিতি জানায়। ভিজিটার্স কার্ডে লেখা নাম। ব্যস্তভাবে নিজেই ছুটে যায় সুলাল অশোককে অভ্যর্থনা জানাতে। পথে গতরাত্রের নাটকের কথা মনে হয়, তবু না যেয়ে পারে না। সম্মানিত অতিথি, তাছাড়া এখনো রেবার মনোভাব সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবটাই যেন গোলক ধাঁধা।

নিয়মতান্ত্রিক ভদ্রতা বিনিময় করে দু'জনে আবার ফিরে আসে চেম্বারে। সুলাল বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসতে বসতে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার বলুন তো? আপনাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে? ভয়ে দুর দুর করে কাঁপতে থাকে সুলালের বুক।

অশোক ক্ষীণ হেসেই জবাব দেয়, ও কিছু না। আপনার সঙ্গে একটা জরুরী মামলার বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে চাই ?

বিলক্ষণ, কিন্তু এ নিয়ে আবার ছুটে আসার কি দরকার ছিল ? আমাকে ডেকে পাঠালেই তো হতো ?

না, না, অতটা জুলুম করতে চাইনে, আপনি ব্যস্ত থাকেন।

সে হয়তো থাকি, তাই বলে আপনারা ডাকলে যাবো না! সে যাহোক, দলিল এনেছেন কি ?

অশোকের মনে মনে হাসি পায়, আমরা নয়, তবে রেবার জন্য নিশ্চয় যেতে পারো শয়তান। প্রকাশ্যে এ্যালবামের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, এই নিন।

সোৎসাহেই মোড়ক খুলতে থাকে স্থলাল! কিন্তু একি হ'লো! সহসা কেউটের ছোবল পড়লো কি হাতে ? এ এ্যালবামটা যে ওর নির্দেশেই হেনা রেবাকে দিয়েছিল। ছি ছি, কি লজ্জা। স্থলাল মাথা তুলে চাইতে পারে না অশোকের দিকে।

খুব জটিল দলিল, কি বলেন স্থলালবাবু ? অশোকের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ।

স্থলাল তবু কোন উত্তর দিতে পারে না।

অশোক পুনরায় বলতে থাকে, মামলায় আপনার জয় হয়েছে স্থলালবাবু, মক্কেলের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা পাবেন। আচ্ছা উঠি, উঠে দাঁড়ায় অশোক।

স্থলাল বাধা দেয়, আমাকে ক্ষমা করুন অশোকবাবু। আমি বুঝতে পারছি, আমার ভুল হয়েছে। অসীমার মুখ চেয়েই আমাকে এ কাজ করতে হয়েছিল।

অসীমার মুখ চেয়ে! হা হা হা বিকট হাস্যে ফেটে পড়ে অশোক। স্থলাল নিজেকে অপ্রস্তুত বোধ করে। তবু প্রাণপণ চেষ্টায়

বাধা দেয়, আপনি বিশ্বাস করুন, অসীমা আমার বোন। ওর মুখ চেয়েই—

ওর মুখ চেয়েই দু'জনে—মোটরে পাশাপাশি বসে—বাহুতে বাহু রেখে নৈশ অভিযান করেন, কেমন? মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়েই ফেটে পড়ে অশোক।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে সুলালের। রহস্যময়ী রেবা। এ্যালবামটাই বা অশোকের হাতে দিলে কেন? আবার ভাবে, অশোকই হয়তো ওর ড্রয়ার খুলে গোপনে প্রতিশোধ নিচ্ছে! তবু বাধা দিতে উদ্যত হয়, আপনাকে আমি বোঝাতে পারবো না। আপনি বিশ্বাস করুন, এ জয় আমি চাইনে। আপনি আপিল করুন।

আপিল করবো? হা হা হা, আপনার এজলাসে নিশ্চয়ই?

সুলাল থতমত খেয়ে যায়। আমতা আমতা করেই বলতে থাকে, না মানে—

এর আর কোন আপিল কোর্ট নেই সুলালবাবু। ভাগ্য এখন আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন। আশা করি ইতরজনকে অন্তত মিষ্টান্ন ভোজনের সুযোগটা দেবেন, রাগে গোঁ গোঁ করতে করতেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে অশোক।

সুলাল পেছন ডাকে, অশোকবাবু—

অশোকের কানে হয়তো সে কথা পৌঁছোয় না। ছুটন্ত একখানা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ে।

সুলাল শূন্য চেম্বারে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে। জটিল মামলার ভাবনা উবে যায়। রেবা সত্যি গোলক ধাঁধা। কি চায় বুঝবার উপায় নেই। কবি অশোক রায় সত্যি মর্মাহত হয়েছেন। কিন্তু ও কি করবে? এই যে কদিন রেবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো সেকি ওর নিজের ইচ্ছায়! ও তো গাদা বোট, রেবা যেমন চালিয়েছে ও তেমনি

চলেছে। কিন্তু এখন কি করা উচিত? রেবা যদি···না না, তা হয় না। আর হয় না-ই বা কেন? গাড়ীর মধ্যে কাল যে কাণ্ড করলে, ভেবে দেখলে তার অর্থই বা কি হয়? স্থলালের ব্যারিষ্টারী মাথা ঘুরপাক খেতে থাকে। বেয়ারা পুনরায় একখানি পত্র নিয়ে আসে। এই মাত্র ডাকে এলো। মোড়ক খুলে পড়তে পড়তে বিস্ময়ে দুলতে থাকে স্থলাল, রেবা অচেনা পথে পা বাড়ালো! সবটাই অভিনয়! ছি ছি কি লজ্জা! নিজের চালে নিজেই মাত হলাম! ওতো বড় ভাই ছাড়া কিছুই ভাবেনি। অশোকের মনকে বিষিয়ে দেবার অছিলায়ই এ মিথ্যে অভিনয়। এ আমি কি করলেম?···শেষের লাইন দুটো যে পড়া যায় না, দাদা আমাকে ক্ষমা করবেন। অশোককে আমি অসীমাকেই উপহার দিয়ে গেলাম। জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। চাকরি নিয়ে দূর দেশে যাচ্ছি। আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে। আমার আর খোঁজ করবেন না। প্রণাম। ইতি—

"খোঁজ করবেন না," মানুষ যেন ইচ্ছে করলেই সব ভুলতে পারে। স্থলাল নিজের আগুনে নিজেই জলতে থাকে। অসীমার মুখ চেয়েই তো এ কাজ ও করেছিল। তারপর দাবার ছকে বসে কি থেকে কি হয়ে গেল। না না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ও খুঁজে বেড়াবে রেবাকে। বড় ভাই হিসেবে ওর তো একটা কর্তব্য আছে? রেবা অশোক অভিন্ন। তাতে যদি অসীমা দুঃখ পায়, পাক। এছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যায় না। অসীমাই বা ভাববে কি? ওতো এখন বুঝতে শিখেছে। নিজের সুখের জন্য অন্যের ঘরে আগুন দিতে রাজী হবে কেন? ধরে বেঁধে কখনো কি প্রেম হয়? না না, কিছুতেই না। পত্রটা যদি দু মিনিট আগেও আসতো তাহলে অন্তত অশোককে বোঝানো যেতো ও জুয়া খেলেছে। জুয়ায় হার জিত আছে, তাই বলে সেটেই মানুষের শেষ কথা নয়। অশোক কেন হাল ছাড়বে?

রেবা তার সুখের জন্য স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়েছে, ওর উচিত, রেবাকে ভুল না বুঝে ফিরিয়ে আনা। সংসারে মানুষ কতই না ভুল করে। রেবাই বা একটা এ্যালবামের মূল্য এমন করে দিলে কেন ?···ভাবনা রেখে সুলাল গাড়ী নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরে। হেনাকে পাঠিয়ে যদি অশোককে অন্তত ফেরানো যায়। শেষটায় না সে আবার ভুল করে বসে।

৩৩

সমস্ত দিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে অশোকের মেজাজের ঠিক নেই। সুলালের চেম্বার থেকে বাসায় ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা উৎরে যায়। লক্ষীর মা, অনাদি, ঠাকুর কারো খাওয়া হয়নি। এ পর্যন্ত তো রেবার নির্দেশেই বাজার হাট হয়েছে, ওর নির্দেশেই রান্না হতো। আজ নিজেরা যা পেরেছে করেছে। কিন্তু বাবু সারাদিনে কিছু খেলো না। সেই সকালে মা যা চা জলখাবার দিয়েছিল। কেউ ওরা অশোকের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। অশোকের হাসিই পায়। রাগ এখন বিতরাগে এসে ঠেকেছে। রেবাই যদি না রইলো তবে কিসের সংসার ? যেদিকে তাকায় ওরই স্মৃতি জড়ানো। তলা থেকে শ্বেত ইঁদুরে মাটি কেটে দিয়েছে। যাক, সব চুরমার হয়ে যাক। লক্ষীর মা সাহসে ভর করে শুধোয়, ইস্, মুখচোখ যে শুকাইয়া গেছে, কখন খাইবেন ? যাও ছান কইরা আসেন।

সংসার ভেঙে গেছে, তবু এ মিথ্যা দরদ। অশোকের কানে বিদ্রূপের মতোই শোনায়। আবার ভাবে, ওদের আর দোষ কি। সহজ সরল মানুষ গায়ে খেটে দুটি খায় পরে। বেচারারা হয়তো সারাদিন উপোস দিয়ে আছে।···তোমারা খাওগে ? আমি

খেয়ে এসেছি! মিথ্যাই বুঝাতে চেষ্টা করে অশোক। লক্ষ্মীর মা সব বোঝে। হোক মনিব, অশোক ওর পেটের সন্তানের মতো। সস্নেহেই উত্তর করে, তাও কি হয় বাবা, যাও ওঠেন।

অশোকের বুক ঠেলে কান্না আসে। এ বাড়ীতে কিছুতেই আর বাস করা সম্ভব নয়, এ শহরেও না। আজকে এই মুহূর্তেই এখান থেকে চলে যাবে। কি আর এমন মায়া? ঐ তো মাত্র কটা জিনিস। লক্ষ্মীর মা, অনাদি আর ঠাকুরকে দিয়ে দিলেই হ'লো। বেচারারা ঝট্ করে কোথাও কাজ পাবে না। জিনিসগুলো পেলে তবু কিছুদিন চলবে। লক্ষ্মীর মা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে লক্ষ্য করেই বলে অশোক, বুড়ীদি, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তোমরা অন্য কোথাও কাজ দেখে নিও।

যেন আকাশ ভেঙে পড়ে লক্ষ্মীর মা'র মাথায়। কোন উত্তর দিতে পারে না। অশোক দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই পুনরায় বলতে থাকে, হয়তো দুদিন তোমাদের একটু কষ্ট হবে কিন্তু কাজ তোমরা পাবেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। অনাদি, আর ঠাকুর কোথায়? ওদের ডাক।

লক্ষ্মীর মা কি করবে ভেবে পায় না। ওদের ডাকতেই যায়। দেখা যাক, সকলে মিলে বাবুকে বাঁধতে পারে কি না। মার যে কি হইল, এমুন শিবের মতন মানুষকে থুইয়া চইলা গেলা!

অনাদি ঠাকুর সংবাদ শুনে মুহূর্তে ছুটে আসে। ভূমিকম্পে মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও যে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে; একি করলে ঠাকুর।

অনাদি, তুই বিয়ে করেছিস? ঠোঁটে হাসি টেনে ওদের সামনে হাল্কা হতে চেষ্টা করে অশোক। কিন্তু কণ্ঠে যেন খান খান হয়ে বাজে প্রবল ঔদাসীন্যের সুর।

অনাদি লজ্জাই পায়। বাবু যেন কি! দুঃখের মধ্যেও হেসেই ফেলে ও।

ও কিরে, হাসছিস্ কেন ? কতদিন বিয়ে করেছিস ?

বিয়াত আমার হয়নি বাবু।

কেনরে ?

টেকা কোথায় পামু, তিন কুড়ি টেকা চাইচে ম্যায়ার বাপে।

অঃ, এই কথা ? তা বেশ, এইনে দু'শ টাকা। ও থেকে মেয়ের বাপকে তিন কুড়ি দিবি, বাকীটা অন্য খরচের জন্য। আর এক কাজ কর, কাল রেলে খাট দু'খানা, বিছানা, টেবিল, বাসন কোসন সব বাড়ী পাঠিয়ে দে, বিয়ের আগে ওগুলো দরকার হবে।

অনাদি চোখ বিস্ফারিত করে তাকায় অশোকের দিকে। বাবু বলছে কি! ওর চৌদ্দপুরুষ কেউ কখনো এরকম খাট বিছনায় শোয়নি, লোকে চোর ভাববে না!

অনাদির পর এবার লক্ষীর মার পালা, বুড়ীদি, তোমার তো তিন কুলে কেউ নেই জানি, তুমি আর জিনিসপত্র দিয়ে কি করবে, এই দু'শ টাকা রাখ। আর ধুতি ক'খানাও নাও—পরতে পারবে। নিজের সুটকেশ গুছাতে গুছাতে প্রায় খান দশ বারো চুল পাড় ধুতি লক্ষীর মার উদ্দেশ্যে মেঝের ওপর রাখে।

আঁচলে চোখ মুছেই টাকা দু'শ হাত বাড়িয়ে নেয় লক্ষীর মা।

ঠাকুরকেও দু'শ টাকা দেয় অশোক। টুকি টাকি আর যা জিনিস রইলো তাও সকলকে ভাগ করে নিতে উপদেশ দেয়। ড্রয়ারে রেবার গহনাগুলো রয়েছে। একবার ভাবে, ওগুলোও ওদের দিয়ে দেয়। আবার ভাবে, না, ওগুলোতে ওর কোন অধিকার নেই। রেবা হয়তো অভিমান বশে নেয়নি। তবু যদি কোন দিন দেখা হয় ওর জিনিস ওকেই ফিরিয়ে দেবে। গহনাগুলো সুটকেশেই রাখে অশোক।

সুটকেশ গুছানো হয়ে গেলে অনাদি ছোট্ট বিছানাটা হোল্ডলে পুরে দেয়। সাজানো সংসার মুহূর্তে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। দুঃখ কি,

মানুষকে তো একদিন এভাবেই সব কিছু ফেলে যেতে হবে। বৃথা মায়া বৃথা আপন পর।···

অনাদিকে লক্ষ্য করে অশোক উদাসভাবেই আদেশ করে, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়তো অনাদি।

অনাদি দেয়ালে ঝোলানো গিটারটা পাড়ছিল। আর কিছু না হোক অন্তত এটা বাবুর সঙ্গে দেবেই। অশোক সেদিকে লক্ষ্য করে পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে, ওটা কি হবে রে!

বিছানার সঙ্গে বেঁধে দিই?

নারে, আমি অনেক দূরে যাচ্ছি, ওসব ঝামেলা পোষাবে না। তা তুই বাপু এক কাজ করিস, ওটা কোন এক বাজনার দোকানে দিয়ে দিস, কিছু টাকা পাবি।

না বাবু, এটা আপনি নিয়ে যান। আপনি যে রোজ বাজান, বলতে বলতে কেঁদেই ফেলে অনাদি।

দূর বোকা কোথাকার, কাঁদছিস কেন? ওটা আর একটা এমন কি জিনিস? মিছিমিছি রাস্তাঘাটের টানাপোড়েনে ভেঙে যাবে, দরকার মতো আমি আর একটা কিনে নেবো। তোকে যা বললাম তাই করিস।

অনাদি আঁচলে চোখ মুছে ট্যাক্সি ডাকতে বেরিয়ে যায়। লক্ষীর মাও আঁচলে চোখ মোছে। সময় আর নেই, এইবেলা দু'মুঠো না খাওয়ালে বাবুর আর খাওয়া হবে না। ধরা গলায় পুনরায় অনুরোধ করে লক্ষীর মা, সমস্ত দিন গেল, কিছু খাও দাদাবাবু!

না বুড়ীদি, এখন আর কিছু খেতে পারবো না, গাড়ীর সময় হয়ে গেছে। তোমরা সকলে খেয়ে নিও।

লক্ষীর মা'র মুখে আর ভাষা জোটে না। উড়িয়া ঠাকুরও হতভম্বের মতোই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারও দুচোখে আষাঢ়ের মেঘ জমেছে। ট্যাক্সি এসে দোরে লাগে।

তাহলে আসি বুড়ীদি, ঠাকুর চললেম। তোমাদের কত সময় কত কী বলেছি, মনে কিছু করো না।

লক্ষ্মীর মা গড় হয়ে প্রণাম করতে যায়। অশোক তাড়াতাড়ি তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে বাধা দেয়, তুমি করো কি বুড়ীদি? আমার যে মহাপাপ হবে, তুমি আমার মায়ের বয়সী।

অনাদি বিছানা সুটকেশ গাড়ীতে তুলে দিয়ে প্রণাম করে। ট্যাক্সি ছুটে চলে, পেছনে পড়ে থাকে অশোকের সংসার।

সুলালের চিঠিটা রেবা ডাকে ফেলে দেয়, তাই তা পেতে বিকেল হয়েছিল। কিন্তু হেনার চিঠিটা অনাদিকে হাতে পৌঁছে দিতেই বলে গিয়েছে রেবা। ও চলে যাবার পরেই যেন পৌঁছে দেয়। অনাদি মার কথা পুরোপুরিই রাখতে চেষ্টা করেছে। ঠিক সময়েই চিঠি নিয়ে হেনার কাছে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ হেনার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাসায় ছিল না হেনা। দিল্লী থেকে মাত্র ক'দিন এসেছে, কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। চিঠিটা দরোয়ানের হাতেই রেখে আসে।

হেনার হাতে যখন চিঠি পৌঁছে তখন সব শেষ। তাজ্জব ব্যাপার, রেবাদি দেখা না করেই চলে গেলো! কিন্তু এতো যাওয়া নয়, স্মৃতির আঘাতে দগ্ধে যাওয়া। অমুদির জন্য রেবাদি চলে গেলো, হয়তো দিন ফিরে পাবে অমুদি। কিন্তু রেবাদির যে কিছুই রইলো না। অশোক-বাবু যেতে দিলেন! আশ্চর্য পুরুষের মন।···রেবার নির্দেশ মতো অসীমাকে তাড়া দেয় হেনা। এক্ষুনি গিয়ে অশোকবাবুকে আগলাতে হবে। কবি মানুষ, কিসে কি করে বসে! রেবাদির ওপর রাগ করে হয়তো পালিয়েই যাবেন কোন দিকে। অমুদি হাজির হলে কিছুতেই আর পালাতে পারবেন না। কিন্তু অমুদিই কি এই মুহূর্তে রাজী হবে!

যে রকম অভিমানিনী মেয়ে, অশোকবাবু নিজে এসে না নিয়ে গেলে কিছুতেই রাজী হবে বলে মনে হয় না। সংশয়ে দুলতে দুলতে কথাটা গোপন রেখেই অসীমাকে নিয়ে মোটরে করে ছোটে হেনা।

পাখী উড়ে গেছে, শূন্য নীড়। কলিং বেল টিপতেই অনাদি ছুটে এসে দোর খুলে দেয়। তার ঔৎসুক্য, বাবু হয়তো ফিরে এলেন কিংবা মা। কিন্তু হেনাকে দেখে মুষড়ে পড়ে।

হেনা ব্যস্ত সমস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করে, তোমাদের বাবু কোথায় অনাদি?

বাবু তো নেই দিদিমণি, দুইজনেই চইলা গেছে। আর একটু আগে আইলেও বাবুর সঙ্গে দেখা হইত। আঁচলে চোখ মোছে অনাদি!

হেনা গাড়ীতে ফিরে আসে। অসীমা পাথরের মতো চুপচাপ বসে আছে গাড়ীতে। সদরের ফলকে লেখা আছে অশোকের নাম। অসীমার বুঝতে বাকী থাকে না, হেনার কেন এই ছুটে আসা। লজ্জায় ধুলোর সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। কি দরকার ছিল এভাবে গায়ে পড়ে অপমানিত হবার? যদি ভালবাসাই না রইলো তাহলে মিছে ও কারো পায়ের তলায় মাথা কুটবে না। গাড়ী নিয়ে বাড়ীর দিকেই রওনা হয়।

৩৪

প্রায় পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হতে চললো অশোক নিরুদ্দেশ হয়েছে। রেবারও আর কোন খোঁজ নেই। সুপ্রভা বছর তিনেক হ'লো মারা গেছেন। অসীমা সেই যে নিষ্ফল হয়ে অশোকের দোর থেকে ফিরে এলো—সে আঘাত আর সহ্য করতে পারলেন না সুপ্রভা। তিলে

তিলে বছর দুয়েকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেলেন। সংসারে মা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না অসীমার। তবু তাঁকে হারিয়ে বেশী কাঁদলে না ও। সমস্ত অন্তর যেন পাষাণ হয়ে গেছে। নিজের দুঃখ কষ্টের চেয়েও মার দুঃখ অপমানই ছিল অসহনীয়। মা মুক্তি পেলেন, ও হাঁফ ছেড়েই বাঁচে।

সুপ্রভার মৃত্যুর মাস কয়েক আগেই হেনার বিয়ে হয়। অসীমাকে রেখে সুলাল কিছুতেই হেনার বিয়ে দেবে না, কিন্তু সুপ্রভা নাছোড়বান্দা। একজনের দুর্ভাগ্যের জন্য আর একজন খেসারত দিতে পারে না। অসীমা তো জীবনে আর কারো গলায় মালা দিতে পারবে না। তাছাড়া পড়াশুনোর মধ্যেই ডুবে থাকতে চায় ও। পৃথিবীতে কি বিয়েটাই সব? কত জানবার, কত দেখবার রয়েছে। এমনও তো নজীর আছে, কত বিদুষী মহিলা আজীবন তপস্বিনী থেকেছেন।...

হেনা বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ী গেল। রমেনের সঙ্গে অনেক আগেই কথাবার্তা পাকা ছিল, শুধু বিলেত থেকে ঘুরে আসার অপেক্ষা। রিভার ইঞ্জিনিয়ারিংএ ডিগ্রী নিয়ে যথা সময়েই ফেরে রমেন। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরিতেও বহাল হয়। হেনা এখন নয়া দিল্লীতেই আছে। বছরে দু' একবার দেখা হয় সকলের সঙ্গে। সুলাল অসীমাও বার তিনেক দিল্লী থেকে ঘুরে এসেছে। হেনার ছেলেটি রমেনের মতোই ফুটফুটে হয়েছে। সুখের সংসার।

অসীমা এবার বি. এ. পাশ করলে। শুধু পাশ নয়, ইংরেজীতে আনার্স'ও পেয়েছে। এর জন্য সুলালের কাছে ও ঋণী। দেশে যদি ইট পাথর আগলে পড়ে থাকতো তাহলে বোধ হয় সারা জীবন শুধু কেঁদেই কাটাতে হতো। অন্তরের মণিকোঠায় যে কাঁটা ফুটে আছে সময় সময় তার দংশন অনুভূত হয়। কিন্তু সে তো শুধু ক্ষণিকের মর্ম-বেদনা। বইয়ের

মারফৎ পৃথিবীর এ রকম কত সুখ দুঃখের সঙ্গে আজ ও পরিচিত। অজয়কে পায়নি সে আঘাত নির্মম হলেও সামান্যই। দুঃখকে কেন্দ্র করেই তো পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সে সাহিত্যে মন দিতে পারলে আত্মজয় করতে কতক্ষণ? হেনা কাছে থাকলে বাহ্যিক আরো একটু হাল্কা থাকতে পারতো। কিন্তু জীবনটা তো আর শুধু হাল্কা রসেই পূর্ণ নয়! একটা কোন কাজের মধ্যে ডুব দিতে পারলে অলক্ষ্যেই একদিন সব শেষ হয়ে যাবে। অর্থাভাব না থাকলেও অসীমা সেই কাজই খুঁজে বেড়ায়। দেশময় রয়েছে অশিক্ষা আর দারিদ্র্য। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তো শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। অসীমা একটি নার্সারী স্কুল খোলে। পিতৃ পিতামহের অর্থ এ বিষয়ে সাহায্য করে ওকে। সুস্থ পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে বিদ্যালয় গৃহ। শুধু নীচু ঘরের ছেলে মেয়েরাই স্থান পাবে এখানে। যাদের খাদ্যাভাব রয়েছে, যারা আবর্জনার মধ্যে খাবি খাচ্ছে, ওর ইচ্ছে কেবল মাত্র তাদেরই গড়ে তোলা। সুলাল প্রাণপণে সাহায্য করছে। সুরমা বৌদিও যোগ দেন ওর সঙ্গে। বছর খানেক হ'লো হেনার অভাব পূরণ হয়েছে সুরমার সান্নিধ্যে। বাড়ীতে দাস দাসীর অভাব নেই, তাই সুরমাও সোৎসাহেই বেছে নিয়েছে এ কাজ।

কাজ যত এগুচ্ছে অভাব যেন ততো বাড়ছে। হাজার হাজার দুস্থ নরনারী হাজির হচ্ছে এসে তাদের সন্তান সহ। কোন ঝামেলা নেই, একবার ভর্তি করে দিতে পারলেই উৎকৃষ্ট খাদ্য আর পোষাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। সেই সঙ্গে সুশিক্ষা। সাধ্য মতোই ভর্তি করে নেয় অসীমা, তবু দোর গোড়ায় দিবা রাত্র চলে কপাল ঠোকাঠুকি। দারিদ্র্যে আছন্ন দেশ, সরকারী ব্যবস্থা ছাড়া সাধ্য কি ওর সকলকে স্থান দিতে পারে। তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। বছর খানেক মাইনে করা শিক্ষয়িত্রী রেখেই চালালে। কিন্তু ভাড়াটে লোক নিয়ে কিছুতেই এগুনো যাচ্ছে না।

পদে পদে কেবল জটিলতাই বাড়ছে। সুলালের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে, নিজেই ও বিলেত যাবে ট্রেনিং নিতে। হ্যাঁ, বছর খানেকের মধ্যেই যাবে। কাজ করতে হলে নিজের সব কিছু জানা থাকা দরকার। বছর খানেক হয়তো থাকতে হবে। ঘুরে দেখতে হবে লণ্ডন, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশ। সম্ভব হলে ও দেশের ছেলে মেয়েদের মতোই এ দেশের ছেলে মেয়েরাও সবল সুস্থ হয়ে গড়ে উঠবে। সকলেরই থাকবে সুস্পষ্ট নাগরিক জ্ঞান। জীবন সমুদ্রে সকলেই খুঁজে পাবে চলার পথ। সুলালের সহযোগিতায় এক বছর সুরমা বৌদি স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিতে পারবেন। আশ্চর্য মেয়ে সুরমা। সখ আহ্লাদ যেন কিছুই নেই। স্বামী যাঁর মোটা রোজগার করেন, অর্থের প্রাচুর্য যাঁর সংসারে উছলে পড়ছে, তাঁর এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই। সাদা-সিদে ভাবে চলেন, সূক্ষ্ম চিন্তা করেন। আর তা না হবেনই বা কেন? কত বড়ো বাপের মেয়ে। জন্ম থেকেই তো দেখে আসছেন দেশ ও দশের সেবার আদর্শ। সুরমাকে পাশে পেয়ে অসীমা নিজকে ভাগ্যবতীই মনে করে। এই তো বেশ আছে, কি হবে ঘর সংসার দিয়ে ?...

কোলকাতা ছেড়ে অশোক প্রথমেই যায় ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বরের পথেই রেবাকে ও কুড়িয়ে পেয়েছিল। কে জানে, সেখানেও আশ্রয় নিতে পারে। সেই খণ্ড গিরির পথ, সেই বাংলো তন্ন তন্ন করে খোঁজে। অবুঝ মন প্রবোধ মানে না। নয়তো যে ছেড়ে গেছে সেকি কখনো চেনা জায়গায় আশ্রয় নেবে! মান অভিমান তো অনেক দিন হয়েছে কিন্তু এমন ভাবে আঘাত তো কখনো দেয়নি। ঘরের কোণেই আবদ্ধ থেকেছে স্বপ্নচারিনী। হয়তো দুদিন কথাই বন্ধ, খেলেই না এক বেলা, তাই বলে চলে যাবে? বড় আঘাত পেয়েছে বেচারা। ওতো জানলে না, কবি অশোক ওকে লুকোবে বলে লুকোয়নি। অসীমার

সঙ্গে অজয়ের ভাব, সে তো ছিল পুতুল খেলা। হয়তো ঘর বাঁধলে সুখেই কাটতো। কিন্তু দুর্বার নিয়তি, তারপর তো সারা মনটাই হয়ে গেল দেউলিয়া। দাবার ছকে শুধু হারই হ'লো।

অসীমা তলিয়ে গেল, রেবা পেলো অন্তর জুড়ে আসন। হ্যাঁ, অন্তর জুড়েই তো। মনকে তো আর জোর করে বসে আনা যায় না। তাই যদি হবে, তাহলে তো রেবা উধাও হয়েছে, অসীমাকে নিয়েই ঘর বাঁধতে পারে। কিন্তু তা পারছে কই! বুকখানাকে যে খালি করে দিয়ে গেছে পাষাণী।

ভুবনেশ্বরের স্মৃতি পলকে পলকে মনকে দংশন করছে। বাংলোটা খালিই পড়ে রয়েছে। মাস খানেকের জন্য ভাড়া নেয় অশোক। কিন্তু দু'রাত্র বাস করেই হাঁপিয়ে ওঠে। ঘর দোর থেকে আরম্ভ করে মায় দেবদারু গাছগুলোও যেন ওকে দেখে বিদ্রূপ করছে। গৃহলক্ষ্মীই যদি না রইলো তবে আবার ঘর বাঁধবার সাধ কেন? বৃদ্ধ মালী রুহিদাস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু ওর মা'র কথাই জিজ্ঞেস করলে। ওকে যেন ওরা কেউ চেনেই না। অশোক পালিয়ে পুরী আসে। সমুদ্রের তীরে তীরে দু'বেলা খুঁজে বেড়ায় রেবাকে। প্রভু জগন্নাথের মন্দিরে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে অগণিত দর্শনার্থীর পানে। কিন্তু যে মুখ ও খুঁজছে সে মুখ কই? না না, জগন্নাথ দেখতে ও আসেনি, সমুদ্রের ঢেউ গুনতেও নয়। প্রাণের আবেগে ছুটে চলে, গোপালপুর, ওয়ালটিয়ার, ভিজাগাপত্তম—দাক্ষিণাত্যের পথে মন্দিরে। শিল্পকলা আর স্থাপত্য কলা দেখে দেখে যে চোখ পাথর হয়ে চললো। জীবনে কি আর রেবার সঙ্গে দেখা হবে না? আবার ঘুরে আগ্রা, কাশী, বৃন্দাবন, লাহোর, দিল্লী; ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। অগণিত অর্থব্যয়

আর শারীরিক পরিশ্রমে ঝিমিয়ে পড়ে অশোক। কাব্য লক্ষ্মীও সময় বুঝে পিঠটান দিয়েছেন। জীবনে শুরু হয়েছে চরম বিপর্যয়। বিরহিনী প্রিয়াকে স্মরণ করেই তো 'মেঘদূত' রচিত। ও যদি এক জায়গায় বসে ছুটো কবিতাও লিখতে পারতো! তাজমহলের দিকে তো অনেকক্ষণই চেয়ে দেখেছে, রামগিরির নির্বাসিত যক্ষের ধ্যানেও মগ্ন হতে চেষ্টা করেছে, তবু আত্মার সান্ত্বনা কোথায়? রেবা কি মায়াবিনী?… লক্ষ্ণৌতে বাইজীর নাচ দেখলো। বিলোপ কটাক্ষে হিল্লোল তুললে হীরা বাঈ। হরিদ্বারে সাধু দর্শনও হ'লো, কিন্তু চোখ বুঝলে যে রেবাকে ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। একি হ'লো ওর!…

* * *

দেওয়ান শিবদাস মারা গেছেন ছু'বছর। এই ছু'বছর চলেছে নিদারুণ অর্থাভাব। নিয়মিত টাকা পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। একটার পর একটা বিক্রি করেই চলে অশোক, জলের দর। এখন আছে শুধু ভিটেমাটি আর সামান্য কিছু জমিদারির অংশ। জীবনে তো সবই যেতে বসেছে, ভিটে মাটিও যাবে। কিন্তু মন যে তবু বশে আসছে না। পৈত্রিক ভিটে বিক্রি করবো? না করে উপায়ই বা কি? অশোকের চরম ছুরবস্থা। যে কথা স্বপ্নেও ভাবেনি আজ সেই কথাই ভাবতে হয়। একটা চাকুরি জুটলে হয়তো বাঁচতো ও। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে চাকুরি দেবে কে? কি এমন যোগ্যতা আছে ওর?…

ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় সত্যি এবার সুপ্রসন্না। সামান্য চেষ্টায় চাকুরি পেয়ে যায় অশোক। বোম্বের 'আর্ট-পিক্চার্স' অশোকের মতোই একজন বাঙালি সাহিত্যিককে খুঁজছিলেন। যুগপৎ হিন্দি এবং বাংলা ছবি তুলবেন ওঁরা। মাস হাজার টাকা মাইনে আর ফ্রি কোয়াটার নিয়ে বোম্বে ছোটে অশোক। সেই ভাল, যত দূরে যাওয়া যায় যত চেনাশুনো লোকের নাগালের বাইরে। প্রথম বই শুরু হয়, 'মনের দাবি'।

রেবা এই মনের দাবি পড়েই প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল। যদি বেঁচে থাকে তাহলে একদিন দেখবে, অশোক ওর ভাল-লাগা গল্পকেই সর্বপ্রথম ছায়ারূপ দিয়েছে। যদি প্রাণ চায় তা হলে সেই সূত্র ধরেই আবার ও ওর প্রিয় কবির সন্ধান পাবে। রুপোলী পর্দায় জ্বল জ্বল করে জ্বলবে, পরিচালনা, কাহিনী ও সংলাপ—অশোক রায়। রেবার ভুল হবার নয়। শিল্পী অশোকের প্রতিটি কথা ওর অন্তরে গাঁথা। প্রাণপাত পরিশ্রম করে এগিয়ে চলে অশোক। স্টুডিওতে যতক্ষণ থাকে—বেশ থাকে। কিন্তু কোয়াটারে ফিরলেই বুকের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে। প্রাণের ভেতর কে যেন বিলাপ করে কাঁদতে চায়। মালিক পক্ষ সেবা যত্নের জন্য একজন পরিচারক দিয়েছেন। শিল্পীকে তাঁদের খুব মনে ধরেছে। কি না জানে অশোক ? ভাল লিখতে পারে, সুর দিতে পারে, বাজাতে পারে। ছায়া ছবির শ্রেষ্ঠ অঙ্গগুলো সবই ওর নখদর্পণে। একমাত্র ফটোগ্রাফীতে নিখুঁত জ্ঞান নেই। তা না থাক, তার জন্যে তো রয়েছে আলাদা আলাদা লোক। সবচেয়ে বড় নিজের চোখ। সে চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। সমতা রক্ষা করেই এগিয়ে চলেছে কাজ।

ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মীও বাসা বাঁধে অশোকের মনে। রেবাকে ভুলতে গিয়ে অশোক আলিঙ্গন করে চিরকালের সন্তাপহারিণী সুরা পাত্রের সঙ্গে। ভুলে থাকবার মতো এমন মৃতসঞ্জীবনী জগতে বোধ হয় দ্বিতীয় আর নেই। বোতল বোতল মদই এখন অশোকের নিত্যসঙ্গী। আহার নেই, নিদ্রা নেই, অবসর পেলেই বই আর মদ নিয়ে ডুবে থাকা। মনিব জয়রামদাসজী অনুরোধ করেন, ক্ষোভ জানান, কিন্তু ফল হয় না। কারবারী হিসেবে শিল্পীকে চটানো তাঁর ধর্ম নয়। সেটের কাজ নিয়মিতই চলেছে। স্টুডিওতে কোনরূপ গোলমাল করে না অশোক।

যথাসময়ে "মনের দাবি" প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। বোম্বাই শহর দর্শকে ভেঙে পড়ে। কোলকাতা, মাদ্রাজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জয়রামদাসজীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সাতগুণ ফেঁপে ওঠে। অশোককে মোটা রকমের অতিরিক্ত পুরস্কার দিতেও কার্পণ্য করেন না শেঠজী। বিরাম-বিহীন চালাতে হবে স্টুডিওর কাজ। আজ হলে কাল নয়, এমনি তাড়া। কলের পুতুল যেন মানুষ, সুইস টিপলেই চলবে।···

প্রচুর পয়সা আসে অশোকের, সঙ্গে এসে জোটে প্রচুর মদ। শুভ উদ্বোধনের দিন থেকে নিয়মিত প্রতিটি শো'তে বোম্বের সব হলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছে অশোক। কিন্তু কোথাও রেবার সঙ্গে দেখা হয় না। পৃথিবী কি দু-ফাঁক হয়ে গিলে খেয়েছে রেবাকে? তাই যদি হয় তবে আর মিছে ভাবনা কেন? এইতো মৃতসঞ্জীবনী সুধা রয়েছে—সর্বদুঃখহারিণী। পাত্রের পর পাত্র, বোতলের পর বোতলে ডুবে যায় অশোক। প্রয়োজক ভয় পেয়ে যান! অল্পদিন মদ ধরেছেন বাবু সাহেব, সইতে পারবেন তো?···এ অলক্ষুণে পথে অনেককেই তো তলিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে।···

৩৫

বোম্বের—"আইডিয়াল হোম"। ডাক্তার ভট্টাচার্য—ইউরোপ ঘুরে এসে খুলেছেন এই সেবা সদন। যে সমস্ত রোগী হাসপাতালে যেতে ভয় পায় অথচ যাদের গৃহ-চিকিৎসার সুযোগ নেই, তাদেরই জন্য এই চিকিৎসা কেন্দ্র। ব্যবসায়ী বুদ্ধি কিছুটা আছে, তবু আর্তের সেবায় বোম্বের আডিয়াল হোমের নাম সুপ্রসিদ্ধ। রুগ্নমানুষ এখানে আসতে ভয় পায় না। অসুস্থ অবস্থায় গৃহে থেকে সমস্ত পরিবারকে জ্বালাতন করা অপেক্ষা শান্তিপ্রিয় রোগী মাত্রই এখানে ভর্তি হবার জন্য উন্মুখ।

এখানকার ডাক্তাররা কর্তব্যপরায়ণ, নার্সরা মমতাময়ী। রেবা এক সময় এই নার্সিং ট্রেনিংই নিয়েছিল। কিন্তু সেবায় আর মন দিতে পারলো কই? একটার পর একটা স্বপ্ন-দোলা জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। অসীমা বাধা হয়ে না দাঁড়ালে হয়তো সুখ-স্বপ্নেই কেটে যেতো সারা জীবন। কিন্তু স্বপ্ন তো আর স্থায়ী হয় না! তাসের ঘর ভেঙে গেছে। অশোককে তো দুরের কথা, সুলালকে পর্যন্ত না জানিয়ে এই আইডিয়াল হোমে চাকরি নিয়েছে রেবা। অশোক হাসপাতালে থাকতেই চলেছিল যোগাযোগ। তারপর দিন কয়েকের অভিনয়, তারপর চির বিদায়।

পাঁচ বছর কায়মনোবাক্যেই সেবা করে চলেছে রেবা। ডাক্তার ভট্টাচার্য ওর সেবা যত্নে মুগ্ধ। নার্সদের মধ্যে রেবার স্থান সর্বোচ্চে। বুড়ো ভট্টাচার্যের মা রেবা,—তিনি ওর সন্তান। সংসারে হাজার হাজার স্বার্থপর মানুষের মধ্যে এমনিধারা দু'চারটি মানুষ আছে বলেই হয়তো সংসার চলছে। বোম্বের অধিবাসী সামান্য মাত্র অসুস্থ হলেও 'আইডিয়াল হোমে' যাবার জন্য ব্যস্ত। এতো আর ডাকাতদের হাসপাতাল নয় যে মানুষ ভয় করবে? এ শান্তির নীড়, এখানে দু'দিন বিশ্রাম করে দেহ মনকে সজীব করে তোলা যায়।

অশোকের কথা রেবার অহরহ মনে পড়ে। ভাবনাই হয় খেয়ালী কবির জন্য। এক সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে। তাছাড়া হৃদয় জুড়েই তো বসে আছে অশোক। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে থাকেলেও বাইরে তার প্রকাশ নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, এদণ্ড স্বেচ্ছায়ই নিয়েছে ও। অশোককে উপহার দিয়েছে অসীমাকে। সুখী হোক দুখিনী নারী। ভালবাসা, সেতো আর শুধু দেহের কামনা নয়? অশোককে ভাল না বাসবে কে? ওর কবিতা, গান, উপন্যাস, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই তো রয়েছে ভালবাসার বীজ। রক্ত মাংসের আশোক হারিয়ে যাক,অন্তর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পাক কবি আর তার

কাব্য। রেবা কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, অবসর মুহূর্তে স্বপ্নাবিষ্ট হয়। কবিকে নয়ন সন্মুখে দেখবার জন্যও সময় সময় চাঞ্চল্য আসে অন্তর মানসে। কিন্তু সংযমের বাঁধ কখনো শিথিল হয় না। ওতে যে অশোকের অকল্যাণ হবে, অসীমার পড়বে দীর্ঘশ্বাস! এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে একখানা চিঠি দিয়েও খোঁজ নেয়নি রেবা, ছুটেও কখনো যায়নি।

অশোক বোম্বে শহর ছবি দিয়ে মাতিয়ে তুলেছে, কিন্তু রেবার কাছে তবু অজ্ঞাতই রয়ে গেলো। রেবা তো আর ছবির জগতে নেই যে অশোকের সন্ধান পাবে। রেবা ডুবে আছে কাজে। আর্তের সেবাই এখন ওর জীবনের মূল মন্ত্র। রং ঢং আর ভাল লাগে না। একদিন ছবি দেখলে দুদিন দেখতে ইচ্ছে করে। তারপর আরো একদিন। এমনিই করেই তো মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়। না, ওঘাটে আর পা পড়বে না রেবার।

জয়রামদাসজীর তাড়ায় আবার শুরু হয় ছবি তোলার কাজ। অশোকের জীবনে হয়তো এই শেষ ছবি। কি হবে টাকা দিয়ে? টাকা যত পাচ্ছে মদের মাত্রা ততো বাড়ছে। তবু যদি ভুলে থাকা যেতো। মানুষের চিন্তায় মদ হয়তো একাগ্রতা আনে। কিন্তু সে একাগ্রতা ভুলে যাবার দিকে হলেও না হয় হতো, সুধা বলেই গ্রহণ করতো। কিন্তু এযে শুধু কালকূট বিষ। রেবার চিন্তাই পেয়ে বসে আরো গভীরভাবে। কোথা থেকে কোথায় চলে যায়! তবু মদ ছাড়তে পারে না অশোক। মদ বোধ হয় ওকে গিলে খেয়েছে।

এবারের ছবি "ইভা"। রেবা যে গল্প ওকে শুনিয়েছে সেই গল্পই ও উপহার দেবে দর্শককে। হ্যাঁ, পুরোটাই দেবে। যেখানে ইভা রেবা হয়ে মিশে গেছে অশোকের সঙ্গে। এক আত্মা এক প্রাণ। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধা সুর।

স্টুডিওর কাজ আবার চলেছে। অনেক বেছে বেছে বোম্বের

শ্রেষ্ঠ তারকা চিত্রলেখাকে নেওয়া হয়েছে ইভার চরিত্রে। কিন্তু কোথায় বা সে দেহের লাবণী, কোথায় বা সে দরদ? তবু যতটা সম্ভব হয়েছে। অশোক প্রাণপণ চেষ্টায় চিত্রলেখাকে বুঝিয়ে দেয় ইভার চরিত্র। কিন্তু চিত্রলেখা তবু তাল রাখতে পারে না। মোটর দুর্ঘটনার দৃশ্যের সে উদ্বেগই দেখা যায় না ওর মধ্যে। গান গেয়ে গেয়ে রেবা কত রাত্রে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ওকে, সে কণ্ঠই বা কোথায়? রেবার মতো ঠোঁট ফুলিয়ে ঝগড়াই কি করতে পারছে?···নিজের ভূমিকার নামকরণ অশোক না রেখে অজয় রেখেছে, নিজেই নিয়েছে সে ভূমিকা। কোথায় রেবা আর কোথায় চিত্রলেখা? কাঞ্চন আর কাঁচ। চিত্রলেখার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে অশোক নিজেও তাল রাখতে পারে না। পদে পদে হয় ছন্দ পতন। বিরক্তিতে বন্ধ করে দেয় কাজ। বোম্বাইয়ের সেরা অভিনেত্রী অপমানিতা হয়ে ফিরে যায়। কি তার কান্না। জয়রামদাসজী ফাঁপরে পড়েন। শিল্পীকে কিছু বলবার উপায় নেই। চিত্রলেখাকে দিয়ে যদি না চলে অশোকবাবু যাকে খুশি নিন। ইচ্ছে করলে খাস বাংলা থেকেও কাউকে আনতে পারেন। যত টাকা লাগে আপত্তি নেই।

বাসায় ফিরে অশোকের আত্মগ্লানিই উপস্থিত হয়। সামনে রয়েছে মদের গ্লাস, সত্যিই তো চিত্রলেখা কি করে বুঝবে ওর মর্ম বেদনা? বেচারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, তবু পারেনি। মানুষে মানুষে হুবহু মিল, তাও কি কখনো হয়?···রাত প্রায় দশটা অশোক ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হয় চিত্রলেখার বাড়ী। মদের ঝোঁকে খেয়াল হয় না, অভিনেত্রীর ঘরে এসময়ে যাওয়া উচিত হবে কি না। কিংবা আদৌ তাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব কি না। ভাবনা যেন সে কথা আমলই দেয় না।

বোম্বের সর্বশ্রেষ্ঠা চিত্রাভিনেত্রী চিত্রলেখা। চলনে বলনে হাঁটায় আভিজাত্যের ছাপ। ধনকুবেরদের মুনাফার একাংশ জিজিয়া করের

মতোই ফি মাসে অগ্রিম আসে ওর ঘরে। সমুদ্র সৈকতে ছবির মতো বাড়ী, দাস দাসী আসবাব পত্র। কতই বা বয়েস হবে? বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ। এক জীবনে গাড়ী বাড়ী হয়েছে। লোকে বলে, ব্যাঙ্কেও প্রচুর টাকা জমানো আছে। চিত্র জগতের তীর্থভূমি হলিউড একবার ঘুরে আসবে চিত্রলেখা। ইচ্ছে করলে জয়রামদাসজীর মতো নিজেও প্রয়োজক হতে পারে ও।

চিত্রলেখার মন আজ ভাল নেই। অপমানিতা হয়ে ফিরে এসেছে স্টুডিও থেকে। ভেবেছিল জীবনে আর কখনো ছবির কাজ করবে না। যদি করেও তবু অন্যের কেনা বাঁদী হয়ে আর নয়। কি দরকার ওর পয়সায়? যা জমেছে এবং ফি মাসে যা উপরি আসছে তাই খায় কে? কিন্তু শিল্পী অশোককে কিছুতেই ভুলতে পারে না। অভিনয় তো অনেক করেছে, এ রকম দরদ কোথাও দেখেছে কি? অভিনেত্রীর জীবনে শুধু পয়সাটাই সব নয়। পরিচালক অশোক রায় যদি আবার ডাকেন, নিশ্চয় যাবে ও। না ডাকলেও নিজে গিয়ে উমেদারী করবে। কত যত্ন নিয়ে শেখান ভদ্রলোক। না পারলে বকবেন এ আর এমন কি বেশী কথা?…চিত্রলেখা একাকী বসে বসে ভাবছিল। টেবিলের ওপর বইটা খোলা রয়েছে, কিন্তু মন নেই। সহসা অশোকের ট্যাক্সি হুঙ্কার ছেড়ে এসে সদরে দাঁড়ায়। টলতে টলতে গাড়ী থেকে নেমে আসে অশোক। চিত্রলেখার দেহরক্ষী মুসা সিং সদরেই দাঁড়িয়েছিল, অশোককে দেখে সেলাম জানায়।

গলার স্বর দীর্ঘ করে শুধোয় অশোক, চিত্রলেখা আছে?

জি হুজুর, আইয়ে।

টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতে থাকে অশোক। সোজা এসে উপস্থিত হয় চিত্রলেখার ঘরে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে

পারে না চিত্রলেখা। ফ্যাল ফ্যাল করে নীরবেই খানিক তাকিয়ে থাকে। অশোক জড়িত কণ্ঠেই উচ্ছ্বাস জানায়, তুমি রাগ করোনি তো চিত্রলেখা ?

না স্যার, রাগ করবো কেন ? আপনি তো আমাদের ভালর জন্যেই বলেন, বসুন ?

না, তা করবে বইকি ! চিত্রলেখা, আমার স্বপ্ন তোমাদের মধ্যে সার্থক হয় না, তাই রাগ হয়—তোমাদের গালাগালি করি। কিন্তু তোমরা কি করে জানবে আমার মনের কথা। সে যে শুধু স্বপ্ন, শুধু···জিভ জড়িয়ে যায় অশোকের।

আপনাকে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে স্যার।

হ্যাঁ—অসুস্থ ; আমি চলি। কাল তুমি স্টুডিওতে যেয়ো।

একটু বসবেন না ?

তোমার তো রাত হয়ে যাচ্ছে।

না, আমার কোন অসুবিধা হবে না। আপনি একটু জিরোন।

না চিত্রলেখা, আমি চলি। কাল তুমি স্টুডিওতেই যেয়ো।

প্রথম দিন এলেন, একটু কিছু মুখে দেবেন না ?

অশোকের হাসি পায়, মিষ্টিমুখ করাতে চাও তো ? কিন্তু মিষ্টিতে তো আমার রুচি নেই চিত্রলেখা।

আপনি যা আদেশ করবেন স্যার।

যদি মদ চাই, মদ দিতে পারবে ?

বেশ তাই হবে, চিত্রলেখা উঠে গিয়ে আলমারি খুলে এক বোতল হুইস্কি ও স্বচ্ছ একটা কাচের গ্লাস বার করে নিয়ে আসে।

অশোক তৃষ্ণার্তের মতোই বোতলটা টেনে নিয়ে ঢক ঢক করে খানিকটা খেয়ে নেয়।

চিত্রলেখা ব্যস্ত সমস্তভাবে বাধা দেয়, শুধু মদ খাবেন না স্যার, আমি খাবার আনছি।

তার আর দরকার হবে না, তুমি বোসো।

চিত্রলেখা হতবাক হয়েই অশোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অশোক আরো কয়েক ঢোক গিলে নিয়ে অনুরোধ করে, তোমার গানটা শোনাবে চিত্রলেখা ?

শুধু গলায় গাইব স্যার ?

হ্যাঁ, শুধু গলায়ই তো গাইবে। গাও, আর দেরি করো না।

চিত্রলেখা গাইতে থাকে —

আমি বেসেছি যে ভাল তোমার কবিতা
তাইতো তোমারে কবি—

আঃ, থাম থাম কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। পাগলের মতো পেট চেপে ধরে গড় গড় করে নীচে নেমে আসে অশোক। ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই ছিল, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উঠে পড়ে। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় ট্যাক্সি। চিত্রলেখা বিমূঢ়ের মতোই দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

৩৬

নূতন মদ ধরেছে অশোক, বোতল বোতল। কিন্তু সহ্য করবার শক্তি থাকা চাই। দ্রব্যগুণকে অস্বীকার করা চলে না। লিভারের বেদনা শুরু হয়েছে। পেট চেপে ধরেই চিত্রলেখার বাড়ী থেকে ফিরেছিল। কিন্তু এখন আর শুধু চেপে ধরে কুলোচ্ছে না। পাঁচ বছর অনিয়মিত ঘুরে বেড়িয়েছে, সময় মতো খায়নি ঘুমোয়নি। সহন শক্তি ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিকল হয়ে পড়েছে। এ রাত্রি বুঝি আর কাটে না। বছর খানেক

ধরেই চিন্‌চিনিয়ে বেদনা করতো। সোডা কিংবা অনুরূপ কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে এসেছে, কিন্তু আজকে ডবল ডোজেও চাপা পড়ছে না। লিভার পেকে উঠলো কি? রেবার জন্য আত্মঘাতী হলাম শেষটায়? রাক্ষুসী—মায়াবিনী।···ভাবনায় ভাবনায় আরো অস্থির হয়ে ওঠে অশোক। বোধ হয় এই সর্বপ্রথম রেবার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে। কাটা পাঁঠার মতো মেঝের ওপর দাপাদাপি করতে থাকে। ঘরে আর কেউ নেই। একমাত্র ভৃত্য রতনলাল সারা দিনের খাটুনীর পর পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো অসাড়েই ঘুমোচ্ছে বেচারা। কই এত দাপাদাপিতেও তো জাগছে না। রেবা হলে কি তা পারতো? কত বিনিদ্র রজনী শিয়রে বসে সেবা করেছে। রেবা কেন ডাইনী হতে যাবে! ওর প্রিয় কবিকে মুক্তি দেবার জন্যই না স্বেচ্ছায় দূরে সরে গেছে। রেবা—রেবা—ছটফট করতে করতে পেট চেপে ধরে খানিক নিশ্চুপ থাকে অশোক। সমস্ত জগৎ যেন বিদ্রূপ করছে আঙুল দেখিয়ে। বেহেড মাতালের আবার খ্যাতির দুরাশা! আবার মোচড় দিয়ে ওঠে তলপেট। অশোক জোরে ককিয়ে ওঠে। রতনলাল এবার জাগে। অশোক চিত্রলেখার বাড়ী থেকে ফিরেই তাকে ছুটি দিয়েছিল। অনেক রাতই এরকম খায় না বাবুসাব। রতনলাল স্বাভাবিক ভাবেই দু'চারবার অনুরোধ জানিয়ে নিজে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে অশোকের ঘরে এসে ভয়ে বিচলিত হয়ে পড়ে। এ লাইনের পরিণাম তার জানা আছে। বাবুসাহেবকে কতদিন যে বারণ করেছে, কিন্তু ফল হয়নি। দৌড়ে ডাক্তার ডাকতে যায় রতনলাল। আজকের রাতটা কোন রকমে চাপা দিতে পারলে কাল সকালে জয়রামদাসজীকে খবর দেওয়া যাবে। কাছে পিঠে তেমন ভাল ডাক্তারও নেই। তাছাড়া এই নিশুতি রাত্রে একা একা করাই বা যায় কি! রতনলাল ছুটে চলে, অশোকের শুরু হয় রক্ত বমি। মৃত্যু বিভীষিকায় ভীত ত্রস্ত। কে—

কে ! ওখানে দাঁড়িয়ে কে তোমরা ফিস ফিস করছো ? না না, মরতে আমি চাইনে—চাইনে, নিজের দুর্বল মনকে নিজেই কাকুতি জানায় অশোক।

ডাক্তার আসেন, সামান্য মাত্র ঘুম পাড়াবার ইন্‌জেকশন দিয়ে চলে যান। রতনলাল তাঁকে সারারাত থাকবার জন্য অনুরোধ জানায় ; কিন্তু কিছুতেই রাজী হন না ডাক্তার ভোঁসলে। বলেন, মিছিমিছি রাত জেগে লাভ নেই, সমূহ ভয়ের কোন কারণ নেই। রাতারাতি বিশেষ কিছু করারও নেই। স্বজন বিহীন এই দূর দেশে অশোক সত্যি আজ নিজকে অসহায় ভাবে। অনতিদূরে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের ভৈরব গর্জন। মৃত্যুর হুঙ্কার সেকি !···ভয়ে ভাবনায় ওষুধের গুণে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে অশোক। মুখ দিয়ে অবিরত গ্যাঁজলা উঠতে থাকে, দুর্গন্ধে রি রি করছে সমস্ত ঘর বাড়ী। রতনলাল বোধ হয় গত জন্মের কেউ ছিল ওর। দরদী মন নিয়েই সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। বাবুসাহেবের মুখখানার দিকে তাকানো যায় না, বড়ো করুণ ঐ মুখ-ছবি।

পরদিন সকালে খবর পেয়ে জয়রামদাসজী আসেন, সঙ্গে অশোকের সহকর্মী আরো দু'চার জন বন্ধু। জয়রামদাসজী মুষড়ে পড়েন। ব্যবসা তাঁর মাটি হতে চলেছে। তাছাড়া শিল্পীকে গভীরতম শ্রদ্ধাও করেন তিনি। ছোট ভাইয়ের মতোই ভালবাসেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে "আইডিয়াল হোমে" স্থানান্তরিত করাই স্থির হয়। বেলা প্রায় দশটা, অর্ধ চেতন অবস্থায় 'হোমে' এসে ওঠে অশোক। তলপেট তখনো চিন চিন করে বেদনা করছে। জয়রামদাসজীর আনুকূল্যে হোমের পরিচালক ডাক্তার ভট্টাচার্য—স্বয়ং অশোকের ভার নেন। আশা তিনি তেমন দিতে পারছেন না, কেননা, লিভার এবং হার্ট দুটোই "ব্যাড্‌লি

ড্যামেজড্।" তবু জয়রামদাসজীর অনুরোধ, সাধ্যমতো চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়।

'আইডিয়াল হোম' সাধ্যমতো সকলের জন্যই চেষ্টা করে থাকে শেঠজী, ডাক্তার ভট্টাচার্য বিনীতভাবেই আশ্বাস দেন।

তিন নম্বর কেবিনে আছে অশোক। নার্স মিস্ ডিসুজার নিয়ন্ত্রাধীন। ডাক্তার ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতো অনেক বেলা পর্যন্ত থেকে রোগীকে পরিচর্যা করেছে ডিসুজা। অশোকের গুণমুগ্ধদের মধ্যে ডিসুজাও একজন। মনের দাবির হিন্দি সংস্করণ—"দিল্‌কা পরওয়ানা" সাতবার দেখেছে ও। সত্যি নিখুঁত ছবি। প্রিয় শিল্পীর শোচনীয় পরিণতিতে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত হয়। কোয়ার্টারে ফিরতে প্রায় দুটো বাজে। রেবা এবং অন্যান্য সহকর্মিরা বিস্ময়ের সুরেই প্রশ্ন করে, কিরে, তোর আজ এতো বেলা হ'লো! খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মুখচোখ বিষণ্ণ করেই উত্তর দেয় ডিসুজা, আজ ভাই সত্যি দুঃসংবাদ। ডিরেক্টর অশোক রায় মুমূর্ষু অবস্থায় আমার কেবিনে এসে ভর্তি হয়েছেন।

রেবা চমকে ওঠে, কে! কার কথা বললি?

কেন, 'দিলকা পরওয়ানা'র ডিরেক্টর অশোক রায়। তোদের বাঙ্গালীই তো, তুই দেখিসনি ওঁর ছবি? ঐ যা. আমারই তো ভুল, তুইতো ছবি দেখিস না!

কে, কবি অশোক রায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কবি—ঔপন্যাসিক।

কি অসুখ রে, আমি যাচ্ছি, তুই খেতে বোস।

লিভার ট্রাবল। তোকে আর যেতে হবে না। মিস্ হেলেন রয়েছে, অক্‌সিজেন দেওয়া হয়েছে।

এ্যাঁ, বলিস কি ! রেবা ছুটে চলে তিন নম্বর কেবিনের দিকে।

ডিসুজা আর ওর বান্ধবীরা মিলে চোখ টিপে হাসতে থাকে। কিন্তু রেবার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অশোক অসুস্থ···অক্‌সিজেন চলছে··· দুরদুর করে কাঁপতে থাকে বুকের ভেতর। কেবিনে ঢুকেই পুনরায় ধাক্কা খায়। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে অশোক। ডাক্তার ভট্টাচার্য আবার কি যেন একটা ইন্‌জেকসন দিচ্ছেন। ইন্‌জেকসন শেষ করে রেবার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন ডাক্তার ভট্টাচার্য, এসময় তুমি এখানে মা !

অশোক আমার—

বুঝেছি, কিন্তু বড়ো লেট্।

ওকি বাঁচবে না বাবা ?

তোমার তো মুষড়ে পড়বার কথা নয় মা। রোগীর কোন অবস্থাতেই আমরা নিরাশ হই নে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আমরা যুঝে দেখবো।

আমিই ওর ভার নিতে চাই বাবা।

বেশতো, সেতো ভাল কথা। হেলেন, তুমি ওর ডিউটি করবে। হেলেন ধীরে ধীরে কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়, রেবার চোখে শ্রাবণের ধারা নামে।

ছিঃ মা, কাঁদতে নেই। আমার মন বলছে, অশোকবাবু ভাল হয়ে উঠবেন। এই চার্ট রইলো, আশা করি উনি এখন নীরবেই ঘুমোবেন। বাড়াবাড়ি দেখলে আমাকে খবর দিও, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান ডাক্তার ভট্টাচার্য।

ডাক্তার ভট্টাচার্য বেরিয়ে যান। রেবা অশোকের শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ইস্, কি হাল হয়েছে ! এক টুকরো পোড়া কাঠ যেন ! কেন ও অসীমার ওপর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলো ? আর

এমন মেয়েও তো কখনো দেখা যায় না, নিজের ধন নিজে আগলাতে পারে না। শক্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে কি অশোকের এমন হাল হতো?···না না, অসীমা হয়তো নাগালই পায়নি। অশোক তো বলতো, অঙ্ক কষে প্রেম হয় না। আমারই ভুল হয়েছে ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে আসা। শুনছি, বোম্বেতে ছ'মাস আছে অশোক। অন্তত এই ছ'টা মাস আগেও যদি দেখা হতো তাহলে কিছুতেই এমন করে তলিয়ে যেতে পারতো না।···বেদনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে রেবা।

রাত বারোটা। নিস্তব্ধ আইডিয়াল হোম। দশটার কাছাকাছি ডাক্তার ভট্টাচার্য অশোককে শেষ বার দেখে গিয়েছেন। জীবনহানির আশঙ্কা এখন আর তেমন নেই। তবু রেবার চোখে পলক পড়ে না। ঠায় বসে আছে শিয়রে। চার্ট মতো ওষুধ দিচ্ছে। অচেতন অবস্থায়ই হাঁ করে সে ওষুধ গিলেছে অশোক। চোখতো বুজেই আছে। কোলাহলময়ী বোম্বাই নগরী এখন ঘুমে অচেতন। অশোকও ঘুমোচ্ছে। ঘুমের তালে তালে বুকের ওঠা নামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটু শান্তিতে ঘুমোক বেচারা। কতরাত হয়তো বিনিদ্র গেছে। দু'দিন শান্তিতে ঘুমোতে পারলে আবার হয়তো সজীব হয়ে উঠবে। তাছাড়া অশোকে এখন কোনক্রমেই জাগনো উচিত হবে না। তেমন অবস্থায় ওর পক্ষে দূরে সরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে যানে, উত্তেজনায় যদি হার্ট ফেল করে। না না, এইতো অশোক অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। এক্ষুনি দূরে যাবার কি আছে? আর এই নিশুতি রাত্রে কার ওপরেই বা দিয়ে যাবে অশোকের ভার। ইজিচেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে রেবা সারা দিনের ক্লান্ত দেহখানি এলিয়ে দেয়। ঘুমে দু'চোখ বুজে আসে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। সহসা যদি বাড়াবাড়ি শুরু হয়? শেষটায় কি ওরই হাতে মারা যাবে অশোক? রেবা উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। নক্ষত্রে

নক্ষত্রে ছেয়ে আছে অনন্ত আকাশ। জ্বল জ্বল করছে শুক তারাটা। রেবার মনের দোর খুলে যায়। এমনি জানালার ধারে পাশাপাশি কতদিন দাঁড়াতো উভয়ে। অশোক হয়তো রাত জেগে জেগে আবৃত্তিই শুরু করলে, কিংবা গিটারে চললো সুরের মূর্ছনা। অশোকের হৃদয়ের সে প্রাচুর্য আর নেই। এ তো তার কঙ্কাল।...বেদনায় ছ'চোখ ছেপে জল আসে রেবার।

ভোরের পাখীরা শিস দিতে শুরু করেছে অশোক চোখ খোলে। সুদীর্ঘ ঘুমের পর চেতনা ফিরে এসেছে। কিন্তু সত্যি ও সচেতন কি? ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ও কে! গত জন্মের কেউ কি? একি স্বপ্ন! ছুর্বল বাহুতে চোখ রগড়িয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে অশোক। না না, এতো রেবাই! রেবা তাহলে বেঁচে আছে!···একটু জল, একটু জল, ককিয়ে ওঠে ক্ষীণ কণ্ঠ।

ভোরের মাদকতায় ছ'চোখ মাত্র বুজে এসেছিল রেবার, ধড়ফড় করে উঠে বসে। অশোক উদাস নয়নে তাকিয়েই আছে, সূর্য আর সূর্যমুখীর প্রথম দৃষ্টি বিনিময়। রেবা টিপয় থেকে জলের গ্লাসটা তুলে ঝুঁকে পড়ে অশোকের মুখের কাছে ধরে।

আবেগে উছলে পড়ে অশোক, সু তুমি বেঁচে আছ?

একি হাল হয়েছে? রেবা উঠে গিয়ে অশোকের শিয়রে বসে।

এইতো ভাল সু, অশোকের চোখে জল।

বেশী কথা বলো না অশোক, অনেক রক্ত উঠেছে।

তা উঠুক, তুমি আরো কাছে এসো—আরো কাছে, ছুহাতের মুঠোতে শক্ত করে চেপে ধরে অশোক রেবার হাত।

রেবা নীরবেই চেয়ে থাকে ওর মুখের পানে। ছুচোখে শ্রাবণের ধারা নামে।

দিন পনেরো "হোমে" থাকার পর অশোক এখন অনেকটা সুস্থ। রেবার হাতের সেবা শুশ্রূষা মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করেছে। বিকেলের দিকে এখন একটু একটু করে হেঁটে বেড়ায়। রেবা পাশেই থাকে। বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যেই চলতে হবে আরো কিছুকাল। একটু একটু করে ফিরে আসছে লিভারের শক্তি। হার্ট সতেজ হয়ে উঠছে। অশোকের সকল ভার এখন বেরার ওপর। ডাক্তার ভট্টাচার্য চার্ট বেঁধে দিয়েছেন। রেবা আর অশোকের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল উনি। অশোকের জন্যই ইউরোপ সফরের তারিখ একমাস পেছিয়ে দিয়েছেন। একটি শিল্পীর জীবন যদি রক্ষা হয় আনন্দেরই কথা। অশোকের কথা ভেবে অবাকই হন ডাক্তার ভট্টাচার্য। ওর মতো শিল্পী কেন এভাবে আত্মহত্যা করবে! রেবাই বা এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছে কেন? ...নাড়ী টিপে, বুকে নল বসিয়ে দেহের কথা জানবার অবকাশ থাকলেও মনের কথা সব সময় বোঝা যায় না। শুধু এইটুকু বোঝেন, রেবা আর অশোক অভিন্ন। রেবা না থাকলে অশোককে এত শীগগীর মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা যেতো না। রেবা ভিন্ন সম্পূর্ণ রোগ মুক্তিও সম্ভবপর নয় অশোকের।

জয়রামদাসজী আবার উৎসাহ বোধ করেন। অশোকও আবার স্বপ্নে বিভোর হয়। আর কদিন পরেই "ইভার" কাজ চালু করতে পারবে। চিত্রলেখাকে আর দরকার নেই। আগে কিছু বলবে না। সহসা রেবাকেই একদিন 'সেটে' টেনে নিয়ে যাবে। ছায়া আর কায়া একসঙ্গে মিশে যাবে। প্রচুর অর্থাগম হবে জয়রামদাসজীর। অভিনয়ের ভেতর দিয়েই মনের কথা খুলে বলবে রেবাকে। ওর যদি ইচ্ছে হয় সঞ্জীবনী সুধা

দেবে। বিষপাত্র দিতেও বাধা নেই। ঘটনার পর ঘটনার সংঘাতে জানাবে হৃদয়-ভার। পরিণতির যবনিকা রেবাই টানবে।

আশায় আশায় দিন গুনছে অশোক। একটু একটু করে ফিরে আসছে দেহের শক্তি। মাস খানেক উত্তীর্ণ হতে চললো, এখন তো অশোক নিয়মিতই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোয়। রেবা সঙ্গেই থাকে। জয়রামদাসজীর মোটরে করে সটান চলে আসে সমুদ্রের ধারে। খানিক চলে পদচারণা, তারপর বালুর ওপর এসে বসে দু'জনে পাশাপাশি। দুটি তৃষ্ণার্ত হিয়ার চলে ফিসফিসানি। গোধূলির বিহঙ্গ কূলায় উড়ে চলে। রংএর মেলা নীল সমুদ্রে। কবি প্রাণ দুলতে থাকে ঢেউয়ের তালে তালে। না না, ওতো মরতে চায় না। কেন মরবে? এইতো পাশে রয়েছে স্বপ্নচারিণী—জীবন-সুধা। আকণ্ঠই পান করবে অশোক। হ্যাঁ, সংসারে বেঁচে থাকতেই চায় ও। শক্ত মুঠোতে চেপে ধরে রেবার হাত।

অশোকের অবস্থা এখন প্রায় স্বাভাবিক। আর কিছুদিন এভাবে চললে হয়তো একেবারেই সেরে উঠবে। রেবা যখন ভার নিয়েছে তখন নিশ্চয় উঠবে। ডাক্তার ভট্টাচার্য নিশ্চিত হয়েই ইউরোপ সফরে যাচ্ছেন। পরশু তাঁর জাহাজ, ফিরতে হয়তো মাস পাঁচ সাত। তা যাক, রেবার এখন আর কোন শঙ্কা নেই। অশোক তো ওর কথার বাইরে কোন কাজই করছে না। সুবোধ বালকের মতোই নির্দেশ মেনে চলেছে। আশ্চর্য, অসীমা এমন মানুষকেও বাঁধতে পারলে না!…

জয়রামদাসজীকে আবার স্টুডিওর কাজে মন দিতে অনুরোধ জানায় অশোক। জায়গায় জায়গায় সম্পূর্ণ বদলে দিতে হবে পাণ্ডুলিপি। একবারে গোড়া থেকেই কাজ শুরু হবে। চিত্রলেখার দরকার হবে না।

অশোক নতুন লোক ঠিক করেছে। পয়সা দিতে হবে না, এ্যামেচার আর্টিস্ট।

মনে মনে হাসেন জয়রামদাসজী। এই একমাসেও কি উনি ধরতে পারেননি, কে সেই নতুন আর্টিস্ট। তবু মনের কথা মনেই চাপা রাখেন, সেতো ভাল কথা বাবুজী, তবে আপনার আরো কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।

বেশ, বিশ্রামে থেকেই আমি স্ক্রিপ্‌ট্ ঠিক করছি। আপনি 'সেটের' কাজ আরম্ভ করুন, কদিন পরেই স্যুটিং চলবে।

ভাল তাই হবে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি চলি। রাম রাম, খুশি মনেই বেরিয়ে যান জয়রামদাসজী।

অশোক স্বপ্ন রচে।

৩৮

বোম্বের জাহাজ ঘাট। দেশ বিদেশের জাহাজ ছাড়ে এখান থেকে। ডাক্তার ভট্টাচার্য আজ লণ্ডন যাচ্ছেন। রেবা অশোক তাঁকে তুলে দিতে এসেছে। যাত্রীবাহি জাহাজ কুইন এলিজাবেথ তীর থেকে কিছুটা দূরে নোঙর ফেলে প্রতীক্ষা করছে। যাত্রীরা একে একে এসে জমছে জেটিতে। ছোট লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে সকলকে "কুইন এলিজাবেথের" ওপর। বিকেল পাঁচটায় বন্দর ছেড়ে যাবে এলিজাবেথ।

অশোক রেবা ডাক্তার ভট্টাচার্যের গাড়ীতেই এসেছে। নগরীর আরো অনেকে আলাদা আলাদা এসেছেন তাঁদের প্রিয় ডাক্তারকে বিদায় দিতে। লণ্ডন সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবেই যোগ দিতে যাচ্ছেন ডাক্তার ভট্টাচার্য। প্রশান্ত-মুখ ডাক্তার সদানন্দ ভট্টাচার্য গাড়ী

থেকে নেমে সকলের সঙ্গে এসে জেটিতে দাঁড়ান। প্রিয়জনের সঙ্গে চলে অন্তরের ভাব বিনিময়। আর একটু পরেই তাঁকে বিদায় দিতে হবে। অশোকের ছ'চোখ সজল হয়ে ওঠে। তাঁর দয়াতেই নবজীবন লাভ করেছে ও। রেবার আশ্রয়দাতাও এই একনিষ্ঠ মানুষটি। পিতাপুত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে উভয়ের মধ্যে। কে জানে, আবার কবে দেখা হবে? রেবা যদি রাজি হয় তাহলে তো আর বোম্বে থাকা হবে না। এমনি করেই তো মানুষ আপন হতে পর হয়ে যায়। চোখের দেখা না হলে মনের দেখা ছ'দিনেই ম্লান হবে এ আর এমন বেশী কথা কি। ডাক্তার ভট্টাচার্যকে বিদায় দিতে বেদনাই অনুভব করে অশোক।

ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, হোল্ডল লঞ্চে উঠেছে, ডাক্তার ভট্টাচার্যও উঠতে যাবেন এমন সময় রেবা পেছন ফিরে বিস্ময় বোধ করে। কে ও, অসীমা না! সুলালদার পাশে উনি কে?...দেখতে দেখতে সুলাল, অসীমা, সুরমা জেটিতে এসে উপস্থিত হয়। রেবাকে লক্ষ্য করে সুলাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, রেবা তুমি?

হ্যাঁ, বাবা আজ লণ্ডন যাচ্ছেন, তুলে দিতে এসেছি।

অশোক ও ডাক্তার ভট্টাচার্য সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন, রেবার কণ্ঠস্বরে ফিরে দাঁড়ান। অসীমার চোখে চোখ পড়তে লজ্জায় মাথা মাটির সঙ্গে মিশে যায় অশোকের। তবে আজ আর কোনরূপ বিরক্তি আসে না। এক লহমায় বুঝে নেয়, বাল্যের সেই খেলার সাথীটি এখন আর কাদা মাটির পুতুল নেই। তার মুখে চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। সে আজ আর নিজকে শুধু মাত্র বিলিয়ে দিতেই জানে না। জীবন যুদ্ধে সেও আজ পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। নারী সুলভ স্বাভাবিক কমনীয়তার বদলে ইস্পাতে গড়া এক কর্তব্যের প্রতীক যেন। অশোক মাথা তুলতে পারে না।

অসীমার অনেক দিনের পুরোনো ক্ষতটা হঠাৎ কে যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে। বুকের ভেতর টন টন করে ওঠে বেদনায়। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের কাছে নিজে শক্ত হয়, কেন এ দুর্বলতা? ও তো কারো অনুগ্রহ প্রার্থী নয়? তবে অজয়কে নিয়ে ভাবনার কি থাকতে পারে? ···ভদ্রোচিত গাম্ভীর্য নিয়েই পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ায় অসীমা।

রেবা সকলের সঙ্গে ডাক্তার ভট্টাচার্যকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুলাল ওকে সুযোগ না দিয়ে নিজেই অশোককে প্রশ্ন করে, কবিকে যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, মানে···অশোক ইতস্তত করতে থাকে। ডাক্তার ভট্টাচার্য নিজেই উৎসাহী হয়ে শুধোন, এঁরা কে অশোকবাবু?

সুলালকে দেখিয়ে উত্তর করে অশোক, ইনি আমার কোলকাতার বন্ধু শ্রীসুলাল ব্যানার্জ্জি—বার-এ্যাট-ল। আর উনি—, অসীমার দিকে চাইতেই জিভ কেমন যেন জড়িয়ে যায় অশোকের।

অসীমা মুখ থেকে কথাটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে উত্তর করে, শ্রীমতী অসীমা চক্রবর্তী। কবির ছোট বেলার খেলার সাথী—এক গ্রামবাসী। আর উনি সুরমা বৌদি, সুলালদার স্ত্রী।

অশোক এবার মাথা তুলেই অসীমাকে চেয়ে দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রামের সেই সহজ সরল মেয়েটিই শহরের মাটিতে চটপটে হয়ে উঠেছে। রূপের সঙ্গে লেগেছে প্রগতির যাদুস্পর্শ। অশোক আবার এক ঝলক চোখ তুলে তাকায়। চোখাচোখিই হয়ে যায় এবার অসীমার সঙ্গে। দৃঢ় অথচ মমতায় ভরা দুটি হরিণ চোখ। ওই চোখ দেখেই একদিন মা ওকে পুত্রবধূ করতে চেয়ে ছিলেন। নিজের হাতে পরিয়ে দিতেন কাজল। সস্নেহে শির চুম্বন করতেন। আজ তো সে শুধু স্বপ্ন। তাসের ঘর ঝড়ে উড়ে গেছে। ঝড়ের পাখীও এবার উড়াল দেবে··· অশোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্নই দেখতে থাকে। ডাক্তার ভট্টাচার্যকে

দেখিয়ে রেবাকে পুনরায় প্রশ্ন করে সুলাল, ওঁর পরিচয় তো কিছু দিলে না রেবা ?

রেবা সহজভাবেই উত্তর করে, উনিই বোম্বের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সদানন্দ ভট্টাচার্য। এখানকার 'আইডিয়াল হোম' ওঁরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতের প্রতিনিধি হয়ে আজকে বিলেত যাচ্ছেন।

নমস্কার ডাক্তার বাবু, অমুও কুইন এলিজাবেথে করেই যাচ্ছে। আপনাকে সঙ্গী পেয়ে ওর খুব সুবিধে হ'লো, ভদ্রতাজ্ঞাপন করে সুলাল।

হাসতে হাসতেই প্রত্যুত্তর করেন ডাক্তার ভট্টাচার্য, ওটা উভয়তই সুলালবাবু। তুমি কি নিয়ে যাচ্ছ মা ? অসীমাকে শুধোন।

উত্তরটা সুলালই দেয়, ও শিশু শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করছে। নার্সারীতে ট্রেনিং নেওয়াই উদ্দেশ্য।

গুড্, এই তো চাই। এমনি করেই তো দেশ গড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না মা। চলো লঞ্চে ওঠা যাক। সুলালের উত্তর শুনে রেবা বিস্ময় বোধ করে। কিন্তু অশোক বোধ হয় তার মাপ কাঠিতে কিছুই নাগাল পায় না। অসীমা একা একা বিলেত যাচ্ছে! গ্রামের সেই ভয় কাতুরে মেয়েটি!…

সকলের প্রতি শেষ সম্ভাষণ জানান ডাক্তার ভট্টাচার্য।

অসীমা সহজভাবেই অশোকের নিকট বিদায় মাগে, নমস্কার কবি, আশীর্বাদ করুন যেন যাত্রা সফল হয়।

অশোকের ক্ষতস্থানে আবার টান পড়ে। কি আশীর্বাদ করবে ও ? সে অধিকার কি ওর আছে ? গম্ভীরভাবেই শুধু প্রতি নমস্কার জানায়।

ডাক্তার ভট্টাচার্যের পেছন পেছন লঞ্চে গিয়ে ওঠে অসীমা। অশোকের হৃদয়-গগন থেকে বোধ হয় একটা নক্ষত্রের পতন হ'লো। পাশেই তো রয়েছে রেবা, কিন্তু ওকে আজ এতো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে অশোক কুইন এলিজাবেথের

দিকে। বিরাট দৈত্যটা কি ওর চোখের সামনেই আসীমাকে গিলে খেলে!

পশ্চিমের আকাশ লালে লাল। তারই ছোপ ছোপ সমুদ্রের নীল জলে। অসীমা বোধ হয় তলিয়েই গেলো ? না না, ঐতো ওঁরা দুজনে পাশাপাশি ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালেন। সতৃষ্ণ দৃষ্টি তো তীরের দিকেই। আর তো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত, তার পরেই তো হবে ছাড়াছাড়ি। দূর হতে দূরান্তে মিলিয়ে যাবে কুইন এলিজাবেথ—সূর্য ডুববে। অশোকের মনে পড়ে সেই ঝড়ের রাতের কথা। সেদিনও আকাশে ছিল এমনি রংয়ের সঙ্কেত। কিন্তু সেদিন ছিল সম্মুখে উজ্জ্বল উষা—আর আজ ? আজ এতো শুধু গোধূলির শেষ বর্ণচ্ছটা। তার পরেই তো আকাশ জুড়ে নেমে আসবে বিষাদিতা তমসা। সেদিন অসীমার মনের আনাচে কানাচে ছিল দীপ্তিতে ভরা, আজ শুধু অন্ধকারই থম থম করছে। কি থেকে কি হয়ে গেলো। সমুদ্রের নীল জলে চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অশোকের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

বিরাট শব্দে ভেঁপু বেজে উঠে। ঝাঁকুনি দিয়ে যাত্রা শুরু করে। কুইন এলিজাবেথ। ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে মোটা চিমনী দিয়ে। আকাশের দুই গাল কালিতে মাখামাখি। সদর্পেই চলেছে এলিজাবেথ। ডাক্তার ভট্টাচার্য আর অসীমা রেলিংএ ভর করে ডেকের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছেন। রুমাল নেড়ে নেড়ে শেষ সম্ভাষণ জানাচ্ছেন ওঁরা। বিরাট এক কুমীরের পিঠে যেন চলেছেন। ডুব দিলেই সব অন্ধকার। অশোকের মনে আবার অতীত এসে ধাক্কা খায়। এতো সেই কানামাছি খেলা। অসীমা কোথায় কোন নিভৃতে লুকিয়েছে। খুঁজে বার করতে

হবে ওকে। সারা অলিগলি খোঁজ খোঁজ। পেয়ারার ডালেই হয় তো ওকে ধরা গেল। সেকি হাসির হল্লা! আবার খোঁজ খোঁজ। তারপর যখন হাতে হাত রেখে বেঁধে ফেলবার কথা তখনই ছিঁড়ে গেল হৃদয়-তন্ত্রী। একি, কুইন এলিজাবেথ কি এরই মধ্যে তলিয়ে গেলো!...সুরমা সুলাল কখন বিদায় নিয়েছে খেয়ালই হয় না অশোকের। চোখে কি লোনা জলের ঝাপটা লাগলো? দু'হাতে চোখ পুছে রেবাকে প্রশ্ন করে অশোক, সু, তুমি কি কুইন এলিজাবেথকে দেখতে পাচ্ছ?

এখন প্রায় দৃষ্টির বাইরে অশোক, চলো ফিরি?

উত্তরটা বোধ হয় অশোকের কানে পৌঁছোয় না। একটু নীরব থেকে পুনরায় প্রশ্ন করে, এ্যাটলান্টিক কি খুব গভীর সু?

রেবা কি ভাবে বোঝা যায় না। উদাসভাবেই উত্তর দেয়, ওকথা কেন বলছো অশোক?

যদি ঝড় ওঠে, কুইন এলিজাবেথ যদি···মুখের কথা শেষ করতে পারে না অশোক। দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে থাকে।

কি হ'লো অশোক, অমন করছো কেন?

বড্ডো যন্ত্রণা সু। এ্যাটলান্টিকে বোধ হয় ঝড় উঠলো।

আঃ, চুপ করো, মাথা ঘুড়ে পরে যাচ্ছিল অশোক, রেবা দু'হাতে চেপে ধরে বসিয়ে দেয়।

বিপদ দেখে আশপাশের অনেকে এসে জড় হয়। সকলে মিলে ধরাধরি করে তুলে দেয় অশোককে গাড়ীতে।

রেবা ভয়ে একটি কথাও বলতে পারে না। অশোককে চেপে ধরে পেছনের সিটে চুপচাপ বসে থাকে। ড্রাইভারকে গাড়ী বেশী জোরে চালাতে বলতেও সাহস করে না। কি জানি, ঝাঁকুনিতে অশোকের যদি বেশী রকম কষ্ট হয়! দুর্বল শরীর, অনর্থও ঘটতে পারে।···আস্তে

আস্তেই এগিয়ে চলে গাড়া "হোমের দিকে।" কিন্তু বাবাও যে সেখানে নেই, কে দেখবে অশোককে?…ভয়ে ভাবনায় মুখ চুন হয়ে ওঠে রেবার! ধীরে ধীরে দু'চোখ বুজে আসে অশোকের। রেবা উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়ে, অশোক—অশোক—কথা বলো…

রেবার হাতখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে ধীরে ধীরেই আবার চোখ খোলে অশোক।

রেবা তেমনি উৎকণ্ঠা নিয়েই জিজ্ঞেস করে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

বুকের মধ্যে কে যেন পাথর ভাঙছে সু, জড়িত কণ্ঠে কথা কয়টা শেষ করে আবার চোখ বোজে অশোক। বুঝি বা অচেতনই হয়ে পড়ে।

রেবা আর ওকে বিরক্ত করে না। মনে মনে রাগ হয় অসীমার ওপর। ঢং করে বিলেত গেলেন, এখন ওর কবিকে দেখে কে? নিজের প্রতিও দুঃখ কম হয় না। কি পেলো ও সারা জীবনে? জগৎ কি একথা বিশ্বাস করবে না, অশোককে ও নিঃস্বার্থভাবেই ভালবাসে! তবে অসীমার এ অভিমান কেন? রেবার দু'চোখে শ্রাবণের ধারা।

অশোক বোধ হয় অবচেতন মনেই স্বপ্ন দেখে, ঝড় থেমে গেছে। এ্যাটলান্টিকের বুকে মহা প্রশান্তি। চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে মুক্ত নীলাকাশ। উৎসব মুখর কুইন এলিজাবেথ। অসীমা তো খুশীতে ডগমগ। তরঙ্গে তরঙ্গে নহবতের সুর।

স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয়েই 'আইডিয়াল হোমে' পৌঁছে অশোক। তিন নম্বর কেবিন আবার সরগরম হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে ডাক্তার সেন ছুটে আসেন। অশোকবাবু তো বেশ ভালই ছিলেন, হঠাৎ আবার এ রকম অবনতি কেন! নাড়ী টিপে বিচলিত হন ডাক্তার সেন। রেবা তাঁর পেছন পেছন বাইরে গিয়ে উৎকণ্ঠা জানায়। না, হতাশ হয়ে পড়েছেন ডাক্তার সেন। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখা।

মনের সঙ্গে তীব্র ধাক্কা খেতে খেতে পুনরায় ফিরে আসে রেবা অশোকের শিয়রে। বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু আপ্রাণ চেষ্টায় শক্ত হতে চেষ্টা করে। অশোকের সামনে কান্নাকাটি করলে মুষড়ে পড়বে ও। যদি বেহুঁশেও থাকতো তবু না হয় ভালভাবে ইন্‌জেকসন আর ওষুধ পড়তে পারতো। কিন্তু আজ যেন কি হয়েছে! কেবলই অনর্গল বকে যাচ্ছে! হয় তো এই মানসিক উত্তেজনাই কাল হবে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে, প্রচণ্ড ঘুমের ওষুধও দেবার উপায় নেই। হার্ট অত্যন্ত দুর্বল।

বুকের যন্ত্রণাটা হয়তো কিছুটা কমই এখন অশোকের। রেবা ডাক্তার সেনের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করে ফিরে আসতেই মুচকি হেসে শুধোয়, আশা নেই, কেমন সু ?

কি যা তা বকছো বলতো ? মানুষের কি অসুখ করে না ?

কেউটের ছোবলে কেউ বাঁচে না, সু। অশোকের পাংশু মুখ অধিকতর বিমর্ষ দেখায়।

ফিরে আসবার জন্য অসীমাকে 'তার' করবো অশোক ?

না না, এ অমঙ্গলের মাঝে ওকে তুমি ডেকো না। চিরটা কাল যে আমি তোমাদের কেবল জ্বালিয়েই গেলাম সু !

একটু চুপ করো অশোক, ডাক্তার সেন তোমাকে কথা বলতে বারণ করে গেছেন।

আর যে সময় পাবো না। এ কণ্ঠ তো চিরদিনের জন্যই বন্ধ হতে চলেছে।

এ রকম বাজে বকলে কিন্তু আমি এখানে থাকবো না, অভিমানের সুরেই বাধা দেয় রেবা।

মরতে তো আমি চাইনে সু, তবু যে বড্ডো ভয় হয়। দেখতো, লাইন কটা হচ্ছে কি না ঃ

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর এ ভুবনে'···কণ্ঠ জড়িয়ে যায় অশোকের।

রেবা ডুকরে ওঠে, অশোক—অশোক—

না না, এখনো সময় হয়নি সু। বড্ডো যন্ত্রণা, রেবার হাতখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরে অশোক।

ডাক্তার সেনকে ডাকি ?

না না, ওঁরা কিছুই করতে পারবেন না। তুমি আমার আরো কাছে এসে বসো সু, বড্ডো ভয় করছে।

আমি তো তোমার কাছেই রয়েছি অশোক, কিসের ভয় ? একটু ঘুমোও লক্ষীটি ! অশোকের বুকের কাছে আরো ঝুঁকে পড়ে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে রেবা।

অশোক সত্যি একটু নিরস্ত হয়। হয়তো ঘুমিয়েই পড়ে।

কাল রাত্রির শেষ প্রহর। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের পাখী জেগে উঠবে। গাড়ী ঘোড়ায় মুখর হয়ে উঠবে জনবহুল মহানগরী। অশোকের শিয়রে বসে হাত বুলাতে বুলাতে রেবার অলস দেহ কখন যেন খাটের রেলিংয়ের ওপর এলিয়ে পড়ে। হয়তো ঘুমের আমেজই লেগেছে দু'চোখে। সহসা চীৎকার করে ওঠে অশোক, এ্যাটলান্টিকে আবার ঝড় উঠলো সু। কুইন এলিজাবেথ ডুবছে। দোর জানালা সব বন্ধ করে দাও—বন্ধ করে দাও···

ধড়ফড় করে লাফিয়ে ওঠে রেবা, কি হ'লো, কি হ'লো অশোক ?···

শুনছো না, ঐ যেন ওরা সব কে ধেয়ে আসছে ! বন্ধ করে দাও—বন্ধ করে দাও ···

আঃ, চুপ করো, চুপ করো অশোক,···রেবা ছুটে যায় ডাক্তার সেনকে খবর দিতে। মৃদু ওষুধের ক্রিয়া বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে, আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে।···কিন্তু ফিরে এসে দেখে সব শেষ।

মুখর কবি কণ্ঠ চির দিনের জন্য স্তব্ধ।···বুক ফাটা কান্নায় দাপাতে থাকে রেবা অশোকের বুকের ওপর।

পরদিন সকালে সমুদ্রের বেলাভূমিতেই রচিত হয় চিতা। শেঠ জয়রামদাসজী আসেন, আরো বন্ধু বান্ধব যাঁরা। রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প বর্ষিত হয় শব দেহে। চোখের জল মোছেন প্রিয়জনেরা। কিন্তু রেবা কাঁদতে পারে না। বুকখানা যেন কেমন পথের হয়ে গেছে ওর। নিদারুণ গাম্ভীর্যেই কর্তব্য করে চলে। ওরই হাতের আগুনে পুড়ে ছাই হতে থাকে অশোকের নশ্বর দেহ। গতকাল যে দুটি পাণ্ডুর চোখ কুইন এলিজাবেথ থেকে নির্গত ধোঁয়া দেখে দেখে বিচলিত হয়ে উঠছিল সে চোখ আজ চিরদিনের জন্য বন্ধ। লক লক করে জ্বলছে চিতার আগুন। আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে ধূম শিখা—কবির দেহ পঞ্চভূতে। কিন্তু রেবার বুকে সে আগুন দ্বিগুণ হয়েই জ্বলছে। কবি ওর হাতের ফুল চেয়েছিল। জীবনে যা দিতে পারিনি—মরণে তাই ও দেবে কবির সমাধিতে। কিন্তু কবির সঙ্গে কিছুতেই ও সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করতে পারবে না, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর এ ভুবনে।" ওর কণ্ঠে যেন স্বতঃই অনুরণিত হচ্ছে, "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।"

প্রত্যহ বিকেলে সাগর বেলায় আসে রেবা। সূর্য ডোবে, আঁধার নামে। কালো জল থৈ থৈ করে অনন্তে। অশোককে পথে পেয়েছিল, পথেই হারালো। কিন্তু স্মৃতির দংশন যে অবিরত বাজছে বুকের বীণায়! মুঠো মুঠো যুঁই, মালতী, রজনীগন্ধা অঞ্জলি দেয় রেবা অশোকের সমাধিতে, সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। অশোকের আত্মা কি তৃপ্ত হবে না?···

———